বৈষ্ণবী।

Mohan

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু বি. এ. প্রণীত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।
৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩১৮।

Printed by J. N. Bose,
WILKINS PRESS,
College Spuare Calcutta.

1911.

মূল্য ১।৹ টাকা।

১৩৩৩০

উৎসর্গ।

আমার স্বর্গগতা জননীসমা

জ্যেষ্ঠাগ্রজার পবিত্র

স্মৃতির উদ্দেশে—

ভূমিকা।

বাল্যকালে যে গল্প শুনা যায়, তাহা আজীবন হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের মুখে আমি আমাদের দেশের জীবন সর্দ্দারের অদ্ভুত জীবন-কাহিনী শুনিয়াছিলাম; পরে স্বয়ং ঘুষুড়ির বটবন ও ভগ্নমন্দির দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হৃদয়ে দারুণ আকাঙ্ক্ষা জন্মে। উপযুক্ত অবসর ও সুযোগ অভাবে সেই আকাঙ্ক্ষা দরিদ্রের আশার ন্যায় হৃদয়ে উঠিয়াই বিলীন হইয়া যায়। পরে সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত "বঙ্গবাসী" পত্রের সহিত আমার সংশ্রব ঘটে। সেই সুযোগে বঙ্গবাসীতে আমি "সেকালের ডাকাত" শীর্ষক প্রবন্ধে জীবন সর্দ্দারের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রকাশ করি। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্গবাসীর সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী সাহিত্যসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় আমাকে ঐ কাহিনী বিস্তারিত লিখিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন। বঙ্গসাহিত্যে আমার গুরুপ্রতিম সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় আমার সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পড়িয়া উহাকে উপন্যাসাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে উপদেশ দেন। কলিকাতা "স্কটিশ চর্চ্চ" কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজতুল্য সুধী সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্, এ, মহাশয়ও এ সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। আমি সামান্য ব্যক্তি, আমার ক্ষমতাও সামান্য; তবে এই সকল মনীষী ব্যক্তির উৎসাহ বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই "বৈষ্ণবী" প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। সুতরাং আমার "বৈষ্ণবীর" কোনও গুণ থাকুক বা না থাকুক, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। তাই স্তুতি বা নিন্দার আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সহৃদয়

পাঠকবর্গের সম্মুখে "বৈষ্ণবী"কে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম। শ্রমটুকু আমার, তাই বৈষ্ণবী পাঠে সাধারণ পাঠক কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি-লাভ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থে আমি সেকালের বঙ্গ-পল্লীর দুই একটী চিত্র ফুটাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ ছিল, কিরূপ সামাজিক ছিল, কিরূপ খাইত পরিত, কিরূপ থাকিত; একশত বৎসর পূর্ব্বে বহু ইংরাজ কিরূপ হৃদয় লইয়া ভারতে আসিতেন, কিরূপ ভাবে এদেশবাসীর সহিত মিলামিশা করিতেন; একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী নীচ জাতিও কিরূপ মহত্ত্ব ও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে সমর্থ হইত,—তাহাই সাধ্যমত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা নাই,—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আমি লিখিয়াই খালাস।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার অভিন্নহৃদয় বাল্যসুহৃদ্ ২৪ পরগণা দণ্ডীরহাট নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় জীবন ডাকাতের জন্ম ও লীলাখেলা সম্বন্ধে দুই একটী তথ্য আমায় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বলা বাহুল্য, উপন্যাসের আবশ্যক মত আমি তাহা হইতে বাছিয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।

কলিকাতা,
১০ই ভাদ্র, ১৩১৮ সাল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

বৈষ্ণবী।

চূড়ামণির বিপদ।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা। ভরা ভাদ্রের পূরা বর্ষায়—নদ-নদী, খাল-বিল, কূলেকূলে পরিপূর্ণ। গ্রামের পাশে চাষের ক্ষেতে গোছা-গোছা ধান, সুশ্যামল সুন্দর,—ভোরের বাতাসে হেলিতেছে, দুলিতেছে, মাথা নাড়িতেছে; সুন্দরী ইছামতীর চিকণ জলে রাঙ্গা উষার রাঙ্গা ছবি পড়িয়াছে।

চূড়ামণি মহাশয় এই প্রত্যুষে ঘুঘুড়ির পথে চলিয়াছেন। হাতে পুঁথি, গায়ে নামাবলি, কপালে তিলক; কিন্তু নগ্নপদ। ব্রাহ্মণের বর্ণ তপ্তকাঞ্চননিভ, তিল-ফুলের ন্যায় নাসা, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন,—সুন্দর সুডৌল তনু; ব্রাহ্মণ বলিষ্ঠও বটে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ ভগবানের নাম লইয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছেন; শৌচ স্নান সমাপনান্তে প্রফুল্লমনে পুষ্পচয়ন করিয়া ধূপ-ধূনা দীপ জ্বালিয়া গৃহদেবতার পূজা করিয়াছেন; তাহার পর পথ চলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের নিবাস ২৪ পরগণা বসিরহাটের নিকট দণ্ডীরহাট গ্রামে। দণ্ডীর হাট হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে খুবো গ্রামে যজমান গৃহে তিনি কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে যাইতেছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে আজ প্রায় একশত বৎসরের কথা। তখনকার কালে গ্রামে গ্রামে বড় একটা পথ ঘাট ছিল না; প্রায় গ্রামে গ্রামেই জঙ্গল, মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত, আর সেই জঙ্গল ও ক্ষেতের মাঝে অপ্রশস্ত পথ, সে পথের কোথাও জল, কোথাও বা কাঁটাবন।

ব্রাহ্মণ ঘুঘুড়ির জঙ্গল ছাড়াইয়াছেন; দণ্ডীরহাট ও খুবোর মাঝামাঝি পথে ঘুঘুড়ি। এইবার মগরার পুল। মগরা ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনী, ইছামতীর শাখা। এই খাল এখন মজিয়া গিয়াছে। বর্ষায় এখনও এই মজা খালে জল দাঁড়ায়; টাকী হইতে বারাসত পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম টাকীর জমিদার কালীনাথ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এখনও সেই পথে মগরার পুলটী দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ প্রায় পুলের কাছাকাছি আসিয়াছেন। চারিদিকে যতদূর চক্ষু যায়—কেবল জঙ্গল। পথে জনপ্রাণী নাই; প্রকৃতি নিস্তব্ধ নীরব, কেবলমাত্র আলের পাশে ও খালের মাঝে জলের কল-কল ধ্বনি। ব্রাহ্মণের গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল; গা ছম্-ছম করিবার বিশেষ কারণও ছিল। কেননা এই পুলের কাছেই ঘুঘুড়ির আড্ডা; আড্ডার জীবন সর্দ্দারের নাম কে না শুনিয়াছে? জীবন সর্দ্দার দুর্দ্দান্ত ডাকাত, তাহার নামে ২৪ পরগণা, যশোহর ও নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা কাঁপিত। দূরে গ্রামান্তরে পূজার ঢাক বাজিতেছিল; ঢাকের অস্পষ্ট কাঠির আওয়াজেও ব্রাহ্মণ যেন অনেকটা সাহস পাইলেন, মনে ভাবিলেন,—'আর ত' জঙ্গল ছাড়াইয়াছি, গ্রামের ঢাকের বাজনাও শুনিতেছি, পুলটা পার হইলে আর কোন ভয় নাই। আর ভয়ই বা কি? দরিদ্র ব্রাহ্মণ; প্রাণে মারে, একবার বইত' আর মারিতে পারিবে না।' ব্রাহ্মণ দ্বিগুণ উৎসাহে পথ হাঁটিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ যেন মেদিনী দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি পুলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল; একজন কঠোরস্বরে বলিল—"কে যায়?" ব্রাহ্মণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তিনি বলিলেন—"বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, খুবোর বিশ্বেসদের বাড়ী যাইতেছি।" ব্রাহ্মণ যে লোকটীকে এই কথা বলিলেন, তাহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর,—আকারে খর্ব্বাকৃতি বজ্রবাঁটুল, মসীনিন্দিত বর্ণ, সন্ধ্যা

ঘূর্ণায়মান গোলাকার রক্তাভ চক্ষু, মাথায় আপিঙ্গরুক্ষোর্দ্ধ লম্বিত কেশরাশি; হাতে রৌপ্য বলয়, গলায় প্রবাল-মালা, কর্ণে প্রকাণ্ড কর্ণভূষণ। হাতের প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠি ভূমিতে রাখিয়া তখন সেই লোকটী সাষ্টাঙ্গে চূড়ামণি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিল,—"ঠাকুর, গড় করি; আমরা তোমার মত বামুন-ঠাকুরই খুঁজিতেছিলাম। চল, আমাদের সঙ্গে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কোথায় যাব?" লোকটী বলিল,—"দেখতেই পাবে।" পরে গম্ভীরস্বরে বলিল,—"ওরে না ভিড়ো।" অমনি খালের ধারে একখানি ছিপ্ আসিয়া লাগিল। এতক্ষণ ছিপখানি পুলের নীচে গুপ্তভাবে বাঁধা ছিল; তাহার ভিতর অনেকগুলি লোক বোটে হাতে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রথমে অনেক স্তব-স্তুতি, কাকুতি-মিনতি করিলেন; শেষে নিরুপায় হইয়া ছিপে চড়িলেন। ডাকাতেরাও ছিপে চড়িয়া ছিপ্ ছাড়িয়া দিল। অধিকক্ষণ কিন্তু ছিপে থাকিতে হইল না। যেখানে ছিপ্ লাগিল সেখানটা কাল জঙ্গল; খালের একটা ফেঁকড়া জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়াছে; ছিপ্ আসিয়া সেইখানে লাগিল। সকলে সেইখানে অবতরণ করিল। রক্ত-চক্ষু লোকটী ছিপের লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া কি হুকুম দিল; ছিপ্ লইয়া লোকেরা চলিয়া গেল। তখন রক্তচক্ষু বলিল,— "ঠাকুর, অপরাধ নিও না, এইবার তোমার চোখ বাঁধবো।" এই বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সে চূড়ামণির চক্ষু বাঁধিয়া ফেলিল ও ধীরে ধীরে পথ দেখাইয়া চলিল। চূড়ামণি অবাক,—কেবল জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কি জীবন সর্দার?" ডাকাত বলিল,—"আজ্ঞে না ঠাকুর, আমি তারই দলের লোক বটে।" ব্রাহ্মণ—"আমায় কেন নিয়ে যাচ্ছ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" ডাকাত বলিল,—"পূর্ব্বেই ত বলেছি, দেখতে পাবে।" ব্রাহ্মণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছু পরে ডাকাত তাঁহাকে এক সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বলিল।

অনুভবে ব্রাহ্মণ বুঝিলেন,—কাঠের সিঁড়ি। দশ বারোটি ধাপ্ উঠিবার পর ব্রাহ্মণকে দাঁড় করান হইল; অমনি ব্রাহ্মণের চোখের বাঁধনও খুলিয়া গেল। কিছুক্ষণ ব্রাহ্মণ কিছু দেখিতে পাইলেন না; আঁধার কাটিয়া গেলে দেখিলেন,—তিনি এক কাঠের ঘরে; ঘরটী সমস্তই কাঠের ও বাঁশের,—সিঁড়ি, ছাদ, মেঝে, দরজা-জানালা—সব কাঠের। কাঠের ছাদে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে, কাঠের দেওয়ালে দেওয়াল-গিরি, ঘরে নানারূপ আসবাব পত্র। ঘরের মধ্যে ঢালা বিছানা,—বিছানায় বালিশ তাকিয়া; বিছানার এক পার্শ্বে গালিচা পাতা। ঢালা বিছানার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া একজন লোক গুড়-গুড়ির নল টানিতেছে, তিন জন লোক তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ব্রাহ্মণ তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন; আকৃতিতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই; লোকটী নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল, দেখিয়াই বলিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়; চক্ষে তাহার অপূরূপ দীপ্তি,—সেরূপ দীপ্তি সচরাচর দেখা যায় না; মুখের ভাবে বোধ হয় যেন লোকটী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ম্মঠ ও সাহসী।

আগন্তুকদিগকে দেখিয়া কক্ষস্থিত লোকটী বলিল,—"কেরে ভুতো এলি; কাজ হাসিল?" পূর্ব্ববর্ণিত ডাকাত অথবা ভুতো বাগ্দী বলিল,—"তাতো দেখতেই পাচ্ছ, সর্দ্দার!" তখন লোকটী উঠিয়া চূড়ামণি ঠাকুরকে প্রণাম করিল, পা ধুইবার জল দিল, এবং গালিচার উপর বসিতে বলিল। পরে হাসিয়া কহিল,—"ঠাকুর কষ্ট দিলাম, অপরাধ নিও না। বিশেষ দরকারে তোমায় ঘুঘুড়ির আড্ডায় এনেছি।" চূড়ামণি বলিলেন,—"তবে তুমিই কি জীবন সর্দ্দার?" লোক,—"আজ্ঞে, আমিই সেই ব্রাহ্মণের দাস। ঠাকুর তোমার নাম কি, নিবাস কোথায়?" চূড়ামণি—"আমার নাম মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য, নিবাস—দণ্ডীরহাট।" জীবন—"দণ্ডীরহাট, বোসেদের

পুরুত ?" ব্রাহ্মণ—"হাঁ।" জীবন,—"তবে ত ভালই হয়েছে, তুমি ঠাকুর ভাল বামুন। আজ আমাদের কালী মায়ের পূজা দিতে হবে, আমরা আজ রেতে একটা বিশেষ কাজে যাবো। তোমায় পূজা কর্ত্তে হবে।" ব্রাহ্মণ—"আমি যে থুবোর বিশ্বেসদের বাড়ী বিশেষ আবশ্যকে যাচ্ছি।" জীবন হাসিয়া কহিল,—"আজ পঞ্চমী, আজ দিনের বেলায় এখানে শ্যামা পূজা সারবে, তারপর সন্ধ্যার সময় আমার লোক তোমাকে থুবোয় রেখে আসবে।" ব্রাহ্মণ,—"সে কি কথা, দিনের বেলা শ্যামাপূজা ?" জীবন,—"মায়ের পূজা, যখন হোক হলেই হল,—তা দিনের বেলায় কি, আর রেতেই কি। এস ঠাকুর তোমায় মায়ের মন্দিরে নিয়ে যাই।"

জীবন পথ দেখাইয়া চলিল; ব্রাহ্মণ পশ্চাতে চলিলেন, কিছু দূরে কয়েক জন ডাকাত লাঠি-সড়কি লইয়া চলিল। তখন ব্রাহ্মণের চক্ষু বস্ত্রাচ্ছাদিত নহে; ব্রাহ্মণ সবিস্ময়ে দেখিলেন,—চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল, স্বভাবজাত ঘনসন্নিবেশিত বটবৃক্ষশ্রেণী; জঙ্গলের ভিতর গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; আর সেই জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত স্থানে দুই তিন খানি কাঠের ঘর, ঘরগুলির সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দির, মন্দিরের গায়ে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। মন্দিরের মধ্যে গিয়া ব্রাহ্মণ প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, ঘোর অন্ধকার। পরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল; দেখিলেন,—বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি, করালবদনা লোলরসনা কালী, করালী সত্য সত্যই করালী, গলে প্রকৃত নরমুণ্ডমালা,—তাহাতে রুধির-স্রাব হইতেছে, কটিতে নরকরশ্রেণী,—তাহাতেও রুধির ধারা, করধৃত খর করবাল রুধিরসিক্ত, পূতিগন্ধে মন্দিরাভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণ ভয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"জীবন, আমার প্রাণ যায় তাড়

স্বীকার, আমি এ ডাকাতে কালী পূজা করিতে পারিব না।" জীবনের মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, ভাঁটার মত চোখ দুটা ঘুরিতে লাগিল। জীবন বলিল,—"ঠাকুর, খবরদার মায়ের নিন্দা ক'রো না, তুমি ব্রাহ্মণ বলে এ যাত্রায় রক্ষা পেলে। এখন তোমার ইচ্ছা থাক বা না থাক, পূজা তোমায় করিতেই হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমার প্রাণ থাকিতে না।" জীবন তখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ব্রাহ্মণকে বলিল,—"ঐ সামনে কিসের পুকুর দেখছো, ওর জল রাঙ্গা কেন? এই মায়ের সামনে কত লোকের মাথা কেটেছি, তা জানো? কত নরবলি দিয়েছি, তা শুনেছ?—ঐ পুকুরে তাদের রক্তের ঢেউ খেলছে। যদি পূজা না কর, তা হলে তোমার রক্ত ঐ রক্তের সঙ্গে মিশাবো।" ব্রাহ্মণ তেজস্বী ও নির্ভীক, বলিলেন,—"তুমি আমায় খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মগরার খালে ফেলিয়া দাও, আর ফাঁসী কাঠেই ঝোলাও, আমি এ কাজ কখনই করিব না।" জীবন বলিল,—"ঠাকুর, খাঁড়ায় কাটা বা গাছে লট্‌কানো ছাড়া, আরও অনেক রকমে মানুষ মারা যায়, তা জান? আমি তোমার গায়ে তেল মাখাইয়া পুড়াইয়া মারিব। কেমন, এখন রাজী আছ?" ব্রাহ্মণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না।" জীবন রোষকষায়িত লোচনে ব্রাহ্মণের পানে তাকাইয়া বলিল,—"তবে মর।" ক্ষণপরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"কে আছিসরে?" অমনি চারি পাঁচ জন যমদূতাকৃতি বলিষ্ঠকায় ডাকাত ব্রাহ্মণকে ঘেরিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই বুঝি শেষ। যখন চাহিলেন, তখন দেখিলেন,—জীবনের সে রুদ্রমূর্ত্তি আর নাই, মুখে মৃদুমন্দ হাস্য। জীবন গললগ্নীকৃতবাসে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল,—"ঠাকুর, এইবার তোমায় চিনিলাম; তুমি যথার্থ ই ব্রাহ্মণ বটে, তুমি আমার গুরুর গুরু; দণ্ডীরহাটের বসুদের পূজ্য পুরোহিত

তুমি ;—তোমায় কি কখনও কষ্ট দিতে পারি ? প্রাণ লওয়া ত দূরের কথা। এত দিন ডাকাতি করিতেছি, কত নরহত্যা, কত অত্যাচার কত অনাচার করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি কখনও ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করি নাই ; এ জীবনে করিবও না। তুমি নির্ভয়ে তোমার গন্তব্য স্থানে যেও ; আমার লোক তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। পূজার জন্য তোমায় আনি নাই। বিশেষ কোনও কাজে তোমায় হেথায় আনিয়াছি। সে কাজ তোমারই মত নিষ্ঠাবান তেজস্বী ব্রাহ্মণে সম্ভবে। তাই তোমায় এত কষ্ট দিয়াছি।" ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ কাজেও যদি পূর্ব্বের মত না বলি, তাহা হইলে কি এবার ডুবাইয়া মারিবে ?" জীবন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "পূর্ব্বেই ত' বলেছি ঠাকুর, ব্রহ্মবধ আমার ধাতে সয় না। তবে তখন যে তোমায় প্রাণের ভয় দেখাইলাম, সে কেবল তোমার মনের বল বুঝিব বলিয়া। যা হোক, সে অনেক কথা, পরে হইবে। এখন এস তোমায় আমার বনের রাজ্য দেখাই।" এই বলিয়া জীবন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সেই বটজঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

গ্রাম্য সমাজ।

"বল কি, দাদাঠাকুর ?"

"বলি ত এই !"

"আরে এও কি কখন সম্ভব ?"

"ছিঁ, বিঁষ্ণুঃ ; এঁ্যাও কিঁ কঁখঁনঁওঁ ছঁম্বব ?

"ভাল, ছুঁড়ীটা ত' নিপাট ভাল মানুষ, মুখে রাটী নাই, শান্ত শিষ্ট, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—"

"বলে যা, বলে যা, আবাগের বেটা, ঠিকুজী কুলুজী তার যা

যেখানে আছে ব'লে যা। ঐ যে ঢাকার লক্ষ্মী গয়লানী বল্‌তো 'ডবকা হল ছোঁড়া, ত' ছুঁড়ীর হল গোঁড়া।' তো বেটারাও কি আর ছিষ্টিছাড়া হবি? বল্‌, কড়ে র্‌াঁড়, ভাতারটী ছিল না, সারাটী দিন খেটে খুটে, রেতের বেলায় উপোসী হয়ে মুখটী বুজে পড়ে থাকত, আর ইষ্টদেবতার নামটী জপ্‌ত, কেমন না?"

দণ্ডীরহাটের বাঁধা বকুলতলায় দুইটী পল্লীবাসীর কথা হইতেছে। দাদাঠাকুরটী হইতেছেন গ্রামের অভয় ভট্টাচার্য্য; অপরটী নিরঞ্জন বসু। স্নানাহারের বেলা হইয়াছে। গ্রামের অনেকেই স্নানে গিয়াছেন, কেহ কেহ যাইতেছেন, কেহ কেহ বা যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। স্নানে যাইবার পথে এই বাঁধা বকুলতলা, সাঁঝে সকালে দিনে দুপুরে গ্রামের একটী প্রধান আড্ডা। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের দাদাঠাকুর আশ্‌শেওড়ার দাঁতন করিতে করিতে কাঁধে গামছা ফেলিয়া বাটীর বাহির হইয়াছেন; অভিসন্ধি,—বাঁধা বকুলতলায় দ্বিপ্রহরে আর একটা আড্ডা জমাইয়া তামাকের শ্রাদ্ধ করিবেন। তামাকের অভাব বকুল-তলায় নাই, কেন না নরহরি সদাই যোড়হস্তে তাবৎ আড্ডাধারীকে দা-কাটায় পরিতৃপ্ত করে। নরহরি সেন জাতিতে ভাণ্ডারী কায়স্থ, বাঁধা বকুলতলার গায়েই তাহার মাটীর ঘর, উপরিতন জাতিদিগের পরিচর্য্যায় তাহার আমোদ, বেচারার তাই প্রত্যহ দুই বেলায় দেড় সের, দুই সের তামাক পুড়িত।

দাদাঠাকুরটী কেবল নিরঞ্জনের দাদাঠাকুর নহেন, তিনি দাঁড়ির হাটের দাদাঠাকুর। গ্রামের চুনো পুঁটীটী হইতে রুই কাতলা পর্য্যন্ত তাবৎ লোকেই তাঁহাকে দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিত। দাদাঠাকুর পিতামহ হইতে পৌত্র পর্য্যন্ত তিন পুরুষের ইয়ার ছিলেন। দাদা-ঠাকুরের ত্রিকুলে কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছেন তাঁহার এক মাসী ও সেই মাসীর কুঁড়েটুকু; আর আছে তাঁহার সঙ্গের সাথী

অহিফেন, ও তাঁহার ঢাকা চট্টগ্রামের গল্প। নিরঞ্জনের পিতা দর্পনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার বাল্যকাল হইতে সৌহার্দ্দ ছিল। বসুজা মহাশয় সেকালের সদরআলা ছিলেন। তাঁহাকে দিল্লী হিল্লী টহল দিয়া বেড়াইতে হইত। তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে বহু দিন ছিলেন। অভয় ঠাকুর তাঁহার প্রবাসের চিরসহচর। তাই তাঁহার ঢাকা চট্টগ্রামের কথা অফুরন্ত ছিল।

নিরঞ্জন উৎসুক হইয়া বলিল, "কেন, কেন, ভিতরে কিছু ব্যাওরা ছিল না কি?" অভয়ঠাকুর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আহাহা, নেকি দিদি, কিছুই যেন জান না। তোরা হলি ডবকা ছোঁড়া, গাঁয়ে ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত এর ক্ষেতে তার ক্ষেতে ধান খেয়ে বেড়াস, তোরা আবার নেকা সাজিস, এইতে বড় দুঃখ হয়। তোদের বয়সে চাটগাঁয়ে শিবুদার সঙ্গে জোট বাঁধিয়ে কি কাণ্ডই না করেছি! সে সব কথা মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। এখন আর কি বল, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, গঙ্গা শিয়রে করে বসেছি, আমাদের কি এখন আর ও সব রসের সময় আছে যে, এর ঘরের তাঁর ঘরের তত্ত্ব নিয়ে বেড়াব। তবে এটায় কি না ঢিঢি পড়ে গেছে, কান পাতা যায় না, তাই খবরটা পেয়েছি।"

নিরঞ্জন। সত্যি দাদাঠাকুর, কিছুই জানি না। আমরা ত' বরাবরই জানি দীনুর মেয়ে ভাল, ঘরকন্না নিয়েই ব্যস্ত। তাই কথাটা কেমন কেমন ঠেকছে।

অভয়। আরে মুখ্যু, তোকে কি শুধুই লোকে গলা-কাটা নিরে বলে। লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি তো ঐ গলার ভিতর। তোর গলাটা কাটা গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটুকুও কাটা গিয়েছে। দেখছিস না, যেখানেই বজ্র আঁটুনি সেই খানেই ফস্কা গেরো, যেখানেই আঁটা আঁটি সেখানেই ফাটাফাটি।

ছেলে বেলায় নিরঞ্জনের গলায় বিষম স্ফোটক হয়। গ্রামের উমাচরণ পরামাণিক সেই ফোড়া অস্ত্র করিয়াছিল। তখনকার কালে পল্লীগ্রামের পরামাণিকেরাই বাঙ্গালার সিবিল সার্জ্জন ছিল। নিরঞ্জনের গলায় সেই অস্ত্রের দাগ কখনও মিলায় নাই, তাই তাহাকে গ্রামের অনেকে রাগাইবার জন্য গলা-কাটা নিরে বলিত। নিরঞ্জন অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। অভয় ঠাকুর তখন উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিয়া বলিলেন, "কিহে সেনজা, বলি আজ যে গুড়ুক মাগ্যি দেখতে পাই, একবার মুখ-অগ্নিটা কর।" নরহরি সেন গৃহ হইতে সাড়া দিল, "দাদাঠাকুর নাকি, চানে যাওনি? বেলা যে যায়। বস, তামাক দিই।"

দাদাঠাকুর নিরঞ্জনকে বলিলেন, "দেখেছো দাদা, ছোটলোক বেটাদের একবার স্পর্দ্ধাটা দেখেছো? আমি ব্রাহ্মণ, হেঁকে না ডাক্‌লে তামাক দিতে পারেন না। হতো ছোট কর্ত্তা, বেটা এতক্ষণ বিশ ছিলিম তামাক খাওয়াতো। ভাঁড়ারি কায়েত কি না, কত ভাল হবে।" বয়স হিসাবে দর্পনারায়ণ বসু গ্রামের ছোট কর্ত্তা ছিলেন।

নিরঞ্জন এইবার কথা কহিবার সুযোগ পাইল, বলিল, "তা, এ তোমার বের্জায় আবদার। বেচারার অপরাধটা কি? সেই রাত পোহালে কাক কোকিল ডাকবার আগে থেকে এই আড্ডায় লাগাড়ে গুড়ুক যোগাচ্ছে। এখন বেলা ত' গেছে, এখন একটু সংসারের কাজে আছে, আমরা এসেছি তা জানেও না, এতে আর ওর অপরাধটা কি?"

দাদাঠাকুর মহা গরম হইয়া উঠিলেন। ক্রোধটা তখন নিরঞ্জনের ঘাড়ের উপর দিয়া চালাইলেন, "তোরাই ত' ওর মাথা খেলি। বলে 'খাচ্চিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হোল এঁড়ে গোরু কিনে।' ঐ নোরো সেন বেটার তাই হোল দেখছি যে। ছিলি বেটা আঁস্তাকুড়ের পাত,

বামুন কায়েতের পায়ের বাতাস পেয়ে নড়ে বসেছিস্ কিনা, তাই এখন মাথায় চড়ে বসেছিস। আমরা কায়েত বামুনে ওর তামাকটা আসটা খাই বলে, বেটা যেন কেষ্টো বিষ্টু হয়ে পড়েছে। চাটগাঁয়ে হতো ত' হাতে ওর মাথা কাটতুম। প্রতাপটা সেখানে দেখলিনে। জানে তোর বাবা।"

নিরঞ্জন। তা ত' বটেই, হাতে মাথা কাটবেই ত। বেটা যত দোষ করেছে, এই আড্ডার ধারে বাড়ী ক'রে।

এই সময়ে নরহরি কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের হুঁকা লইয়া সেইস্থলে হাজির হইল। কলিকার গন্‌গনে আগুণ দেখিয়া দাদাঠাকুরের রাগ পড়িয়া গেল। কলিকার পানে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ব্রাহ্মণ যেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা দেখেছো, নরহরির মত এমন ব্রাহ্মণ-সেবক আর দুটী নাই। বেচারি সারা দিনটী খাটে মুখটী বুজে পরের কাজে; কিন্তু কলির কি অবিচার, সংসারে বেচারার সুখ নেই; ছেলে নেই পুলে নেই, আছে সোনার চাঁদ বউ; কিন্তু তাতে সুখ কি বল, যে রায়বাঘিনী মা"—নরহরি কথা চাপা দিয়া বলিল, "চুপ করুন, চুপ করুন, দাদাঠাকুর। আপনি ত' ব্রাহ্মণ। জানেনই ত' মাতৃনিন্দা শুনায় কি মহাপাপ? আর তাঁরই বা অপরাধ কি? রোগে শোকে তাপে ভুগে ভুগে এখনও যে তিনি সংসারে দাঁড়িয়ে আছেন এই আমাদের পিতৃপুণ্য।"

দাদাঠাকুর তখন চক্ষু মুদিয়া ধূমপানে বিভোর। সেনজার কথা কাণে গিয়াছিল কিনা জানিনা, কিন্তু হঠাৎ যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। ভীষণ শব্দে একটা বিকট টান টানিয়া ধূমোৎগীরণ করিতে করিতে বলিলেন, "ও মাগীগুলোর কথা আর বলো না। বেটীরা সব করতে পারে। ওই কবিরা বলে, 'দিনকো বাঘিনী, রাতকো মোহিনী।' সাধে কি শর্ম্মা ও জেতের ধার দিয়েও যান নি!"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, আগুণ সাক্ষী রেখে বাঁধা-বাঁধির ধার দিয়ে যাওনি বটে, কিন্তু আলগাআল্‌গি ব্যাপারে আঙ্গুলের পাঁপে যে গণে উঠা যায় না।"

অভয় ভট্টাচার্য্য বিষম ধমক দিয়া বলিলেন, "থাম থাম ছুঁচো, মিছে নাম রটাসনি। তা যদি হ'তো তাহলে কি আর বোষ্ণুম ছুঁড়িটাকে—বুঝলি—বোষ্ণুম ছুঁড়িটাকে কেলে দত্ত হাত ছিনিয়ে নেয়।"

নিরঞ্জন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "বটে বটে, বুড়ো বামনা, এই এতক্ষণে পেটের কথা কয়ে ফেলেছো। তাই তখন থেকে তারা ছুঁড়িটার নামে গুজুর গুজুর ফুস্থর ফুস্থর কচ্ছিলে। আঁতে ঘা লেগেছে, আঁতে ঘা লেগেছে। হুঁ হুঁ তাই ত' বলি, দাদাঠাকুর আমার এমন শিবতুল্যি মনিষ্যি, দাদাঠাকুর খানকা খানকা বোষ্ণুম ছুঁড়িটার নামে কুকথা রটাবে কেন? আহা ছুঁড়িটা নেহাইত ভালমানুষ।

নরহরি। কার কথা বলতেছ, দাদাভাই, দীনু বোষ্ণুমের মেয়ে? আহাহা তার নামে কলঙ্ক রটায় কে গা। আহা কচি বয়সেই বিধবা; ছুঁড়ী মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

নিরঞ্জন। আর দীনু বেচারা নিপাট ভাল মানুষ, সাতেও নাই পাঁচেও নাই।

যদি নরহরি কি নিরঞ্জন এতক্ষণ দাদাঠাকুরের মুখের ভাব লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত সেই মুখখানা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ষার আকাশের বারিভরা মেঘের মত সেই গম্ভীর মুখের মাঝে দুটী চক্ষুতে দামিনী বিকাশের মত ঘন ঘন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, অধর ওষ্ঠে গুরুগুরু মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল। শেষে মুসলধারায় বারি বরষিল।

"দীনে সতা, আর তার মেয়ে সতী, আমি নিন্দুক পাজী, তাতে

তো বেটাদের কিরে, পাজী বেটারা? দীনু সতা, তাই নিশুতির সময় ঝাঁঝাঁ রাত্তিরে মেয়ের ঘরে কালীদত্তকে ঢোকায় কেনরে বেটারা? কালীদত্ত বুঝি তার মেয়ের ঘরে নূনের হিসেব দিতে যায়, নচ্ছার ছোঁড়ারা!"

নিরঞ্জন। রাগ কর কেন দাদাঠাকুর? রাগের কথা কিছুই ত বলি নাই। কালীদত্ত কুঠীর দেওয়ান, দীনু পেয়াদা। তা পেয়াদার ঘরে যদি দেওয়ান হিসেবই নিতে যায়, তাতে দোষ কি?"

অভয়। দোষ কি, দোষ তোদের মাথা। তোদের ঘটে যদি সে বিচারের বুদ্ধি থাকবে, তা হলে কি গাঁয়ের বুকের উপর এত বড় একটা অকাণ্ড কুকাণ্ড ঘটে যেতে পারতো। আসুক ছোট কর্ত্তা, বলে কয়ে এর একটা বিহিত করতেই হবে। হলোই বা সে কুঠীর দেওয়ান!

এই সময়ে দাদাঠাকুরের চীৎকারেই হউক, আর যে কারণেই হউক গ্রামের নানাদিক হইতে নানালোক ছুটিয়া আসিল। কেহ বা স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে, কেহ বা আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে, কেহ বা হুঁকা টানিতে টানিতে, যে যেরূপ অবস্থায় ছিল,—সেই অবস্থায় বকুলতলায় হাজির হইল। সকলেরই মুখে এক কথা,—"কি, ব্যাপার কি? দাদাঠাকুরকে এত চটালে কে?"

দাদাঠাকুর আপন মনে বকিতে লাগিলেন, "বেটা যেন নবাব পুত্তুর; হলিইবা তুই সাহেবের দেওয়ান, তাতেই বা তোকে ভয় কি? বেটা একপুরুষে কিনা, পয়সা হ'য়ে তেল হয়েছে। ভাবিস কি, কোম্পানীর চাকর বলে গাঁয়ে যা ইচ্ছা তাই করবি!"

পাঁচ সাতজন গ্রামবাসী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তা বটেই ত'—বেটা গাঁয়ে জায়গা পেলি, ঘর দুয়োর বাঁধলি, এখন কিনা সাহেবের নজরে পড়েছিস বলে গাঁয়ে আর লোক মানিস না। এসব হ'লো কি?"

শীর্ণকায়, কোটরচক্ষু, হাড়গিলে মামার মত নিমচাঁদ ঘোষ, ওরফে খেঁকীমহাশয় বলিলেন, "কালে আরও কত দেখবে! আরসুলা হলো পাখি, বেঙ হলো হাতী! হাঃ তোর নিয়ে কিছু করেছে।" ঘোষজা মহাশয় স্বভাব গুণে গ্রামবাসীর নিকট এই খেঁকী আখ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

দাদাঠাকুর এতক্ষণ গজরাইতেছিলেন। মনের মত সঙ্গী পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওর এত বড় বুকের পাটা কিসের জন্যে? হোত ঢাকায়, বাছাধন টেরটী পেতেন।"

নিরঞ্জন বলিল, "বেলা আড়াই প্রহর হইল, আমি স্নানে চলিলাম, যাবে ত' এস।" নিরঞ্জন এই কথা বলিয়া গামছায় পাক দিতে লাগিল।

দাদাঠাকুরের হুঁস নাই। তাঁহার গলায় তখনও সানাই বাজিতেছে। "তোকে চেনে কে, পোঁছে কে, তুই যে মুড়ুলি করে গাঁয়ে বেড়াস? আবার স্পর্দ্ধা কত,- দীনে বেটা তোর পেয়াদা ব'লে, তার ঘরে রেতে বিরেতে হাওয়া খেতে যাস্। ঘরে তার সোমত্ত কড়ে রাঁড় মেয়ে রয়েছে—জানিস্ না?"

খেঁকী খেঁকাইয়াই আছেন; বলিলেন, "তোর পয়সা আছে, তোর ঘরেই আছে, তাই ব'লে দীনে বেটার জাত খেলি?"

দাদাঠাকুর মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বলি, মেজ কর্ত্তা, তুমিও যে দেখি নেকা সাজলে। বোষ্টুমের আবার জাত কি? দীনে বেটার জাত থাকলে ত' জাত যাবে। আমার পরামর্শ শোন, ঐ দু গুওটারই সমাজ বন্ধ কর, ধোপা, নাপিত, পুকুর বন্ধ কর। দেখ দেখি জব্দ হয় কি না।"

খেঁকী। বলেছ মন্দ নয়। দীনের ত' জাতই নেই, কেলে দত্তও

একঘরে হয়ে আছে। জাত আর ওদের মারবো কি ? ওই, ধোপা নাপিতই বন্ধ করা যাক। কি বলহে সকলে ?

চারিদিক হইতে "হাঁ হাঁ, না না, দেখা যাক্ কি হয়, ছোট কর্ত্তা আসুন" ইত্যাদি নানা রব উঠিল। ব্যাপার ক্রমে বেশ পাকিয়া দাঁড়াইল। নিরঞ্জনের রাগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল ; কিন্তু সে যুবক, গ্রামের মোড়লেরা কথা কহিতেছেন, সেখানে তাহার কথা কাটাকাটি করা ভাল দেখায় না, তাই সে কি বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

খেঁকী মহাশয় এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বলিলেন, "যানা, চান করগে না, তোরা এখানে কেন ?"

নিরঞ্জন আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে সরিয়া পড়িল। তখন নির্ব্বিবাদে ঘোঁট চলিল। থেলো, ডাবা ও বড় হুকা অবিরাম ভুড়ুর ভুড়ুর ডাক হাঁকিতে লাগিল ; হাসির ফোয়ারা, রাগের তুবড়ি, ঘৃণা কুৎসার ফুলঝুরি প্রভৃতি নানা রসের বাজী পুড়িতে লাগিল ; সভামণ্ডপ ভোরপুর হইয়া উঠিল। দাদাঠাকুর ক্ষুধা তৃষ্ণা, স্নানাহার ভুলিয়া গেলেন ; পরচর্চ্চায় মজগুল হইয়া বাহ্যজ্ঞান বিরহিত অবস্থায় মুহুর্মুহু তামাক টানিতে লাগিলেন।

জঙ্গল রাজ্য।

নিবিড় জঙ্গল। স্তরের পর স্তর বটবৃক্ষশ্রেণী,—অনন্ত, অবিশ্রান্ত, অগণিত ;—মধ্যে গাঢ় স্তব্ধ অন্ধকার। বায়ুহীন, শব্দহীন, দিনরাত্রিহীন, জনশূন্য, সূর্য্যগ্রহাদিশূন্য, চন্দ্রতারকাশূন্য, দিগদিগন্তশূন্য, সূচীভেদ্য, স্পর্শানুমেয় অন্ধকার। স্বভাবজাত ঘনসন্নিবেশিত বিরাট বিশাল বটবৃক্ষশ্রেণী ; একটীর পর একটী অগণিতশাখাপ্রশাখাপ্রসারী বিপুলকায় বটবৃক্ষ ; সেই শাখা প্রশাখা হইতে ভূতলে লম্ববান দীর্ঘ

দীর্ঘ বটজটা ; আর সেই নিবিড় বটারণ্যের মধ্যে জটাবলম্বী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ; সেই কুটীরশ্রেণীর মধ্য দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ।

পথে দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি। পথের উভয় পার্শ্বের বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা মনুষ্য কর্ত্তৃক কর্ত্তিত ও অপসারিত। চারিদিকেই ঘনান্ধকার ; কেবল এই পথের উপরে বটপত্রশ্রেণীর রন্ধ্র-পথে বালসূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলোকের ক্ষীণ রেখাপাত হইতেছিল। সেই ক্ষীণ আলোক লক্ষ্য করিয়া দুইটী মনুষ্য সেই পথে চলিতেছিল।

প্রকৃতির দারুণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পান্থ পশ্চাতে ফিরিয়া কহিল, "ঠাকুর, কেমন দেখিলেন ?" অনুসরণকারী ব্যক্তি বলিলেন, "ওহো, আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য ! আমার জীবনে কখনও এরূপ দেখি নাই। বলিতে কি জীবন, আমি স্তম্ভিত হইয়াছি।"

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বকথিত মনুষ্যদ্বয় আমাদের চূড়ামণি ঠাকুর ও জীবন সর্দ্দার। জীবন তাঁহাকে নিজের জঙ্গল রাজ্য দেখাইয়া বেড়াইতেছে। চূড়ামণি সেই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া একবারে অবাক হইয়াছেন। তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, "নাম শুনিয়াছিলাম জীবন সর্দ্দার, কিন্তু জীবন সর্দ্দার যে কিরূপ, আর জীবন সর্দ্দারের বিশেষত্ব যে কি, তাহা এত দিন জানিতাম না। আজ বুঝিলাম, কেন জীবন সর্দ্দারের নামে ২৪ পরগণা যশোহর নদীয়ার লোকে কাঁপে ; কোম্পানীর সিপাহিরা রাম নাম কেন জপে ?

"কেন, ঠাকুর ?"

"কেন ? তাহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে ? তোমার লোকবল, অস্ত্রবল, ধনবল ও সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিবল দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গালায় এইকালে তুমি অদ্বিতীয়। তুমি ত' এখনই এ অঞ্চলের রাজা। জমিদার, প্রজা, এমন কেহই নাই যে তোমায় কোনও না কোনও উপায়ে খাজনা দিয়াছে। কালে তোমার লোকবল আরও

বৃদ্ধি পাইলে, তুমি যে এ অঞ্চলের প্রকৃত র ক্ষা হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?"

ঈষৎ হাসিয়া জীবন বলিল, "ঠাকুর, তোমার আশা দুরাশা। ইংরেজের কাছে কারও জারিজুরি খাটবে না। এখনও দেশ একরূপ অরাজক। একটু চাপিয়া শাসনদণ্ড হাতে লইলে ইংরেজ সুশাসনের গুণে সকলকে বশ করিবে। আর তাহাদের বাহুবলের সম্মুখেই বা দাঁড়াইবে কে ? এদের জাতকে বড় সোজা মনে করো না। যারা হাজার দুহাজার তৈলঙ্গী নিয়ে বাঙ্গালার নবাবের মসনদ কেড়ে নেয়, তারা যে কি তা ত' জান।"

চূড়া। জানি বৈ কি। সুধু কি আমি, বাঙ্গালার সবাই এখন বেশ জেনেছে। ইংরেজের বাহুবল, ইংরেজের সুশাসন – সবই বেশ। কিন্তু গলদও আছে। বারাসতে কোম্পানীর গোরার আড্ডাই ঐ গলদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জীব। হুঁ, হুঁ, ঐ একটা আপদ হয়েছে। বেটারা যত ছোঁড়া জাতভাইদের এনে ঐ আড্ডায় পুরেছে। তাদের খামখেয়ালীতে আশেপাশে হিঁদু মোসলমানের বাস করা দায় হয়ে উঠেছে।

চূড়া। তার উপর ঐ সোনাদানার নুনের কুঠিয়াল সাহেব আছে।

জীব। ও সব চুনোপুঁটীকে জীবন ডরায় না।

চূড়া। তুমি ত' ডরাও না, তোমার বল আছে। কিন্তু নিরীহ গ্রামবাসীরা মরে যে।

জীবন। কেন ঠাকুর, আমি ত শুনেছি ও সাহেব নিজে খুব ভাল লোক—দয়ালু, পরোপকারী।

চূড়া। তা ঠিক, কিন্তু ওর সাঙ্গোপাঙ্গের উপদ্রবের জ্বালায় যে গরীব গৃহস্থ ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে। সাহেব নিজে কিছু করে

না, সে সব জানে কিনা জানি না। কিন্তু ওর কর্ম্মচারীরা ত' বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছে।

জীব। ভয় কি ঠাকুর, যতদিন বাঙ্গালীর লাঠি সড়কী আছে, আর জোয়ান বাগদী ডোম আছে, ততদিন ওসব চুনোপুঁটীতে কিছু করতে পারবে না। আমি নিজে অনেক স্থানে ডাকাতি করতে গিয়ে জেনেছি বাঙ্গালীর গায়ে কত শক্তি। তোমাদের গাঁয়ের দর্পনারায়ণ বসুর শরীরে মত্তহস্তীর বল। ভোজনে ভীমসেন, বিশাল বিরাট দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এমন বলিষ্ঠ জোয়ান মরদ থাকিলে কি আর ডাকাতি করিতে পারিতাম ?

চূড়ামণি মহাশয় বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে এতক্ষণ নীরবে জীবনের কথা শুনিতেছিলেন ; কথা শেষ হইলে বলিলেন, "কথাটা ঠিক। দর্পনারায়ণ যথার্থই অসুরের ন্যায় বলিষ্ঠ আর ভোজনেও ভীমসেন ; তাহার তুল্য বলবান ও সাহসী বাঙ্গালী এ অঞ্চলে আছে কি না জানি না। কিন্তু তাহার আহারের কথা তুমি জানিলে কি প্রকারে ?

জীবন (হাসিয়া)।—ঠাকুর, তাঁর খাওয়া দাওয়ার কথা আর জানি না ! একবার তাঁর জ্বর হইয়াছিল ; কবিরাজ উপবাসের আজ্ঞা দেন ; কিন্তু কর্ত্তা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া, খই ও বেগুন পোড়া পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। পথ্যের পরেই কিন্তু তাঁর বিষম কম্পজ্বর আসিল। কবিরাজ জিজ্ঞাসিলেন, 'কিছু অত্যাচার হইয়াছিল কি ?' কর্ত্তা উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে না।' কবিরাজ পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, 'খাওয়া দাওয়ার,—পথ্যের ?' কর্ত্তা জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে অথচ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কিছু না, যাহা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই পালন করিয়াছি ; ঐ খই আর বেগুন পোড়া।' কবিরাজ মহাশয় কর্ত্তার ধাত জানিতেন, তাই জিজ্ঞাসিলেন, 'কিরূপ পরিমাণে পথ্য করিয়াছ ?' কর্ত্তা অম্লানবদনে বলিলেন, 'আজ্ঞে

ধামাখানেক খই আর দুকুড়ি বেগুন পোড়া।" জীবন এই কথা বলিয়া হো হো হাসিয়া উঠিল।

চূড়ামণি মহাশয় অবাক। জীবন কি সর্ব্বজ্ঞ! জীবন কি জান! কি প্রকারে জীবন দর্পনারায়ণের ঘরের কথা জানিল! দর্প-নারায়ণের প্রথম যৌবনের ঘটনা জীবন কোথা হইতে জ্ঞাত হইল!

জীবন আবার হাসিয়া চূড়ামণি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আশ্চর্য্য হলে না কি? আমি তোমাদের দাঁড়িরহাটের অনেক ঘরের অনেক খবর রাখি। একবার তোমাদের বারুই-পাড়ায় পানের বরোজে আগুন লাগে, কর্ত্তা সে সময়ে বাটীর ছাদের উপর উঠিয়া হাঁকার দিয়া লোক ডাকিয়াছিলেন। তাহাতেই আগুন নিবাইতে তিন গাঁয়ের লোক ছুটিয়া আসে, মনে নাই?

চূড়ামণি মহাশয়ের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। তিনি বিস্ময়ে অভিভূত। এই জীবন ডাকাত সত্যই কি ডাকাত নয়—কোনও মায়াবী! সে থাকে জঙ্গলে ডাকাতের সঙ্গে। সে এই সব ঘরোয়া খবর পাইল কোথা হইতে? সে ত' আজি কালিকার ঘটনা নহে। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আঃ সর্ব্বনাশ, জীবন তুমি কে?"

জীবন। ঠাকুর, আশপাশের এ সব তুচ্ছ খবর যদি না রাখিব, তো আমার ডাকাতি চলিবে কোথা হইতে? তুমি কি মনে কর?—গাঁয়ে গাঁয়ে যে আমার চর আছে।

চূড়া। তা জানি। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছ, সে ত' বহুদিনের কথা;—সে আজ বিশ বছরের কথা। সে সময়ে ত' তোমার দল ছিল না।

জীবন। 'সে অনেক কথা, ঠাকুর। সেই সব বলিব বলিয়াই তোমায় এখানে এনেছি। এস, এই গাছতলায় বসি। এখানে জনমানব নাই। এখানে গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিব।

চূড়ামণি ভাবিতেছিলেন, "কি এমন কথা, ডাকাতের আবার গুপ্ত কথা কি ?"

উভয়ে বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। জীবন চূড়ামণি মহাশয়ের পদতলে আসন লইল।

জীবন বলিল, "ঠাকুর, তোমায় কিছুক্ষণ একটা গল্প বলিয়া বিরক্ত করিব, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে হইবে। গোড়াকার কথাটা না শুনিলে, শেষের কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। কথাটা কিন্তু অনেক, সাতকাণ্ড রামায়ণের মত।"

চূড়ামণি মহাশয় কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'বল।'

জীবন বলিতে লাগিল, "বিশ পচিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের গাঁয়ে এক বালক চাকুরী করিতে আসে। বালক জাতিতে পোদ, নিবাস তার কুদুলিয়া গ্রাম। পোদের জল আচরণীয় নয় বলিয়া বালককে কেহ কর্ম্ম দিতে সম্মত হইল না। বালকের দুঃখিনী জননী সকাতরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলেন, 'আমার ছেলেকে গোয়ালের কাজে দেও। ওগো আমরা বড় দুঃখী, পেটে খেতে পাই না বলেই আমার দুধের বাছাকে কাছছাড়া করে পরের সেবা করতে রেখে যাচ্ছি। আমার শ্বশুর কুলে কেউ কখনও পরের চাকুরী করে নাই, সকলেই চাষ বাস করে খেয়েছে।' কিন্তু দুঃখিনীর কাতর ক্রন্দনে কাজ কিছুই হইল না। সেই এক আপত্তি,—জাতিতে নীচ। আর এক কথা,—আবশ্যক নাই। গ্রামের মধ্যে কেবল একজনের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। দুঃখীর মর্ম্মকথা কেবল তিনিই বুঝিলেন। তিনিই দর্পনারায়ণ। বালককে তিনিই পরম যত্নে ঘরে রাখিলেন।"

চূড়ামণি মহাশয় সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি, সে যে জীবনে পোদ! জীবন, তুমিই কি সেই জীবন ?"

জীবন সে কথার কোনও প্রত্যুত্তর না করিয়া বলিতে লাগিল,

"এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তখন তাঁহার পিতা বর্ত্তমান। তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে তাঁহার প্রাণান্ত হইয়া গেল। পিতা বড়কর্ত্তা নানা আপত্তি তুলিলেন,—'জাতে ছোট, আমাদের যথেষ্ট লোক রহিয়াছে, গোয়ালে দুইজন, বাগানে তিন চারিজন, হাটবাজারের জন্য বাটীর চাকর বাকর, আর লোকের প্রয়োজন কি?' পুত্র কিন্তু নাছোড়বান্দা, কাকুতি মিনতিতে, অনুনয় বিনয়ে, শেষে পিতা বশীভূত হইলেন। ঠিক হইল, পোদ বালক নিতান্ত অল্পবয়স্ক—প্রায় দশ বৎসরের, আর কিছু করিতে পারিবে না, কেবল বড়কর্ত্তার আদরের নাতিটিকে লইয়া থাকিবে, খেলা ধূলা করিবে; আবশ্যক হইলে গোয়ালে সদানন্দের সাহায্য করিবে; এ বাড়ী ও বাড়ী যাওয়া আসা আর ছোট খাট ফাই-ফরমাসটা খাটিবে। জননী অতিরিক্ত আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নীচজাতির কৃতজ্ঞতা যেমন আন্তরিক, এমন কি আর কাহারও হইতে পারে?"

বলিতে বলিতে জীবনের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। চূড়ামণি বুঝিলেন, জীবন কিরূপ মাতৃভক্ত; প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে কথা সত্য, জীবন। কিন্তু উচ্চজাতির দয়াও কেমন, তাহা ত' তোমারই কথায় ব্যক্ত হইয়াছে।"

জীবন ব্রাহ্মণের কথা সাঙ্গ না হইতেই আবেগভরে বলিল, "লক্ষ লক্ষ বার মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করিব। আমার শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় সেই দয়ার কথা শত সহস্র ধারে লিখিত আছে, আমার মরণান্তেও সে দয়ার কথা ভুলিব কি? দুঃখী, সহায়সম্পদহীন, সর্ব্বস্থান হইতে বিতাড়িত সেই নীচ বালককে অমন করিয়া বুকে তুলিয়া লইতে কেহ পারে কি? সে দয়ার কথা ভুলিলে আমার নরকেও স্থান হইবে না।"

চূড়ামণি মহাশয় এতক্ষণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। জীবনের কথা শেষ হইলে বলিলেন, "জীবন এইবার ত' নিজের কথায় ধরা পড়িলে। তুমি সেই জীবনই বটে, কেমন?"

"ঠাকুর, সে ত' বহুপূর্ব্বেই বুঝিয়াছ, তবে আর ওকথা কেন? আমিই জীবনদাতা, অন্নদাতা, দর্পনারায়ণ বসুর আশ্রিত পালিত ভৃত্য জীবনই বটে।"

"জীবন, দর্পনারায়ণের কথায় তোমার চোখে জল আসে কেন? দুঃখীর পুত্রকে এরূপ অনেকেই ত' পালন করিয়া থাকে। বুঝিলাম তুমি যথার্থ ই কৃতজ্ঞ।"

জীবন তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতেছে, কি একটা অব্যক্ত ভাবের আবেশে সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে জীবন বলিতে লাগিল, "শুধু কি দয়া? না, না, তোমরা জাননা; শুধু দয়া নয়,—দয়া, মমতা, আদর, যত্ন, পুত্রাধিক আন্তরিক ভালবাসা, অকৃত্রিম স্নেহ,—এ সকল অধম নীচ আশ্রয়হীন বালককে অযাচিত নিঃস্বার্থভাবে উচ্চজাতির কেহ কখনও দিতে পারিয়াছে কি? আর দয়াময়ী করুণাময়ী মা আমার, যাঁহার যত্নে আমি বাল্যে জননীবিচ্ছেদ ভুলিয়াছিলাম—তাঁহার কি আর এ জগতে তুলনা আছে?"

চূড়া। কাহার কথা বলিতেছ জীবন, গিন্নীমার—নিরঞ্জনের মাতা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর কথা বলিতেছ কি?

জীব। তাঁহার কথা না ত' আর কাহার কথা বলিব? কে তাঁহার মত পুণ্যময়ী দয়াবতী? অন্নপূর্ণা মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত হৃদয়ভরা দয়া লইয়া জগতে আসিয়াছেন। তাঁহারই দয়ায়, তাঁহারই আদরে, তাঁহারই যত্নে এই মাতৃহীন বালক জীবন পাইয়াছিল।

চূড়ামণি চমকিত হইয়া কহিলেন, "সে কি কথা,—এই ত' বলিলে তোমার জননী তোমায় লইয়া বোসেদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তবে মাতৃহীন বলিতেছ কেন?"

জীবন বলিল, "সে অনেক দিনের কথা, তখন আমার মা ছিলেন। দুঃখিনী জননী আমায় মা অন্নপূর্ণার হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বিদায় লইলেন। তখন জানিতাম না যে সেই শেষ বিদায়।"

জীবন বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় বিস্মিত হইলেন। এই বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, নরঘাতক, দুর্দ্দান্ত দস্যুর এত মায়া! ইহার গৃহ নাই, সংসার নাই, পুত্র পরিজন নাই, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন—কেহ নাই; নিরন্তর শ্বাপদসঙ্কুল ভীতিপ্রদ অরণ্যে বাস, হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও হিংস্র নির্দ্দয় মনুষ্যের সহিত ইহার বসবাস; স্নেহ, দয়া, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি অন্তরের কোমল বৃত্তি-নিচয় উপযুক্ত অবসর অভাবে স্ফূর্ত্তিহীন; অথচ ইহার রমণীসুলভ কোমলতা—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

চিন্তার অবসান হইলে চূড়ামণি মহাশয় মুখোত্তোলন পূর্ব্বক চাহিয়া দেখিলেন—একি আশ্চর্য্য! সেই নিভৃত মন্ত্রণা স্থানে কোথা হইতে কতকগুলা বিকটমূর্ত্তি যমদূতাকৃতি ভীমকায় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল? দেখিলেন, তাহারা সকলে জীবন সর্দ্দারকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে ও তাঁহার দিকে রোষকষায়িত-লোচনে চাহিয়া আছে। জীবনও এতক্ষণ অন্যমনে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ শুনিল কে যেন জলদ্‌গম্ভীরস্বরে বলিতেছে, "সর্দ্দার গোল কিসের? তোমার চোখে জল, ব্যাপার কি?" যে কথা কহিল সে আমাদের সেই পূর্ব্ব কথিত ভুতো বাগ্দী; সে কখনও সর্দ্দারের চক্ষে জল দেখে নাই। জীবনের মোহ ভাঙ্গিল; সে ভুতোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "একি,

তোরা এখানে কেন? আমার হুকুম মানিস না?" ভূতো যোড়হস্তে কহিল, "সর্দ্দার, তোমার হুকুম মানিবে না, কার এত বড় বুকের পাটা, গর্দ্দানের ভয় নাই?" জীবন বলিল, "তবে এখানে এলি কেন?" ভূতো ত্রস্তে বলিল, "পাহারা দিতে দিতে তোমার জোর আওয়াজ শুনিলাম, তাই ছুটিয়া আসিলাম।" জীবন বলিল, "আচ্ছা যা; ও কিছু নয়। যদি আকাশও ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলেও কেহ এখানে আসিবি না। আমার হুকুম।" অমনি নিমেষে দস্যুদল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

চূড়ামণি মহাশয় বিস্মিত হইয়া এই সকল দেখিতেছিলেন। দস্যুদল চলিয়া গেলে শুনিলেন, জীবন বলিতেছে, "সেই দেখা, আর দেখা হইল না। মা আমার সংসারের মায়া কাটাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। আমাদের দুঃখের সংসার; পিতা আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেহত্যাগ করেন। তদবধিই গ্রামে আমার আখ্যা হইল "বাপখেগো"। কেহই আমায় দেখিতে পারিত না, আমি সকলেরই চক্ষুঃশূল হইলাম। কেবল আমার স্নেহময়ী জননী আমায় বুকে করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। আমার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ক্রমে ক্রমে ফাঁকি দিয়া আমার যৎকিঞ্চিৎ পৈত্রিক চাষের জমিজমা কাড়িয়া লইল। নিরাশ্রয়া বিধবা জননী অতি কষ্টে পরের বাড়ী ধান ভানিয়া চাল কাঁড়িয়া আমাদের উভয়ের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতিদিগের তাহাও ক্রমে অসহ্য বোধ হইল। তাহারা নানা ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত করিয়া মায়ের নানা অপবাদ রটাইয়া দিল। সেই নিরাশ্রয়া দুঃখিনীকে দেখিলেই গ্রামের লোকে কানাঘুষা করিত; কখনও কখনও প্রকাশ্যে রহস্য বিদ্রূপও করিত; অনাথিনী শিশু পুত্রের মুখ চাহিয়া এ সকল সহ্য করিয়া রহিলেন। আমার দীর্ঘ জীবনীর কথায় আপনাকে বিরক্ত করিতেছি কি?"

চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন, "না, জীবন, তোমার কথায় বিরক্তি হওয়া দূরে থাকুক, পরম আনন্দ লাভ করিতেছি ; শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে কৌতূহলও হইতেছে। বিরক্ত হইতেছি না বটে, তবে একটা বিষয়ে বড় চমৎকৃত হইতেছি।"

জীবন সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "কি ?"

চূড়ামণি। "তুমি বাল্য হইতেই অশিক্ষিত ও নিজেও এতকাল অশিক্ষিত বর্ব্বরদিগের সহবাসেই কাটাইয়া আসিয়াছ ; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তোমার কথাবার্ত্তা ও ভাব ইতরজনোচিত নয়, বরং সুসংস্কৃত, পরিমার্জ্জিত ও শুদ্ধ—"

ঈষৎ হাসিয়া জীবন উত্তর দিল, "ঠাকুর, সেই সব কথা জানাইবার জন্যই এতটা ভনিতা করিলাম। আমি অশিক্ষিত নই ; সমস্তই বলিতেছি, আপনি দয়া করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিয়া যান।"

চূড়ামণি। বল, শুনিতেছি।

জীবন বলিতে লাগিল. "মা কেবল আমার মুখ চাহিয়াই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। সুখে দুঃখে দেখিতে দেখিতে ৭ বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটনা উল্লেখযোগ্য নাই। কিন্তু ঐ বৎসরের পর হইতেই আমাদের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন হইল।" কথা শেষ করিয়া জীবন যেন কিছু উন্মনা হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে বেশ ধীর ভাবে কথা কহিতেছিল, এখন তাহার কথায় যেন কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত স্বরে জীবন বলিল, "আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন গ্রামে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাদের সেখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমাদের কুদুলিয়া গ্রামের জমিদার দ্বারিকানাথ পালিত সেই সময়ে সপরিবারে গ্রামে বাস করিতে আসেন।"

চূড়ামণি জিজ্ঞাসিলেন, "বাস করিতে আসেন, সে কিরূপ? তাঁহারা কি গ্রামে বাস করিতেন না?"

জীবন বলিল, "না। আমার জন্মের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহারা সপরিবারে পশ্চিম যাত্রা করেন। জমিদার দ্বারিকানাথের একটী মাত্র পুত্র; সেটী তাঁহার আলালের ঘরের দুলাল ছিল। সে সময়ে তাহার বয়স সাত বৎসর। সে জন্মাবধিই রুগ্ন; কবিরাজেরা বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। পশ্চিমের জল হাওয়ায় বালক সুস্থ ও সবল হইতে পারে, এই উপদেশ পাইয়া জমিদার সপরিবারে নৌকা-যোগে পশ্চিম রওনা হইলেন। একযোগে তাঁহার দুই কার্য্য সিদ্ধ হইল, প্রথম পুত্রের স্বাস্থ্যরক্ষা, অপর তীর্থদর্শন। বারো তেরো বৎসর তাঁহারা এইরূপে নানাতীর্থ ভ্রমণ করেন ও শেষে পুণ্যধাম বারাণসীতে বহুদিন বাস করেন। পুত্র নন্দগোপাল তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়াছে। এতদিন প্রবাসবাসের পর তাঁহাদের স্বদেশদর্শনস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন কুদুলিয়া গ্রামের জমীদারভবন তাঁহাদেরই কোন নিকট আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। বহু দিন পরে বাটীর আবর্জ্জনা-রাশি পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, সাজান গোছানের তাড়া পড়িল, গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল,-- সকলেই শুনিল জমিদার আসিতেছেন। ক্রমে জমিদারের প্রত্যাবর্ত্তনের দিন সমুপস্থিত হইল; পাঁচ সাত গ্রামের লোকে দলে দলে, কাতারে কাতারে, তাঁহাদিগকে দেখিতে ছুটিল; আমার দুঃখিনী জননীও আমার হাত ধরিয়া সেই দলের সঙ্গে চলিলেন। আমরা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে রাস্তার ধারে একটা গাছতলায় বসিলাম। আমাদের সম্মুখ দিয়াই কাওরারা পাল্কী কাঁধে লইয়া ইচ্ছামতীর নৌকার ঘাটে দৌড়াইল; আমি গণিলাম— ১,২,৩,৪। আমার সে কথা আজও বেশ মনে আছে। বহুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; তখন আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই—এক

ঔৎসুক্য—জমীদার দর্শন। ক্রমে দূর হইতে বেহারাদের "হুঁ হুঁ হেঁইয়া" "হুঁ হুঁ হেঁইয়া" রব অস্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল; পরে সেই রব স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। ক্রমে বেলদারদিগের "তফাৎ, তফাৎ" চীৎকার শব্দ স্পষ্ট শুনা গেল সকলে তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। বড়রা গলা বাড়াইয়া দেখিতেছে, ছোটরা ডিঙ্গি মারিয়া দেখিতেছে। প্রথমে একখানি পাল্কি আসিল, তাহার ভিতর স্বয়ং জমিদার মহাশয়। সকলে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জয়ধ্বনি করিল; তিনিও মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। তাহার পর দুই খানি পাল্কি—দরজা বন্ধ। শেষ পাল্কিতে জমিদার পুত্র নন্দগোপাল।" বলিতে বলিতে জীবনের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। চূড়ামণি বিস্মিত হইলেন। জীবন আবার বলিতে লাগিল, "আজিও আমার সেই প্রথম দর্শনের কথা মনে আছে। নন্দগোপালকে দেখিয়াই কিন্তু সেই অল্প বয়সেই আমি ঠিক চিনিয়াছিলাম। তাহাকে আমার ভাল লোক বলিয়া মনে হইল না। পরে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলাম যে, আমার সেই বাল্যের ধারণাই অভ্রান্ত।"

জীবন কথা সমাপ্ত করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "সে তখন উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক,কিন্তু তাহার মুখে তখনও একগাছি কেশের চিহ্নও নাই। তাহার চক্ষু অত্যন্ত চঞ্চল, সে কেবল পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া দুই দিকে দেখিতেছে ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার অধরোষ্ঠ অত্যন্ত স্থূল। পরে শুনিয়াছি এই সকল চিহ্ন থাকিলে মানুষ বড়ই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়। নন্দের পরজীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণিত হয়। নন্দ মাঝে মাঝে পাল্কী থামাইয়া যেদিকে গ্রাম্য যুবতীরা অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল, সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে জিহ্বা

বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চক্ষু ঘুরাইয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল। আমি তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু পরে বুঝিয়াছি। ক্রমে পাল্কী আমাদের গাছতলার কাছে উপস্থিত হইল। মা আমার অমনি গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া জড়সড় হইয়া আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাল্কী আসিল; হঠাৎ নন্দগোপালের দৃষ্টি আমাদিগের উপর পড়িল; সেই দৃষ্টিই আমাদের কাল হইল।

"কুক্ষণে পাপাত্মা নন্দগোপাল আমার জননীকে দেখিয়াছিল। নন্দগোপাল জমিদার, পিতার একমাত্র পুত্র; বহু আরাধনার ফলে জমিদার পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে সেই আদরের পুত্র চিররুগ্ন—প্রাণের আশা পর্য্যন্ত ছিল না। বহু অর্থব্যয়ে, বহুকাল বহুদেশ ভ্রমণে, তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। কাজেই নন্দগোপাল প্রকৃতই নন্দগোপালই হইয়া উঠিয়াছিল। একে পিতামাতার অত্যধিক আদর, তাহার উপর নিজের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি— নন্দগোপাল বাল্যেই বিষম স্বেচ্ছাচারী ছিল; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গদোষে সে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও আমোদপ্রিয় হইয়া উঠিল।"

চূড়ামণি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "হইবারই কথা। ধনীর সন্তান সুশিক্ষার অভাবে এমনই হইয়া থাকে।"

"পশ্চিমে থাকিতেই নন্দগোপাল দুষ্কার্য্যে বিলক্ষণ পরিপক্ব হইয়া উঠিল। পবিত্র তীর্থ বারাণসীক্ষেত্রে ঐ অল্প বয়সেই তাহার নামে নানা কলঙ্ক রটিল। পিতামাতা পুত্রের অসন্তোষের ভয়ে কিছু দেখিয়াও দেখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন না। তাঁহারা পুত্রের বিবাহার্থে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু নন্দ সে পাত্র নয়, বিবাহের বাঁধাবাঁধির ভিতর সে যাইবে কেন? সে অবশেষে প্রকাশ্যে আপনার রক্ষিতা গণিকার গৃহে বাস করিতে লাগিল। পুত্র পর হইয়া যায়, কাজেই প্রথমে কাকুতি মিনতি, অনুনয়, বিনয়; পরে ভয় ও লোভ প্রদর্শন;

শেষে অবাধ্য পুত্রের যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিয়া পিতামাতা পুত্রের গণিকাকে স্বগৃহে আনিতেই বাধ্য হইলেন।"

চূড়ামণি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ঘোর কলিকাল!"

জীবন বলিল, "হাঁ, দারুণ কলিই বলে। সেই গণিকাই কুলবধূরূপে জমিদারের সঙ্গে আমাদের দেশে বাস করিতে আসে। এসব কথা আমি পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি।"

চূড়ামণি সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "তাহার পর, তোমার জননীর কি হইল?"

জীবন, "সবই বলিতেছি। এই সমস্ত কথা বলিবার জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়া আনাইয়াছি। বলিবার বিশেষ কারণও আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নন্দগোপাল অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। পাপিষ্ঠ কেবল বেশ্যাতেই সন্তুষ্ট ছিল না, ছলে বলে প্রলোভনে সে বহু কুল-নারীর সর্ব্বনাশ করিয়া কাশীতে পাপের স্রোত বহাইয়াছিল। দেশে ফিরিবার সময় নন্দগোপাল নানা আপত্তি তুলিয়াছিল, অমন মজার দেশ ছাড়িয়া সে আসিবে কেন? কিছুতেই আসিতে চায় না, শেষে বাপ মা 'পার্ব্বতীয়াকে" সঙ্গে লইয়া আসিতে স্বীকৃত হইলে সে দেশে আসে। দেশে ফিরিবার সময় নন্দগোপাল দুইটী সাথী আনিয়াছিল, একটী ঐ পার্ব্বতীয়া, অপরটী তাহার কদর্য্য স্বভাব।"

চূড়ামণি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "পার্ব্বতীয়া কে? সেই বেশ্যাটা বুঝি? তাহাকে লইয়া জমিদার ঘর করিতে লাগিলেন! বেশ্যাটাও বুঝি জাতিব্যবসা ছাড়িয়া গৃহস্থ হইল?"

জীবন বলিল, "সবই পয়সায় হয়। কাশীতে তাহার সব দিন অন্ন জুটিত না। পয়সার লোভে, গহনার লোভে, সে সম্মত হইয়াছিল। আর শুনিয়াছি সে জন্মবেশ্যা ছিল না, গৃহস্থের কুলবধূ ছিল, পাপের

কুহকে ভুলিয়া কুলত্যাগ করিয়াছিল। লোকে প্রথমে তাঁহাকে কুলবধূ বলিয়াই জানিত। তাহার পর কানাঘুষায় অনেকে কথাটা জানিয়াছিল। কিন্তু জমিদারের টাকা সকলের মুখ বন্ধ করিয়াছিল। যাউক সে সব কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্ব্বৃত্ত নন্দগোপালের পাপ-লালসা প্রবল। প্রবৃত্তির বশে নন্দগোপাল দেশেও নানা অত্যাচার অনাচার করিতে লাগিল। প্রথমেই আমার জননীর উপর তাহার কুনজর পড়িল। প্রথমে কাকুতি মিনতি, প্রলোভন, শেষে ভয় প্রদর্শন; তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া সে কৌশল ও বলের আশ্রয় লইল। জননীর সে সব বিপদের কথা সবিস্তারে বলিতে ইচ্ছা হয় না।"

জীবন ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইল। তাহার মূর্ত্তি তখন নিশ্চল নিষ্কম্প—সে যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। চূড়ামণি বলিলেন, "থাক, থাক, যদি তোমার কষ্ট হয়, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

জীবনের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, বলিল, "না, না, আপনাকে শুনিতেই হইবে, বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া জননী শেষে নিজের কুটীর ছাড়িয়া আমাকে লইয়া গোপনে গ্রামান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

জীবন আবার নীরব হইল। তাহার স্বভাবতঃ গম্ভীর রব স্তব্ধ হইলে পর, সেই নির্জন বনস্থলী যেন নির্জনতর অনুমিত হইতে লাগিল। দুই একটা কাষ্ঠবিড়ালী গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছিল। নাতিদূরে বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া দুইটা শাখামৃগ পরস্পর কিচিরমিচির করিয়া বকাবকি করিতেছিল। বৃক্ষ পত্রভেদী তপনতাপ ক্রমে তীক্ষ্ণতর হইতে লাগিল, সেই বিশাল অরণ্যানীর সূচিভেদ্য অন্ধকার ক্রমে অল্প অল্প অপসারিত হইতে লাগিল।

চূড়ামণি মহাশয় এতাবৎকাল একমনে জীবনের ইতিহাস শুনিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া অন্যকথা পাড়িলেন; বলিলেন "জীবন, এ জঙ্গল রাজ্যের সকলই আশ্চর্য্য। গাছের ডালে কাঠবিড়ালী দেখিলাম; গঙ্গার এপারে যাহা সচরাচর দেখা যায় না সেই বানরও দেখিলাম, অথচ একটী পাখীর ডাক শুনিতে পাইলাম না বা একটী শৃগালও দেখিলাম না। ইহার কারণ কি? এ জঙ্গলে কি পশু পক্ষী নাই?"

জীবন অন্যমনস্ক ছিল। প্রথমে চূড়ামণি মহাশয়ের কথা শুনিতে পায় নাই, তাহার পর অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে প্রশ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে বলিল, "জঙ্গলে আশেপাশে পশুপক্ষী যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ স্থানটা জঙ্গলের মধ্যস্থল, এখানে পশুপক্ষী প্রবেশ করা দূরে থাকুক, ইন্দুর মূষিকও প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ যে কাঠবিড়ালী বা বানর দেখিতেছেন, উহারা বন্য নয়, পালিত; আমরাই উহাদের এখানে ছাড়িয়া দিয়াছি। এখানে আমাদের পালিত আরও কয়েকটী জানোয়ার আছে; তন্মধ্যে দশ বারোটী বিড়াল ও চারিটী কুকুরই প্রধান।"

"তোমরা ডাকাতি করিতে মাসের মধ্যে কতদিন বিদেশে চলিয়া যাও, তখন উহাদের দেখে কে?"

"কেন ডাকাতি করি বলিয়া কি আমাদের মায়া দয়া নাই, ঠাকুর? উহাদের সেবার জন্য আমার লোক মোতায়েন থাকে। যখন আমি থাকি, তখন আমি নিজের হাতে উহাদের সেবা করি, আহার দিই। উহারা আমার বড় আদরের।"

চূড়ামণি দেখিলেন,—আশ্চর্য্য ডাকাত! জীবন্ত মানুষ মারিতে ইহাদের হাত কাঁপে না, অথচ পালিত পশু পক্ষীর সেবা নিজের হাতে করে! কথা কহিতেছে, তাহাতেও মনে হয় এ ডাকাত কেবল মানুষ মারা ডাকাত নয়, ইহারও সমাজস্থিত মানবের মত সদগুণ আছে।

জীবন হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর কি ভাবিতেছ, ডাকাতের আবার এসব গৃহস্থালী কেন, দয়া মায়ার ভণ্ডামীই বা কেন? 'না' বলিবার প্রয়োজন নাই; একথা স্বতঃই তোমার মনে উদিত হইতে পারে। কিন্তু বলিয়াছি ত' আমার সবই ছিল—সংসার ছিল, মা ছিল, সমাজ ছিল; পরে বিদ্যাও শিখিয়াছি, আমা অপেক্ষা উচ্চ সমাজে অবাধে মিশিয়াছি, ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়াছি। ছিল সবই, অদৃষ্টদোষে এখন সবই হারাইয়াছি। তাই বলিয়া পূর্ব্বের সংস্কার যাইবে কোথায়? দয়া, মমতা প্রভৃতি সবই ত' আমার ছিল, কিন্তু একে একে সব বিসর্জ্জন দিয়াছি। আগে রমণীর চক্ষে জল দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হইতাম, এখন স্বহস্তে রমণীর চক্ষে জল ছুটাইবার মত কত কার্য্য করিতেছি। আগে পরের দুঃখে হৃদয় গলিয়া যাইত, এখন পরের দুঃখে হৃদয় পাষাণের মত কঠিন হয়, তাহাতে কোনও রেখাপাত হয় না।"

চূড়ামণি মহাশয় তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, "না না, জীবন, তোমার ওসকল কথা শুনিতে চাহি না। তুমি মিথ্যা বলিতেছ। লোকে বলে তুমি অত্যাচারী ধনীর শত্রু বটে, কিন্তু গরীব দুঃখীর বন্ধু, অনাথ আতুরের মা বাপ।"

"ঠাকুর, ও সকল কথায় বিশ্বাস করিও না, লোকে আমার ভয়ে আমায় ঐরূপে বর্ণনা করে। কিন্তু যথার্থই আমি নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, আমার শরীরে দয়া মায়ার লেশমাত্রও নাই। আমি আমার নিষ্ঠুর কাজে ধরার মাঝে পাপস্রোত বহাইয়াছি। আমার নিষ্ঠুরতায় কত গৃহস্থ গৃহহীন, কত পিতামাতা পুত্রহীন, কত ধনী নির্ধন, কত দর্পী দর্পহীন, কত অত্যাচারী প্রাণহীন হইয়াছে। আমার নিষ্ঠুরতায় চব্বিশ পরগণা, যশোহর, নদীয়ার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে, গ্রামে গ্রামে রক্তস্রোত বহিয়াছে, কোম্পানীর পুলিশ সিপাহী ব্যতিব্যস্ত

হইয়াছে। নিষ্ঠুর হইয়াছি, পিশাচ হইয়াছি,—কিন্তু দারুণ অত্যাচারে, —সে অত্যাচারের কথা স্মরণ করিলে আমি জ্ঞানশূন্য হই, আমার আর তখন অত্যাচার করিতে দ্বিধা থাকে না।" বলিতে বলিতে জীবনের চক্ষু ধকধক জ্বলিয়া উঠিল, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল, দন্তে দন্ত নিপীড়িত হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর প্রলয়কালীন জলদস্বননের ন্যায় গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইল। চূড়ামণি মহাশয় জীবনের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন, ভাবিলেন "জীবন সত্যই কি এতদূর হিংস্র পিশাচ?"

ধীরে ধীরে জীবন শান্তভাব অবলম্বন করিল। জীবন বলিতে লাগিল, "দারুণ অত্যাচার, সেই অত্যাচারের ফলে আমি সব হারাইয়াছি। জমিদার স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ইহার পর দুই তিন সপ্তাহ গ্রামময় আনন্দস্রোত বহিল। জমিদার বাটীতে কয়দিন ধরিয়া পানভোজন, আদর আপ্যায়ন, রঙ্গ-তামাসা, আনন্দ উৎসবের প্রস্রবণ ছুটিল। তাহার পর যে যাহার কাজে লাগিল, দৈনন্দিন কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন জমিদার-বাটীতে আমাদের তলব পড়িল। তলবের ফলে সেইখানে ঢেঁকিশালে আমার মাতার কর্ম্ম হইল। মা প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে কাজে যাইতেন; আমিও মার সহিত কর্ম্মস্থলে যাইতাম। হঠাৎ কেন কর্ম্ম হইল, কাহার যত্নে বা উদ্যোগে কর্ম্ম হইল, তাহা তখন জননী অনুমানও করিতে পারেন নাই। পরে যখন সেই কর্ম্মগ্রহণের বিষময় ফল ফলিল, তখন সবই জানা গেল।" এই বলিয়া জীবন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

চূড়ামণি বলিলেন, "জীবন, সব বুঝিতেছি। তোমার জননীর উপর অত্যাচারের কথা সবিস্তারে বলিবার আর প্রয়োজন নাই।"

জীবন বলিল, "না, তাহা হইবে না। সে কথা বলিতে যতই কষ্ট হউক, আমাকে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেই হইবে। না হইলে

বুঝিতে পারিবেন না যে, আমি কি অত্যাচারে জঘন্য নরঘাতী দস্যু হইয়াছি। তবে আজ আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনার কার্য্যেরও ক্ষতি হইতেছে। আজ আপনাকে আপনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতেছি। আজ পঞ্চমী ; আগামী দশমী রাত্রিতে যখন গ্রামের লোকে ইচ্ছামতীর বক্ষে মায়ের বিসর্জ্জন দিতে যাইবে, সেই সময়ে বাজারখোলার মায়ের মন্দিরে (জীবন উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিল) আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব। সেই দিন আমার জীবনের অবশিষ্ট কাহিনী শুনাইব। কেমন, ইহাতে আপনার মত কি ?"

চূড়ামণি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। কিন্তু জীবন, একটা কথা জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। দারুণ অত্যাচারে তুমি ডাকাত হইয়াছ,—কেবল এই কথা শুনাইবার নিমিত্ত আমাকে এখানে আনাও নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি। তোমার আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে। তাহা না হইলে আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া, পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিয়া, আমায় ধরিয়া আনিতে না। কেমন, এ কথা ঠিক কি না ?"

জীবন হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর, আপনার মনের অগোচর কি আছে ? সত্যই আমার কিছু উদ্দেশ্য আছে, কিছু ভিক্ষা আছে। কি ভিক্ষা, বিজয়া দশমীর দিন চরণে নিবেদন করিব। ভরসা আছে, ভিক্ষায় বিফলমনোরথ হইব না।"

চূড়ামণি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট তোমার কি ভিক্ষা থাকিতে পারে, জীবন ? ভিক্ষা যাহাই হউক, ন্যায্য হইলে আমার সামর্থ্যমত অবশ্যই দিব।"

জীবন। "সে কথা পরে হইবে। এখন চলুন, আপনাকে রাখিয়া আসি।" জীবন এই কথা বলিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। পরে মুখে এক বিকট সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। অমনি সেখানে কোথা হইতে

কতকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জীবন কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গম্ভীরস্বরে হুকুম দিল, "ধাঁধাঁ লাগা, কোলাপাজুলী, ডেঙ্গা নেযা, যাবা থুবা বুনো ভুঁই, হুঁসিয়ার।"

চক্ষের নিমিষে চূড়ামণির চক্ষে বাঁধন পড়িল, চূড়ামণি শূন্যে উত্থিত হইয়া মনুষ্যস্কন্ধে বাহিত হইযা মুহূর্ত্তের মধ্যে বহুদূর চলিয়া গেলেন।

সেনজার সংসার।

"হাড় জ্বালাতন, মাস পোড়াতন। এমন সংসারের মুখে মুড়ো খ্যাংরা। আ মলো যা আবাগের বেটী গতর-খাগী, গতর খেয়েই বসে আছেন। কেন, শাশুড়ী ননদ কি তোর বাবার ঘরের চাকরাণী যে, তাদের দিয়ে সারাদিন গাধার খাটুনী খাটিয়ে নিবি! মর মর।"

"কাকে গাল দিচ্ছিস্ মা—বৌকে বুঝি?"

"না ত' আবার কাকে? বলি তুইও যে ধিঙ্গি হয়ে পড়লি দেখছি। রাত পোহালে পানের টেবলা, দোক্তার পোঁটলা, গালে পুরে বাহার দিতে গিয়েছিলি কোথায়?"

"চুলোয়—আবার কোথায়? বাবা, বাবা। পোড়া মরণও যে নেই। কথায় কথায় উঠতে বসতে খোঁটা। কেন গা, দুফেলা দুমুঠো দেও বলে বুঝি? না হয় নাই খাব।"

মায়ে ঝিয়ে সম্ভাষণ চলিতেছে। মা, নরহরি সেনের জননী; কন্যা হরিমতী, নরহরির বিধবা ভগিনী। মা রক্তমুখী; কন্যার চক্ষুতে জল, কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তে দুষ্ট হাসি।

নরহরির সংসারে নরহরি নিজে, তাহার জননী, দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দুইটী কনিষ্ঠা ভগিনী ও সহধর্ম্মিণী।

ভ্রাতাভগিনীদের মধ্যে নরহরি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—সে ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক। রামহরি ও ভজহরি তাহার কনিষ্ঠ; রামহরি বিংশতিবর্ষীয়, ভজহরি ত্রয়োদশবর্ষীয়। নরহরির ভগিনী হরিমতী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী, ও সর্ব্বকনিষ্ঠা শচীরাণী ষষ্ঠ বৎসরে পা দিয়াছে।

নরহরির পিতা রাসবিহারী সেন আজ পাঁচ বৎসর হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার বিপুল সংসার ছিল। একে একে পিতা মাতা, জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত পুত্র, খুল্লতাত ও খুল্লতাত পুত্র, দুই পিতৃস্বসা প্রভৃতি অনেকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। রহিল রাসবিহারী নিজে, তাহার কনিষ্ঠ এক ভ্রাতা ও একটী খুল্লতাত-পুত্র। তাহারা সকলেই বিবাহিত হইল। রাসবিহারীর সর্ব্বসমেত দ্বাদশটী সন্তান হইয়াছিল। তাহার ভ্রাতা ও খুল্লতাতপুত্রেরও বিপুল সংসার। কিন্তু রাসবিহারীর জীবদ্দশাতেই সংসারে অনেক শোকাবহ ঘটনা ঘটিল। একে একে করাল কাল রাসবিহারীর সাতটী সন্তান ও তাহার ভ্রাতার সমস্ত সন্তানগুলি গ্রাস করিল; রাসবিহারীর ভ্রাতা মনের দুঃখে সস্ত্রীক সংসারত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। রাসবিহারী অনেক বুঝাইল, ভ্রাতা বা ভ্রাতৃজায়াকে কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সাগরের দিকে টান ধরিলে, নদীর গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? এ দিকে রাসবিহারীর খুল্লতাত-পুত্রের শ্বশুরের কাল হইল। সে অনেক বিষয়সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়াছিল। সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা। কাজেই রাসবিহারীর খুল্লতাতপুত্র শ্বশুরের সমস্ত বিষয়ের মালিক হইল। তখন সে বাধ্য হইয়া দণ্ডীরহাটের বাস উঠাইল; বসন্তপুরে শ্বশুরালয়ে নিজের ঘর করিল। কেবল রাসবিহারী অনন্যোপায় হইয়া পৈত্রিক ভিটায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে রাসবিহারী জালালপুর গ্রামের কোনও অবস্থাপন্ন ভাণ্ডারী কায়স্থের কন্যা

মালতীর সহিত খুব ধূমধামে জ্যেষ্ঠপুত্র নরহরির বিবাহ দিল। কন্যাটী সুলক্ষণা, সুন্দরী, দশমবর্ষীয়া; পুত্র নরহরি অষ্টাদশবর্ষীয়। বিবাহের পর, তিন বৎসর খুব সুখে কাটিল। রাসবিহারী ধান্য চাউল, খড় বিচালী প্রভৃতির ব্যবসায় করিত। তাহার দুই তিন খানি নৌকাও ছিল। নৌকা তাহার নিজের কাজে খাটিত আর অবসরমত ভাড়াও খাটিত। রাসবিহারী মহাজনও ছিল; তেজারতিতেও তাহার টাকা খাটিত। কাজেই তাহার সংসারে কোনও অনাটন ছিল না। বৌটী তাহার জীবদ্দশায় বড় যত্নে ছিল। সে পিত্রালয়ে বড় আদরের ছিল, শ্বশুরালয়েও সমান যত্নে রহিল। সর্ব্বদা মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত। শ্বশুরালয়ে তাহার মনের জুটীও মিলিয়াছিল ভাল। হরিমতী তাহার সমবয়স্কা। সেও সদানন্দময়ী; প্রফুল্ল নলিনীর মত সদাই হাসিমাখা মুখে চারি দিক আমোদ করিত। তাহাকে যে একবার দেখিত,—তাহার সহিত একবার যে বাক্যালাপ করিত, সে আর তাহাকে ভুলিতে পারিত না। কথা আছে, ভালয় ভালয় মিলে ভাল। কাজেই প্রথম সাক্ষাতেই ননদে ভাজে প্রাণে প্রাণে মিশামিশি হইয়া গেল। হরিমতী মালতীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, মালতীও হরিমতীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না।

কিন্তু সংসারে সকলেই সমান হয় না। রাসবিহারীর সংসারে সুখের মাঝে এক দুঃখ ছিল। সে দুঃখ কি? তাহার সহধর্ম্মিণী মনের মত ছিল না। সংসারে সকল দুঃখের মাঝেও সুখে বাস করা যায়, যদি সুখেদুঃখেঅংশভাগিনী ব্যথাহারিণী প্রেমময়ী পত্নী ভাগ্যে জুটে। রাসবিহারী সে সুখে বঞ্চিত ছিল। তাহার যেমন সরল উদার উন্মুক্ত প্রাণ, তাহার গৃহিণীর তেমন ছিল না। সংসারের শোকে তাপে, জ্বালায় যন্ত্রণায় ভুগিয়াই হউক, আর যাহাতেই হউক, সে আমোদ

আহ্লাদ, হাস্য আনন্দ দেখিতে ভাল বাসিত না। তাহাকে সংসারে ভূতের মত খাটিতে দাও, সে অম্লানবদনে অক্লান্তভাবে সারাদিন খাটিবে; রোগীর সেবা, অতিথির পরিচর্য্যা করিতে সে যেমন পারিবে, এমন আর কেহ পারিবে কি না সন্দেহ; কিন্তু মুখটী বুজিয়া, সে কিছুই করিতে পারিবে না; যতক্ষণ কাজ করিবে, সে আপন মনে বকিয়া বকিয়া বাক্যগঞ্জনা দিয়া সকলকে বিরক্ত করিয়া মারিবে। কাহারও হাসিমুখ সে দেখিতে পারিত না, কাজেই সে অমন সদানন্দময়ী কন্যা ও বধূকে পাইয়াও সুখী হইতে পারে নাই। মনের আগুনে সে জ্বলিয়া যাইত ও সুযোগ পাইলেই উভয়কে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিত।

রাসবিহারী যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন সেন-গৃহিণী বড় একটা বাড়াবাড়ি করে নাই। তবে গ্রামের লোকে কানাঘুষা করিত, সেন-গৃহিণীর মুখের দোষে সেনেদের "ছোটরা" দেশত্যাগী হইয়াছিল। অবশ্য এ কথার মূলে কোনও ভিত্তি ছিল কি না—কেহ ঠিক বলিতে পারিত না। তাহাদের দেশত্যাগের একটা কারণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

যাহাই হউক, নরহরির বিবাহ দিয়া পরবৎসরেই রাসবিহারী কন্যা হরিমতীর বিবাহ দিল। কন্যা ভাল ঘরেবরেই পড়িল। কিন্তু বিধাতার কঠোর বিধানে—নিজের কর্ম্মফলে হরিমতী বিবাহের বৎসর দুই পরে বিধবা হইল। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেই তাহার ইহজন্মের মত নারীজীবনের সাধ ফুরাইল। সেই শোকটা কিন্তু গৃহিণীর বড় বাজিল। গৃহিণী শয্যা লইল। এত যে অক্লান্তপরিশ্রমে খাটিতে পারিত, এখন আর কিছুই করিতে পারিত না। তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, হাঁটুর বল গেল; আবার সেই সময়েই গৃহিণী অন্তঃস্বত্বা।

সার্থক রাসবিহারী মালতীকে ঘরে আনিয়াছিল। সে সেই দারুণ দুর্দ্দিনে ঐ কোমল কিশোর বয়সেও পক্ষিণী যেমন পক্ষপুটে শাবককে আশ্রয় দিয়া রাখে, তেমনি সেই বিপুল সংসারকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল। তাহার গুণে, তাহার পরিশ্রমে, তাহার যত্নে, কেহ কোনও অভাব বা কষ্ট অনুভব করিতে পারিল না। সে রাত থাকিতে কাক কোকিলের সহিত শয্যাত্যাগ করিত। ঘর উঠান নিকান, বাসন মাজা, রাঁধা বাড়া, ধানসিদ্ধ ও গোসেবা করা,—সকল কাজই সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিত। হরিমতী সাহায্য করিতে গেলে, সে পারতপক্ষে করিতে দিত না। রাসবিহারী সগর্ব্বে সকলকে বলিয়া বেড়াইত, "মা লক্ষ্মী আমার ঘর আলো করে আছেন।" বাস্তবিক আপনার গুণে মালতী সংসারের সকলকে বশ করিয়া ফেলিল। অমন যে শাশুড়ী—তাহাকেও সে সেই সময়ে আপনার মধুর স্বভাবের গুণে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কণ্টকাকীর্ণ মৃণালের উপর ফুটিয়া কমল যেমন পঙ্কিল জলাশয়কেও আপন গন্ধে আমোদিত করে, সেই শোকতাপপীড়িত সেন সংসারে মধুময়ী মালতী আপন গুণে শ্বশ্রূর মলিন মনকেও উন্নত করিয়াছিল।

কিন্তু দিন সমান যায় না। সেনেদের সংসারে ইহারই পরে শোক দুঃখ যুগপৎ দেখা দিল। সেন গৃহিণীর একটী কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ঠিক তাহারই সাত দিন পরে রাসবিহারী সামান্য জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিল। সেন-সংসারে হাহাকার উঠিল। সে শোকাগুন কিছুমাত্র প্রশমিত হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল, ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া তাহাদের বিস্তর অর্থহানি হইয়াছে। আবার একজন বড় খাতকও এই সময়ে গোপনে দেশ ছাড়িয়া পলাইল। সুতরাং সেনেদের অনেক টাকা সুদে আসলে ডুবিয়া গেল। একটার পর একটা ধাক্কার বেগ বড়ই প্রবল বলিয়া বোধ হইল। নরহরির

মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এত দিন সে কিছুই জানিত না, পাহাড়ের আড়ালে ছিল। একে পিতৃবিয়োগ, তাহার উপর অর্থহানি, আবার জননী সূতিকাগারে। নরহরি কোন দিক সামলাইবে? নরহরি বড়ছেলে, সংসারের কর্ত্তা, অথচ তখন তাহার বয়স সবে একুশ বৎসর মাত্র।

সেন-পরিবারের অতবড় বিপদের দিনেও এক জনের গুণে বিপদের মাত্রা কেহ অনুভব করিতে পারিল না। ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মালতী বুক দিয়া সকল বিপদ হইতে সংসারকে উদ্ধার করিল। তাহার অক্লান্ত কায়িক পরিশ্রমে সূতিকাগারের সকল অভাবই পূর্ণ হইত, আবার সংসারেও সকলে সময়ে সবই পাইত। শোকে দুঃখে অশৌচের কাল অতিক্রান্ত হইল। সেন-গৃহিণী আবার সংসারের কোলাহলের মাঝে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার যুঝিবার সামর্থ্য কোথায়? তাহার বুকের হাড় পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শরীরের ও মনের অর্দ্ধেক বল স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, সে কি আর তখন মানুষ আছে? হিন্দুর ঘরে স্বামীহীনা রমণীর আর কি থাকে?

গৃহিণী সংসারে পুনঃপ্রবেশ করিল বটে, কিন্তু সে আর গৃহিণী রহিল না। সে, সংসারের কিছুই দেখিত না, সংসারের কোনও কাজে থাকিত না. সকলই যেন তাহার বিষ বলিয়া বোধ হইত। বিশেষতঃ সে কোলের মেয়েকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিত না, কারণ তাহার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ঐ শিশুই সেনজার মৃত্যুর ও সংসারের সকল অনর্থের মূল। সত্য বটে তাহার জন্ম সময় হইতেই সেন-সংসারে শোক দুঃখের প্রকোপটা বড় বিষম ভাবেই পড়িয়াছিল। কিন্তু নিষ্পাপ অজ্ঞান শিশুর অপরাধ কি? আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, তাই সংসারে বিপদ আপদ ঘটিলে কাহাকেও না কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া

বসি। কচি মেয়েটা সকল অনর্থের মূল,—এ ধারণা সেন-গৃহিণীর কিছুতেই গেল না। সে সেই জন্য তাহাকে দেখিত না বা স্পর্শও করিত না, আবার যে কেহ তাহাকে লইত বা আদর-যত্ন করিত, তাহাকেও দেখিতে পারিত না। শাশুড়ীর গঞ্জনা বা লাঞ্ছনার ভয় না করিয়াও, মালতী সেই নিরাশ্রয় শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল। আয়ু থাকিলে মানুষ মরে না, তাই সে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল মালতীর যত্নে বাঁচিয়া গেল। ঘরে গাভী ছিল, মালতী তাহারই দুগ্ধ তুলায় ভিজাইয়া শিশুকে সময়মত খাওয়াইত। শিশু কাঁদিলে, গৃহিণী রাগে আছড়াইয়া মারিতে যাইত; মালতী অমনি বুক দিয়া আগলাইয়া মারের ভাগটা নিজের পৃষ্ঠে বহন করিত। সেইজন্য ইদানীং সে শাশুড়ীর দুই চক্ষের বিষ হইয়াছিল।

কন্যা হরিমতী সংসারের ধার ধারিত না। সে বনের পাখীর মত মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া কাল কাটাইত। পিতৃ-শোকটা কিন্তু তাহাকে বড় বাজিয়াছিল। সে সেই শোকের সময় তিন চারি দিন উঠে নাই, খায় নাই, শোয় নাই। সেই শোক সে কখনও ভুলিতে পারে নাই, তাহার অফুরন্ত হাসির কোণেও ঈষৎ কান্না লুকাইয়া থাকিত। সে বড় কোমলপ্রাণা, কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিতে পারিত না, বা শোক-তাপও সহ্য করিতে পারিত না। তবে সংসারে তিন দিন উপবাসে থাকিতে হইলেও তাহার কষ্ট বা ভাবনা হইত না; সংসারে অর্থাভাব হইল বা না হইল, সংসারের অনাটনের মাঝে গুছাইয়া সংসার চালাইতে হইবে কিনা,—তাহার জন্য বড় একটা তাহার মাথাব্যথা হইত না। সংসার হাজিয়া মজিয়া গেলেও তাহার পাড় বেড়ানো বা গল্প-গুজব করা কামাই যাইত না। কেবল একটী বিষয়ে তাহার বড় মনোযোগ ছিল। মালতীর কষ্টের কথা মালতী কাহাকেও জানিতে না দিলেও, সে তাহার কষ্ট বুঝিত ও যথার্থ তাহার

ব্যথার ব্যথা ছিল। সে সুবিধা পাইলেই মায়ের অকারণ কোপ হইতে মালতীকে বাঁচাইতে যাইত ও সেই জন্য তাহার ভর্ৎসনার অংশ ভাগ করিয়া লইত। সংসারে মালতীর কষ্ট বুঝিত ও তাহাকে যথার্থ ভালবাসিত আর একজন—সে রামহরি, নরহরির কনিষ্ঠ।

ঘটনার দিন মালতী প্রত্যুষে উঠিয়াই ঘর উঠান ধুইয়া পুঁছিয়া, বাসন মাজিয়া, গো-সেবা করিয়া, রান্না চড়াইয়া দিয়াছে. এমন সময় শচীরাণী (রাসবিহারীর সেই শিশুকন্যা এখন পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে) শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বোসেদের পূবের বাটীতে খেলিতে যাইবে বলিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল; হঠাৎ তাহার পায়ে লাগিয়া দাওয়ার উপর হইতে এক ভাঁড় গুড় উঠানে পড়িয়া গেল। সারা উঠান সেই মাত্র মালতী নিকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে সিন্দুরবিন্দু পড়িলেও তুলিয়া লওয়া যায়; আর সেই চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে উঠানময় গুড় ছড়াইয়া পড়িল। শচী তৎক্ষণাৎ চম্পট দিল। কিন্তু বিপদ হইল মালতীর। কলসীপতনের ধিকটশব্দে মালতী রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিল, সেন-গৃহিণীও পশ্চিমের বড় ঘর হইতে বাহির হইল। আর যায় কোথা! সেন-গৃহিণীর ধ্রুব বিশ্বাস হইল, কলসী মালতী ফেলিয়াছে। মালতী শচীকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়াছে, সেন-গৃহিণী দেখে নাই। কাজেই ঝড়টা মালতীর উপর দিয়াই বহিয়া গেল। "চোকখাগী", "গতরখাগী", "চোখের মাথা খেয়েছে", "দেখ্‌তে পায় না", "গতর নেই", "ভাঙ্‌তে ফেলতে যোড়া নেই", "সকাল থেকে কেবল পেটের চেষ্টা", "খেয়ে খেয়েই মলেন", "জিনিষের দরদ নেই", "সংসারের সাশ্রয় নেই", "হবে কেন?" "ভাতার মোট বোয়ে এনে দেবে, পায়ে করে ছান্‌বে", "সব ওঁর গোলাবাড়ীর চাকর", "কেন খাটবো কেন?", "কি দুঃখে", "আ-মোলো. নবাব থাক্‌বেন বোসে, শাশুড়ী ননদ ক'র্‌বে দাসীপনা",—ইত্যাদি অবিরাম বাক্যস্রোত বহিল। মালতী শাশুড়ীর

ধাত জানিত। কথা কানে না তুলিয়াই সাধ্যমত যতটা সম্ভব গুড় তুলিতে লাগিল। গুড় তোলা হইলে আবার উঠান পরিষ্কার করিল। কাজ শেষ হইলে রান্নাঘরে গেল। এদিকে সমানে ভর্ৎসনা-স্রোত বহিতে লাগিল। বাটীতে তখন কেবল ভজহরি আছে। গত রাত্রে তাহার কয়েকবার ভেদ বমি হইয়াছিল। শেষ রাত্রি হইতে সে ঔষধের গুণে অকাতরে ঘুমাইতেছে। মায়ের চীৎকার তাহার কানে যায় নাই। হরিমতী পূজা বাটীতে গিয়াছে। ছেলেরা কাজে বাহির হইয়াছে। নরহরি পূজাবাটীতে পুরোহিতমহাশয়দিগের পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছে, রামহরি বোঝাই নৌকার ধান্য খালাস করিতে গিয়াছে।

বেলা এক প্রহর অতীতপ্রায়, অথচ সেন-গৃহিণীর বাক্য-স্রোতের বিরাম নাই। সে কলকল ধ্বনি বহুদূরেও শুনা যাইতেছে। বাঁধা বকুলতলায় সমাগত গ্রাম্যজনমণ্ডলী প্রাতে ঐ মধুর স্বর শুনিতেছে, আর "দূর্গা দূর্গা" বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। ঠিক সেই সময়ে পূজা-বাটীতে জোরে ঢাকের কাঠি পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর গলা আরও চড়িল। ঢাক থামিল, কিন্তু গলা থামিল না। ইতিমধ্যে হরি-মতী বাটী ফিরিল। পথেই সে মায়ের ঝঙ্কার শুনিল। একবার ভাবিল ফিরিয়া যায়, আবার কি মনে করিয়া গৃহপ্রবেশ করিল, করিয়াই জিজ্ঞাসিল, "কাকে গাল দিচ্ছিস্ মা, বৌকে বুঝি"।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। এতক্ষণ কথার জবাব না পাইয়া গৃহিণীর ক্রোধের মাত্রা কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু হরিমতীর সাড়া পাইয়াই গৃহিণীর নির্ব্বাণপ্রায় ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সেও উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া হরিমতীকে জবাব দিল। হরিমতীও তাহাই চায়। যে উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করিব না ভাবিয়াও সে ঘরে আসিয়াছিল, তাহা সফল হইল; বৌএর উপরের রাগটা সে নিজস্কন্ধে চাপাইয়া

লইল। জননীকে ঠাণ্ডা করিবার ঔষধ সে বিলক্ষণ জানিত, তাই সে নিজের বরাতের কথা লক্ষ্য করিয়া ছল করিয়া কাঁদিয়া দুই এক কথা বলিল। অন্যদিন হইলে এইখানেই সব গোল চুকিয়া যাইত। কিন্তু আজ হিতে বিপরীত হইল, জননী বিপরীত বুঝিল। গৃহিণী চোখ পাকাইয়া বলিল, "কাকে ভয় দেখাচ্ছিস্ লা? কোন চুলোয় যাবি যানা। ওঁর বড়মানুষ শ্বশুরঘরের খোঁটা আর সইতে পারিনি বাপু।"

অন্য কথা হইলে হরিমতী গায়ে মাখিত না। কিন্তু শ্বশুরঘরের কথা হতভাগিনী বাল-বিধবা সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিল, "গাল দিবি আমায় দেনা মা, শ্বশুরঘর কি দোষ কর্‌লে বল দেখি?"

সেন-গৃ। আহাহা, দেখিস্! নামে যে একবারে টস্ বেয়ে পড়্‌ল! তবুও যদি ঘর কত্তিস্!

হরিমতী কাঁদিয়া ফেলিল। মালতী ছুটিয়া আসিয়া হরিমতীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। হরিমতী মালতীর কাঁধে মাথা রাখিয়া অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল। মালতী তাহাকে বেষ্টন করিয়া চোখ মুছাইয়া মধুর সান্ত্বনাবাক্যে বলিল, "ছিঃ বোন, কান্না কেন? মায়ের কথায় কি রাগ দুঃখ ক'র্‌তে আছে? শোকে তাপে ওঁর মাথার ঠিক নাই, কি বল্‌তে কি বলেন।" হরিমতী আরও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মালতী আবার বলিল, "কই ভাই, তোমার হাসি হাসি চোখে কখনও ত' জল দেখিনি। চুপ কর।" হরিমতী কতক শান্ত হইল।

এদিকে আঙ্গিনায় তখন তুমুল ঝড় বহিতেছিল। গৃহিণী রক্তমুখী, অবিশ্রান্ত বাক্যবাণ বরষিতে লাগিল,—"গেলোরে ছুঁচো কালগু হেগে। আ মর, বুকের পাটা দেখ! আমার সুমুখে দরদ দেখিয়ে ননদকে সোহাগ করে নিয়ে গেল। বলে মার চেয়ে দরদ বেশী,

তারে বলি ডান। বাঁজা মাগীর মুখ দেখ্‌লে প্রাচিত্তির কর্‌তে হয় জানিস্ নি? বেটার আবার বে দিয়ে মুড়ো খেংরা মেরে দূর কর্‌বো, হারামজাদী ডাইনি।"

মায়ের বিষম চীৎকারে ভজহরি উঠিয়াছে। সে ক্ষীণস্বরে জননীকে চুপ করিতে বলিল। কিন্তু তাহার কথা ঘরের বাহিরে পৌঁছিল না। তাহার উঠিবার সামর্থ্য নাই। কাজেই সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। হরিমতীর কান্না দূর হইল, ছুটিয়া বাহির হইয়া মায়ের মুখবন্ধ করিবার জন্য যাইতেছিল, মালতী আঁকড়িয়া ধরিল। হরিমতী চেঁচাইয়া বলিল "না, না, ছেড়ে দাও। এ কি অন্যায়, যা নয় তাই বলে গাল দেবে। আমি মেজদাদাকে ডাকাচ্ছি।"

বাহিরে গর্জ্জন হইল, "হাঁ হাঁ ডাকা, কোথায় তোদের কে কে আছে সব্বাইকে ডাকা। আমার এই কখানা বুড়ো হাড় বইত নয়। সকলে মিলে এক এক ঘা দে, আপদ বালাই ঘুচে যাবে। মা গো মা, কি যাদুই রাক্কুসী করেছে, ছেলে মেয়ে সব পর কর্‌লে! আসুক আজ সেই মাগের ভেড়ো নোরা, এর বিহিত কর্‌তে পারি ত' জল খাব, নইলে ঘর সংসারে আগুন দিয়ে একদিকে চলে যাব। জোট পাকাচ্ছে, জোট পাকাচ্ছে, ওরে সর্ব্বনাশীরে জোট পাকিয়ে আমার কর্‌বি কি? আমি তোদের খাই, না পরি? অলুক্ষুণে বেটী যে দিন থেকে সংসারে পা দিয়েছে, আমার সংসার গোল্লায় দিয়েছে। সর্ব্বনাশী, ছোটনোকের মেয়ে, চুলোয় যা, উচ্ছন্ন যা।"

হরিমতী চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে গজরাইতে গজ্‌রাইতে বলিল, "শুন্‌লি শুন্‌লি, বউ। ওমা এমন গাল ত' বাপের জন্মেও শুনিনি। এ গাল শুনে কে চুপ ক'রে থাকৃতে পারে বল্ দেখি!"

মালতী হাসিয়া বলিল, "কেন আমি ত' চুপ করে আছি।"

হরিমতী। "ধন্যি তোর সহ্যগুণ।"

মালতী বলিল, "মার কি গাল, ও যে আশীর্ব্বাদ।"

হরিমতী অবাক হইয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, "বোন্, আমার চেয়েও তুই দুঃখিনী। আমি জানি আমার নাই, কিন্তু তোর থেকেও নাই। স্বামী যদি স্ত্রীর কষ্ট না বুঝ্‌লে ত' স্ত্রীর কি সুখ? আহা দাদা যদি মানুষ হ'ত!"

মালতী ত্রস্তে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল, "মরণ আর কি, ও কি কথার শ্রী। কেন আমার আবার কষ্ট কি? আমি যেন জন্ম জন্ম এমনই কষ্ট পাই।"

হরিমতী। "কে জানে ভাই, তোমার কেমন সহ্যগুণ। আমি ত' একতিলও ঝগড়া কিচিমিচি ভালবাসি না।"

মালতী তাহার মুখখানি ধরিয়া বলিল, "তা আর জানি না। আমার জন্য কি না সহ্য কর। এখন যাও, হাসিমুখে মাকে বুঝাও গে। ছোট ঠাকুরপো এই শেষ রাত্রে অনেক কষ্টে ঘুমিয়েছে, এখনি চেঁচা-মেচিতে উঠে পড়্‌বে।" হরিমতী শশব্যস্তে বলিল, "ওমা সত্যিই ত'। ভজার কথা কিছু মনে নাই গো।"

হরিমতী বাহিরে আসিল। সদানন্দময়ী সে, ইহারই মধ্যে সব ভুলিয়া গিয়াছে, আবার তাহার মুখে হাসি দেখা দিয়াছে। তৈলের বাটী লইয়া সে জননীর পদতলে বসিল, বলিল, "মা, চুপ কর্, ভজা এখনি উঠিবে। বেলা হল, নাবিনি? আয়, পায়ে তেল মাখিয়ে দিই।" গৃহিণী পা টানিয়া লইতে লাগিল, অথচ অনিচ্ছাও দেখাইল না। হরিমতী হাসিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী, রেগে রেগেই মলেন।" এই কথা বলিয়া সে মায়ের পায়ে তৈলমর্দ্দন করিতে লাগিল। কন্যার আদরে গৃহিণীর রাগ পড়িয়া গেল, কিন্তু কান্না আসিল,—"আমার ত' এখন মলেই হল, আমার আর কে আছে বল। নরুর একটা

খুদকুঁড়োও হল না যে, কোলেপিঠে করে ভুলে থাকি। কেনই বা সংসারের কোঁদলে থাকি। কটা দিন কাটালেই বাঁচি। ওগো তুমি কোথায় ফেলে রেখে গেলে গোঁ” ইত্যাদি।

ঠিক সেই সময়ে নরহরি পূজাবাড়ী হইতে নানা ফল মিষ্টান্ন লইয়া প্রবেশ করিল, নরহরিকে দেখিয়া গৃহিণীর কান্নার মাত্রা আরও চড়িল। নরহরি ত অবাক। সে নিপাট ভালমানুষ, সাতেও থাকিত না, পাচেও থাকিত না। মা বলিতে সে অজ্ঞান. সংসারে মাই তাহার জাগ্রত দেবতা। সেই মায়ের চক্ষে জল! নরহরির মুখে আর রা নাই। তাড়াতাড়ি খাবারগুলা দাওয়ার উপর রাখিয়া দিয়া সে মায়ের পদতলে বসিল। মায়ের পদযুগলে মুখ রাখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল। অতি অল্প বয়সেই সংসারের ঝড় ঝাপটা তাহাকে বহিতে হইয়াছিল। সেই ভার লইতে সে অক্ষম, তাহার স্বভাবই সেইরূপ উপাদানে গঠিত; কিন্তু বিধাতা তাহার ঘাড়েই ভার চাপাইয়া দিলেন। তাহার ডাক ছাড়িয়া কান্না পাইত। সে চাঁয় বেশ নির্ব্বিবাদে খাটিয়া খুটিয়া সংসারের অভাব পূর্ণ করিবে, আর আরামে কাল কাটাইবে। ঝঞ্চাটে, বিপদে, সংসারের কোলাহলে সে দিশাহারা হইত। কাজেই জননীকে কাঁদিতে দেখিয়া, সেও চারিদিক আঁধার দেখিয়া, সেই কান্নায় যোগ দিল।

কান্নার কেমন একটা সংক্রামক গুণ আছে। মায়ে পোয়ে এক-যোগে কান্না, কাজেই কেমন স্বতঃই হরিমতীর চক্ষে জল আসিল। তখন কান্নার একটা বিরাট ধূম পড়িয়া গেল। কেন কাঁদিতেছে, কিসে কাঁদিতেছে,—কেহই জানে না, অথচ সকলে কাঁদিতেছে, কান্নার আর বিরাম নাই।

এমন সময়ে মাথার কুঞ্চিত কেশরাশি নাচাইতে নাচাইতে, হাসির রোলে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইতে কাঁপাইতে, শচীরাণী কোথা হইতে ছুটিয়া

আসিল। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিল, মা কাঁদিতেছে, দাদা কাঁদিতেছে, দিদি কাঁদিতেছে। হঠাৎ তাহার হাসি থামিয়া গেল; ওষ্ঠের উপর ক্ষুদ্র অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া সে তাহাদের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে এক পা এক পা করিয়া গুটী গুটী অগ্রসর হইয়া দিদির কোলে গিয়া বসিল। দিদির হাতটী আপন হাতে লইয়া দিদির মুখপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসিল, "দিদি, কাদ্‌ছিস্ কেন লা। কাল তোকে রমণদাদা যখন গাল দিচ্ছিল তখন কাঁদছিলি, আজ আবার তাই কাঁদছিস?"

কথাটা শুনিয়াই মা ও ছেলে চমকিয়া উঠিল। সকলেরই কান্না থামিল। নরহরি হরিমতীকে জিজ্ঞাসিল, "সেকি?" হরিমতী জড়সড় হইয়া গায়ের কাপড়চোপড় টানিয়া দিয়া, শচীরাণীকে ক্রোড়ের মধ্যে আরও টানিয়া লইয়া টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, কিছুই নয়। হাঁ লা শচী, পূজোবাড়ীতে খাঁড়াপুলের সানাইদারেরা সব এসে পৌঁছেছে?" শচীরাণী পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া গিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, "হাঁ দিদি, তারা সব এই এলো। মেদী এয়েছে, ফটকে এয়েছে, মেদীর ছেলেরা এয়েছে। কত বাজনা, কেমন ঢোল! দিদি, দেখতে গেলি না? তারা নাইতে গেছে। ও বেলা কত বাজনা হবে, আমি যাব, হোঃ হোঃ হোঃ," বলিয়া সে করতালি দিয়া উঠিল।

নরহরি বালিকার কথায় পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়াছিল; গৃহিণী ভুলিবার লোক নহে। কথাটা কেমন খট করিয়া তাহার কানে বাজিয়াছিল। হরিমতী কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করাতে, তাহার মনে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। স্ত্রীলোকে পুরুষকে সহজে ভুলাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোককে পারে না। গৃহিণী কন্যাকে জিজ্ঞাসিল, "হাঁ লা, রমণের কথা খুকী কি বলছিল লা? রমণ কে, উত্তরো বাড়ীর সেজকর্ত্তার ছেলে?" শচীরাণী আপনা হইতেই জবাব দিল, "হাঁ, মা,

ওই ভুলোর দাদা। কাল আমরা বামুনবাড়ী পূজোর সিধে নিয়ে যাচ্ছিলাম। রমণদাদা বাঙ্গোড়ের ধার থেকে বেত কেটে আনছিল। কাঁকফুলতলায় আমাদের দেখতে পেয়ে, ছুরি দিয়ে বেত কাটতে কাটতে, হেসে হেসে দিদিকে কি বল্লে। দিদি তাকে রেগে কি বল্লে আর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্লো। রমণদাদা আমাদের পেছু পেছু ছুটে এসে, দিদির হাত ধরে গাল দিলে। দিদি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কেঁদে ফেল্লে। রমণদাদা ছুটে পালিয়ে গেল। না দিদি ?"

তাহার দিদি এতক্ষণ তাহাকে কত টিপিয়া টুপিয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিতেছিল ; "খুকি, এড়াভাত খাবিনি ?" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে এড়াভাত আনিয়া খাইতে দিল। তখনকার কালে প্রাতে বাঙ্গালীর ঘরের বালক বালিকাদের জন্য বাসি কাপড়ে একদফা ভাত রাঁধা হইত, তাহার ফেন গালা হইত না। তাহাই গুড় তেঁতুল দিয়া বালকবালিকারা প্রাতে খাইত। তখনকার কালে, ভাতই প্রাতে ছেলেদের জলখাবার ছিল ; যুবক, প্রৌঢ় ও স্ত্রীলোকদিগের গুড় মুড়ি ও নারিকেলের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু হরিমতীর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

নরহরি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কই, পুঁটী, এ কথাত' তুই আমাদের বলিস নাই! এ সকল সত্য ?"

হরিমতী, "না না, ও কিছু নয়, খুকী কি বলে আর কি হয়। ও সব কিছু না। রমণদাদা আমায় ভয় দেখাচ্ছিল।"

নরহরি, "না না। এ সব উড়াইয়া দিবার কথা নয়। বল্ কি হয়েছিল। নইলে আমি এখনি গিয়ে একটা হুলস্থূল বাধাব।"

হরিমতী বিষম ভয় পাইল। যাহার ভয়ে সে কথাটা গোপন করিতেছিল, সেই হাঙ্গামা বাধিবার কথা শুনিয়া সে বড়ই উদ্বিগ্ন

হইল। সে সভয়ে বলিল, "সব বলছি, দাদা। কিন্তু তুমি কোনও হাঙ্গামা করবে না বল। তোমার পায়ে পড়ি, আমার জন্যে ঝগড়া কোরো না।"

নরহরি কোনও কথা যেন শুনিতে না পাইয়া বলিল, "কি হয়েছিল, বল"

হরিমতী, "রমণদাদা আমায় মাঝে মাঝে ঐ রকম ভয় দেখায়। আমি ওর কথা গায় মাখি না। জানি কি না, ওর একটু পাগলের ছিট আছে। কাল আমায় কুকথা বলেছিল। আমি যা ইচ্ছে তাই বলে গাল দিয়ে ভয় দেখাতে পালিয়ে গেল। আর কখনও কিছু বল্‌তে সাহস করবে না। আর আমার জন্যে ভয় কি?"—হরিমতী আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দাদার গম্ভীর মুখভাব নিরীক্ষণ করিয়া, কথা ঘুরাইয়া লইয়া সকাতরে বলিল, "দাদা, জানইত ও পাগল।"

গৃহিণী মনে মনে গজরাইতেছিল, এইবার বরষিল, "পাগল? ওর মাথা গোল! আ মলো নচ্ছার ছোঁড়া, এত বড় বুকের পাটা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! জানিস্‌নি, কার জমীতে বাস করি, তার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়! বল্‌বে না, বোসেদের বলবে না, হ'ল ত' কি বয়ে গেল? সে এমন ছোটকত্তা নয়, আপনার ছেলে হলেও মাথা কেটে বাঙ্গোড়ের জলে ভাসিয়ে দেবে।" নরহরি ও হরিমতী উভয়ে ভীত হইয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ, চুপ চুপ, মা কর কি? গাঁয়ের লোক শুনে এখনি ছুটে আসবে যে। এই তুচ্ছ কথা নিয়ে শেষে কি তুমুল কাণ্ড বাঁধাবে?"

"তুচ্ছ কথা? বলি তোদের আক্কেলটা কি? সোমত্ত গেরোস্তর ঝি বউ নিয়ে পথে ঘাটে ঠাট্টা তামাসা—তুচ্ছ কথা? ও ছুঁড়ির কথা ত' ছেড়েইদে, পোড়ারমুখ কিছু বোঝে না, রাতদিন হেসেই মরেন, হেসে হেসে ঢলেই আছেন। তুই মেনিমুখো, পুরুষমানুষ না ভেড়া?

বোনকে তামাসা করে, আর বলে চুপ কর! মর মর, কেন চুপ করবো কেন? হলোই বা তারা বড়নোক, কেন গরীবের কি ধম্ম নেই, মান নেই, ইজ্জত নেই?"—

নরহরি মায়ের দুটী হাত ধরিয়া বলিল, "মা, চুপ কর মা, চুপ কর। দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে শপথ করছি, এর বিহিত করবোই করবো। তবে এখন মিছা-মিছি গণ্ডগোল করে লোকজানাজানির দরকার কি? লোকে শুনলে কেবল গাল কাত করে হাসবে বইত' নয়। আর এদিকে রামারও আসবার সময় হোলো।"

হরিমতী তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সভয়ে বলিল, "হাঁ মা, মেজদাদা এল বলে। জানিস ত' সে কেমন গোঁয়ার।"

নরহরি, "সে শুনলে আর রক্ষা রাখবে না। বুনো মোষের মত এখনই ছুটে বেরোবে আর একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাবে।"

রামহরির নামোল্লেখ হইবামাত্র গৃহিণীর একবারে বাক্‌রোধ হইল, যেন সে মানুষটী আর নাই। জগতে যদি কাহাকেও গৃহিণী ভয় করিত, ত' ঐ এক রামহরিকে। রামহরি আর সকলই সহ্য করিতে পারিত, পারিত না কেবল অন্যায় ও অসত্য—তা সে যাহারই হউক। এইজন্য অনেক সময়ে তাহাকে বিপদে আপদে পড়িতে হইত; অনেক সময় ভ্রাতা নরহরিকে তাহার জন্য বেগ সামলাইতে হইত।

ঠিক সেই সময়ে বাহিরে গম্ভীরস্বরে কে ডাকিল, "বলি, বড় সেনজামশাই, ঘরে আছো কি?" নরহরি, "কে ও নাজীরদা?" বলিয়া বাহিরে গেল; দেখিল, মুসলমানপাড়ার নাজীর গাজী দ্বারে দাঁড়াইয়া; তাহার নিকট প্রকাণ্ড এক মৎস্য। নরহরিকে দেখিয়া সে বলিল, "সেনদা, ঘা-ঘাডায় মেজো-সেনজার সাথে সেক্ষেৎ হয়েলো। মেজো-সেনজা মোরে মাছডা দেলে। মুই কাজ সেরে গাঁয়ে এসুতেছেলাম

মোরে দেখ্‌তি পেয়ে মাছ তেনার ঘরে পৌঁছি দিতি ক'য়ে দিলে, তেনার কিছু কাজ আছে, পরে এস্‌তেছে।" নরহরি নাজীর-গাজীর নিকট হইতে মৎস্য লইয়া নাজীরকে বাহিরের দাওয়ার উপর বসিতে বলিল।

নাজীর বলিল, "না দাদা, আর বস্‌বো না, বেলা দুপহর হলো, নেতি খেতি হবে, আবার ফুলবাড়ীর মোড়লগার ছাওয়ালের সাথি বকনা গাইডার কেনা বেচার কোথা কইতি খানার পরই ছুটতি হবে।"

নরহরি হাসিয়া বলিল, "সে কি হয় নাজীর দা, বোস, একটু জিরোও, তামুক খাও, তার পর যাবে।" এই কথা বলিয়া নরহরি ডাকিল, "পুঁটী, ও পুঁটী, ওরে মাছ নিয়ে যা, রামা মাছ পাঠিয়েছে।"

নাজীর "আর তামুক খাইব না" বলিয়া উঠিবে উঠিবে করিতেছিল, এমন সময় দাদার ডাকে পুঁটী ও খুকী দৌড়িয়া বাহিরে আসিল। বৃহৎ রোহিত মৎস্য দেখিয়া দুইজনেরই মহা আহ্লাদ :—"বাঃ বাঃ, কেমন মাছ? মেজদা কোথা পেলে, নাজীর দাদা?"

নাজীর বলিল, "তা ত' কইতি নারলাম পুঁটী দিদি, মোরে দেলে, মুই নিয়ে এলাম, এখন মোরে নেদে খাওয়া।" বলিয়া সরল, উদার, বৃদ্ধ পল্লিবাসী হা হা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

পুঁটী অর্থাৎ হরিমতী অমনি বলিল "তা দাদা, তোমায় না খাইয়ে ছাড়বো না ত। সত্যিই তোমায় এই দুপুর রোদ্দুরে না খেয়ে যেতে দিচ্ছি কি না!"

নাজীর দেখিল সর্ব্বনাশ, পাগলীকে খেপাইয়া ভাল করে নাই, সে তাহার রীতি জানিত। খাইতে উপরোধ করিলে, না খাইয়া গেলে, মাথা কোটাকুটী করিবে। তখন নাজীর শশব্যস্তে বলিল, "হাদে পাগলী বুড়ী, তোজা বাড়ী ত মোর বাড়ী। মুই খিধে নাগলিই ত

ছুটে আসি, কদ্দিন খাইছি তার কি গন্তি আছে? আজ মোর হাল কেনা আছে, বকনা এড্ডা কেনা আছে। আজ এখুনই যাতি হবে

ইতিমধ্যে নরহরি তামাক সাজিয়া আনিল। বৃদ্ধ নাজীর যথার্থই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। বড় আরামে তাই সে তামাক খাইয়া শ্রান্তি দূর করিয়া লইল। হরিমতী ও খুকী মাছ লইয়া ভিতরে গেল।

তামাক খাইতে খাইতে নাজীর বলিল, "বড় সেনজা, ও দত্ত-মশাইর ভাবডা কি বুঝতি পারো? মোরা ত ভেবাচাকা নেগে গেলাম। কুঠীর লেঠেল নিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরতি নেগেছে। আবার সাথে টাকার থোতে। মোর কাছে একদিন এয়েলো। মোরে বলে কি, বড় সেনজামশাই, মোরে বলে কি"—বলিয়া নাজীর নরহরির গা ঘেঁসিয়া বসিয়া অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—"বলে, গাজীর পোলা, বুড়ো বয়েসি নাঙ্গোল ঠেলে, খড় বয়ে মরিস কেন? ছাওয়ালদের সাথে কুঠীতি কাজ করবি আয়, আগাম টাকা পাবি। আর কুঠীর কাজডা কি? খাটতি হবে না। বসি বসি টাকা গুণবি।' মুই বল্লাম, 'হাঃ তোর নি কিছু করেছে। কেডা তোর কুঠীতি যাবে? মোর বাপ চাচারা এই হাল ধরে ঘরে বসে দিন কেটিয়েছে, মুই কুঠীর গোলামী করবো কেন বলদিনি? আল্লা মোরে হাত পা দেয়নি, জোয়ান সব ছাওয়াল দেয়নি?' ওই ঝেমনি মোর মুয়ের ঝামটা খেয়েছে, আর দত্তোর পোলা পড় পড় কোরে দৌড় মেরেছে।" নাজীর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, নরহরিও সে হাস্যে যোগ দিল। নাজীর আবার বলিল, "আবার দত্তোর পোলা আছিরদ্দি মণ্ডলের কাছেও গিয়েলো। মণ্ডলের পোও তারে খুব কয়েছে, বলে, 'কেন মুই তোর হাড়, চামড়া, মুনির আড়তি ঝাবো কেন?' ছিরে বাগদী, হুটো কাপালী, বিশে কাওরা—সবাইর মুখি ঐ এক কথা। সবাই

তেড়িয়ে দিয়েলো। কেবল মজালে ঐ হারামজাদা মাণিকগাজীর দুই ছাওয়াল মিঞাজান আর দেরাজ ”

নরহরি নাজীরের নিকট কলিকা লইয়া বলিল, “কেন, আমাদের দীনো বষ্টুম ?”

নাজীর, “সেনজামশাই, ওর কথাডা ছেড়ি দিতি হচ্ছে। বষ্টুম বুড়ো গাঁয়ে বাস করলে ত সেদিন ; ওই দত্তোর পোলার সাথি বল্লিই হয়। ও গরিবির পোলার ত আর জমি জমা নেই, হ্যাদেখ ও খাবে কি করি কও দিনি ?”

নরহরি বলিল, “তা সত্য। এখনও বছর যায়নি, দীনু এসে গাঁয়ে ঘর বেঁধেছে। ঐ ষষ্ঠীতলার মাঠের পাশে নিবারণ বারুয়ের দরুণ বাগান জমাটা ইজারা নিয়েছে। ও কিন্তু এদিকে বড় নির্ব্বিবাদী ভালমানুষ ; ঠিক সময়ে খাজনা দেয়, কোনও গোলমালে থাকে না। ছোটকর্ত্তাও ওর উপর সন্তুষ্ট।”

নাজীর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “আচ্ছা, এট্টা মজা দেখেছো ? ঐ দত্ত মশাইও গাঁয়ে এসে ভদ্দরবাগানে ঝেমনি ঘর বাঁধলে, বষ্টুম বুড়োও তার সাথি সাথি আলে।”

নরহরি বলিল, “না, না, নাজীরদা, তুমি ভুল কচ্ছো। দত্তজার বাস করবার তিন চারি মাস পরে দীনু এসেছে। মনে নাই, দত্ত মশাই কত কাঁদাকাটা করে, কত লোককে মধ্যস্থ মেনে, তবে ছোট-কর্ত্তার কাছে গাঁয়ের মাঝে বসতি করিবার অনুমতি পেলে ? ছোট কর্ত্তা ত প্রথমে জানাশুনা নাই বলে বাস করতে দিতে চান না। পরে সকলের অনুরোধে রাজী হলেন। সে ত আজ প্রায় দেড় বৎসরের কথা। তখন দীনু কোথা ?”

এই সময়ে হরিমতী ছোলা গুড় ও জল লইয়া আসিয়া নাজীরকে জল খাইতে অনুরোধ করিল। নাজীরও অনুরোধ এড়াইতে না

পারিয়া জল খাইল। হরিমতী কতকটা কাটা মাছ নাজীরকে আনিয়া দিল। নাজীরও লইবে না, সেও ছাড়িবে না। শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে মাছ লইয়া নাজীর গাজী বিদায় হইল।

নাজীরও বিদায় হইয়াছে, নরহরি ও হরিমতী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় এক হাটু ধূলি, এক গা ঘর্ম্ম ও এক মাথা মোট লইয়া রামহরি বাড়ী আসিল। নরহরি তাড়াতাড়ি মোট নামাইয়া লইল। শ্রান্ত রামহরি দাওয়ার পৈঠায় বসিয়া উত্তরীয় সাহায্যে হাওয়া খাইতে লাগিল। নরহরি বলিল, "মাছ পেলি কোথা, ও মোটে কি ?"

রামহরি, "সে কথা বলছি। পুঁটী, বউ কোথা গেল রে ? বউ, ও বউ ?"

মাছ কুটিতে কুটিতে হরিমতী হাসিয়া বলিল, "অবাক ! বউ ঘর থেকে সাড়া দেবে নাকি ? বউ বউ করেই অজ্ঞান।"

কাহাকেই বা সে বলিল, রামহরি তখন "বউ"এর সাড়া না পাইয়া একবারে পাকশালায় পশিয়াছে। সেখানে মালতীকে দেখিয়াই সে উচ্চৈঃস্বরে—রামহরি আস্তে কথা কহিতে জানিত না—বলিল, "ও বউ, বউ, কেমন মাছ এনেছি ? তোমার সেই মুড়ির ঘণ্টো আর মাছের ঝোল রাঁধতে হবে। হাঁ, হাঁ, আমরা খাব,—তা যত বেলাই হউক।"

মালতী মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরপোটী আমার পাগল। [illegible] এত বড় মাছ নিয়ে এলে, আজই সব খাবে কে ? আবার কাল থেকে তিন দিন ত' আর কারুর বাড়ীতে হাঁড়ী চড়বে না, আজ যে ষষ্ঠী।"

রামহরি বলিল, "কেন, আমরা খাব। না পারি, ছেলেদের খবর দেবো। মাছ পড়ে থাকবে নাকি ? তুমি রসুই কর দেখি খপ করে।" বলিয়া সে আবার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সেন-গৃহিণী এতক্ষণ মনে মনে বিষম চটিয়া গজরাইতেছিল। ভাবিতেছিল, "বউ, বউ, বউ। সবাই বউএর বশ! রামা মাছ নিয়ে এল, আমায় বললে না। আহ্লাদ করে বলতে গেল বউএর কাছে ছুটে। গোঁয়ার রামা—গোঁয়ার কেবল মায়ের কাছে। বউএর কাছে জুজুটী।" গৃহিণী আর স্থির থাকিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ছেলের পাল ত' ডাকবি, খেতে দেবে কে?"

রামহরি অবাক হইয়া বলিল, "কেন, তুমি। খেতে আবার দেবে কে?"

গৃহিণী ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "উঃ, কি আমার দাতার বেটা রে!"

রামহরি অধিকতর বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল, "কেন, মা, তুমিই ত' বল, 'লোককে খেতে দিতে,—খাওয়াতে যেমন আনন্দ পাও, এমন আনন্দ আর কিছুতে পাও না; আমি যেন চার যুগে লোককে খেতে দিতে পারি।' যাক, তোমায় ত আর কিছু করতে হচ্ছে না, যা করবার বউ সব করবে এখন।"

গৃহিণীর ক্রোধানলে আহুতি পড়িল, ভীষণমূর্ত্তিতে চোখ পাকাইয়া গৃহিণী উচ্চরবে বলিল, "ওরে আমার বউ-সোহাগী রে, দেখিস টস খেয়ে কস ভেসে যায় না যেন! হারামজাদী ময়না, সব যাদু করেছে, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো জানিস নি।"

কথাটা শুনিয়া রামহরি প্রথমটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল। যখন কথাটা তলাইয়া বুঝিল, তখন সে ক্রোধে জ্ঞানহারা। রাগে তাহার বলিষ্ঠ দেহ ফুলিয়া উঠিয়াছে, চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ থর-থর কাঁপিতেছে। নরহরি স্নানে যাইবে বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়া-ছিল, ভ্রাতার ভাব-পরিবর্ত্তন সে আমূল লক্ষ্য করিয়াছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া রামহরির হাত ধরিয়া বলিল, "রামা, আয় চানে যাই।

রামহরির তখন জ্ঞান নাই। সে সজোরে জ্যেষ্ঠের হাত হইতে হাত ছিনাইয়া লইয়া মায়ের পানে আরক্ত-নয়নে চাহিয়া রহিল। সেন-গৃহিণী পুত্রের প্রকৃতি অবগত ছিল, বুঝিল ঝড় উঠিতে আর বিলম্ব নাই। অমনি সে বিড় বিড় করিতে করিতে ঘরে গিয়া খিল দিল ও অকথ্য ভাষায় পুত্রবধূকে গালি দিতে লাগিল।

রামহরি চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ মা, চুপ কর বলছি। সংসারে অমনি অশান্তি এনো না বলছি।"

গৃহিণীর স্বর আরও চড়িল। রামহরি তখন এক লম্ফে দাওয়ার উপর উঠিয়া দ্বারে ধাক্কা দিয়া বলিল, "আজ ঘরে দুয়োরে আগুন দেবো। কেন, বউকে গাল দিবি কেন? বারণ করে দিয়েছি না, ছোটলোকের মত বাপ তুলে গাল দিবি না। আজ সব ভাঙ্গবো চুরবো, তার পর আগুন লাগাবো।" সঙ্গে সঙ্গেই ধুপ ধাপ, দুপ দাপ দরজার গায় লাথি পড়িতে লাগিল। শচীরাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নরহরি ও হরিমতী ছুটিয়া আসিয়া রামহরির দুই হাতে ধরিয়া সভয়ে কহিল, "করিস্ কি, করিস কি, ভজার ঘুম ভাঙ্গবে যে।"

আর করিস কি, রামহরি ক্ষেপিয়াছে, মানা শুনে কে? আজ বুঝি প্রলয়কাণ্ড বাধে। মালতী ছুটিয়া পাকশালার বাহিরে আসিল; আসিয়া একবারমাত্র কাতরনয়নে রামহরির পানে তাকাইল,—সেই পদ্মনেত্র দুটি জলে ভাসিতেছে। অমনি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন— রামহরি আর সে মানুষ নাই। ভীষণ হিংস্র পশু যেমন পশু-শিক্ষকের আঁখির বৈদ্যুতিক শক্তিবলে তাহার পদানত হয়, তেমনি দুর্দ্দান্ত রামহরিও মালতীর সেই কাতর দৃষ্টিতে একবারে প্রকৃতিস্থ হইয়া গেল। তাহার সে রাগ কোথায় গেল, সে অপ্রতিভ হইয়া পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নরহরি আবার যাই ডাকিল, "রামা আয়, চান করতে

যাই", অমনি সে সুড় সুড় করিয়া উঠানে নামিয়া তেল মাখিতে বসিল। আনন্দে গর্ব্বে মালতীর বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

পূজা-বাড়ী

আনন্দময়ী মা আসিয়াছেন।, জগজ্জননীর শুভপদার্পণে ধরণী পবিত্রা। মায়ের চরণকমলের সৌন্দর্য্যালোকে সব সুন্দর—প্রকৃতি সুন্দর, শরৎ সুন্দর, ধরণী সুন্দর, মনুষ্য সুন্দর, সুন্দরের মিশামিশি ছড়াছড়ি। মা আসিয়াছেন, তাই সব সুন্দর। সর্ব্বত্র আনন্দ;—ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, বালক বৃদ্ধ, ইতর ভদ্র, আপামর সাধারণ আনন্দে আত্মহারা; সংসারের শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণা কোথায় পলাইয়াছে। মা আসিয়াছেন, তাই এত আনন্দ।

শরতের শুভ্র সুন্দর আনন্দময় দিনে দয়াময়ী ভুবনসুন্দরী মা আমার বৎসরে বৎসরে বাঙ্গালীর ঘর আলো করিতে আসেন। এমনই দিনে শুভক্ষণে শুভময়ী সর্ব্বমঙ্গলা অন্নপূর্ণা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অন্ন বিলাইতে আসেন। এমনই দিনে মায়ের দরিদ্র সন্তান মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া "এহি দেবি" রবে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া, এক মনে এক প্রাণে মায়ের চিণ্ময়ী মূর্ত্তির আবাহন করে। কাতর সন্তানের করুণ আবাহন করুণাময়ী জগজ্জননী কি উপেক্ষা করিতে পারেন? তাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মৃণ্ময়ীমূর্ত্তিতে ব্রহ্মময়ী চিদানন্দময়ী জননী আবির্ভূতা হন আর মরুময় সংসারে স্বর্গ-শান্তির সুধা-প্রস্রবন শতমুখে ফুটিয়া উঠে।

দণ্ডীরহাটের বসুদের ঘরেও সদানন্দময়ী মা শুভপদার্পণ করিয়াছেন। এমনই বৎসরে বৎসরে মায়ের পদার্পণে দর্পনারায়ণের গৃহ

পবিত্র হয়। সেই গ্রামে ও আশে পাশে কয়েকখানি গ্রামে আরও কয়েকটী গৃহস্থ-গৃহে মায়ের পূজার আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু এত বৃহৎ ব্যাপার আর কোথাও নাই। দর্পনারায়ণের বৃহৎ পুরী আজ কয়দিন ধরিয়া কোলাহলমুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম গ্রামান্তরের আত্মীয় কুটুম্ব বান্ধব আসিয়া সেই পুরী ভরিয়া গিয়াছে। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা,—সকলেই নববস্ত্র ধারণ করিয়া নব উৎসাহে মাতিয়া সেই মহানন্দে যোগদান করিয়াছে।

গৃহিণী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর সেই শুভঘটস্থাপনার দিন হইতে আর বিরাম নাই। গ্রামের জ্ঞাতি কন্যা ও বধূদিগকে এবং আত্মীয়া ও কুটুম্বিনীদিগকে লইয়া তিনি পূজার সর্ব্ববিধ আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁহার আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনি চারিদিকে চরকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও সকল কাজেই যোগ দিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। কোথাও তিল বাছা হইতেছে, কোথাও বা যব, কোথাও বা ধান্য। কোথাও বা নানাপ্রকার ডাল কলাই বাছাই হইতেছে, কোথাও বা নারিকেল কুরিয়া স্তূপাকার করা হইতেছে। কোথাও বা পূজার নৈবেদ্য সাজান হইতেছে. পূজার নৈবেদ্যের বড় বড় বাসন বাহির হইয়াছে আর তাহাতে চাউল কলা ফল মূল পত্র পুষ্প ইত্যাদি পূজার উপকরণ সুসজ্জিত করা হইতেছে। তাহাতেই কত লোক লাগিয়া গিয়াছে। রন্ধনশালায় দশ বারোটা চুলা জ্বলিয়াছে, গ্রামের কনে ঝিমা, নেকা ঠানদি, বড়খুড়ী, সেজখুড়ী, ব্রজর মা, রাখালীর মা প্রভৃতি প্রৌঢ়া ও প্রাচীনা মহিলারা মাথার কেশে চূড়া বাঁধিয়া, হাতা বেড়ী খন্তি হস্তে অগ্নিদেবের সহিত যুঝিতেছেন ও রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতেছেন,—সে অন্নস্তূপ দেখিলে মনে হয়, যেন অন্নমেরু। পাকশালার দালানে দশ বারো খানা বঁটী পড়িয়া গিয়াছে, আর হুহু শব্দে তাহাতে তরকারি

কোটা চলিতেছে। তৎপার্শ্বেই চারি পাঁচখানা শিলে মসলা পেষা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত কার্য্যই গ্রামের ঝি বউ ও আত্মীয়া কুটুম্বিনীরাই করিতেছেন, তখনকার কালে তাহাই প্রথা ছিল। পাকশালার প্রাঙ্গনে বড় বড় মৎস্য কোটা হইতেছে, একার্য্যটা তখনকার কালে জেলে কিম্বা বাটীর বাগদী মুসলমান প্রভৃতি ভৃত্য-দিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত, কেননা একমন দেড়মন মৎস্য কোটা বহু বলসাপেক্ষ, কাজেই স্ত্রীলোকে তাহা পারিত না।

ভিয়ানবাটীতেও দশ বারোটা চুলা জ্বলিয়াছে। সেখানে বেতন-ভুক্ হালুইকর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণে মাথায় গামছা বাঁধিয়া নানারূপ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতেছে, আর বারুই কামার ও অপরাপর নবশাখ জাতীয় গ্রাম্য অধীন লোকেরা তাহাদের যোগাড়যন্ত্র করিয়া দিতেছে। এই সকল পরিচারক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ; তাহাদের সকলেরই কোমরে গামছা জড়ান, মালকোচা মারা; কেহ বা বড় বড় বারকোষ, কেঠো, পিত্তলের গামলা, ঘড়া প্রভৃতি স্কন্ধে করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহিয়া আনিতেছে, কেহ বা জ্বালানী কাঠের বোঝা নামাইতেছে, কেহ বা ভারে ভারে জল আনিতেছে, কেহ বা ঘৃত ময়দা, সুজি, বেশম, সবেদা প্রভৃতি ভিতর হইতে বহিয়া আনিতেছে, আবার কেহ কেহ বা সেই সমস্ত গুছাইয়া বা মাখিয়া বেলিয়া ব্রাহ্মণদের যোগাড় করিয়া দিতেছে, মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণদিগকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেছে। এ দিকে কোনও চুলায় রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে, কোনও চুলায় বা রসকরা পাক হইতেছে; আবার বোঁদে, খাজা, অমৃতি, গজা প্রভৃতিও কোনও কোনও চুলায় প্রস্তুত হইতেছে; বিরখণ্ডি, কদমা, ওলা, খৈচুর, মুড়কি, মোণ্ডা, প্রভৃতিও স্বতন্ত্র স্থানে পাকে চড়িয়াছে। ফল কথা, রাবণের চিতার ন্যায় ভিয়ানের চুলা জ্বলিতেছেই, তাহার আর বিরাম নাই।

বাহির বাটীতে মুচিরা কোদালের আগায় সর্ব্বত্র কাঁটা ঘাস চাঁচিয়া

তুলিয়া ফেলিয়া পরিস্কার করিতেছে। পূজার দালানে গোলোকলণ্ঠনে ও দেওয়ালগিরিতে তেলবাতী সাজান হইতেছে। আবার মা দশ-ভূজার দুই পার্শ্বে ছোট বড় চৌদ্দটী কাষ্ঠাধার সাজান হইতেছে—বড় হইতে পরপর ছোট, একপার্শ্বে ৭টী, অপর পার্শ্বে ৭টী। ঐ গুলির উপর সেজের ভিতর মোমের বাতী জ্বালাইবার সমস্ত ব্যবস্থা হইতেছে। পূজার দালানের সম্মুখে প্রশস্ত অঙ্গন, তাহার তিন দিকে একতোলা কোঠা; সেই কোঠাগুলিতে টানা দালান, দালানের পশ্চাতে তিন দিকেই অনেকগুলি কক্ষ; সেই সকল দালানে ও কক্ষে প্রয়োজনমত শয্যা ও আলোক সাজান হইতেছে। বহির্ব্বাটীর বাহিরে পুষ্করিণীর পূর্ব্বপার্শ্বে বিল্বপীঠে উদ্বোধনের আয়োজন চলিতেছে। কর্ত্তা দর্পনারায়ণ চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন।

ষষ্ঠীর রাত্রি; জ্যোৎস্নাপুলকিত মধুময়ী যামিনীতে বিল্বপীঠে মায়ের উদ্বোধন হইতেছে। চূড়ামণি মহাশয় অন্যান্য পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে পূজায় বসিয়াছেন। তাঁহার সেই তপ্তকাঞ্চনতুল্য সৌম্য শান্ত, অথচ তেজঃপুঞ্জ কলেবর; তদুপরি তাঁহার মধুর উচ্চ কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারিত বিশুদ্ধ আবাহন স্তোত্রগীত; দর্শকদিগের চক্ষুঃ জল ভারাক্রান্ত, তাঁহারা যুক্তকরে মনে মনে "মা মা" বলিয়া ডাকিতেছেন। পূজা চলিতেছে, ছেলেদের আনন্দ আর ধরে না; আহা! তাহারা যে মহামায়ার নিষ্পাপ সন্তান! যে যাহার নববস্ত্র পরিধান করিয়া পূজাবাটীতে আসিয়াছে। ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি, মারামারির বিরাম নাই। সেই মধুর চন্দ্রালোকে বালকেরা ইতঃস্তত ধাবমান হইতেছে, কেহ কাহাকে ধরিতে ছুটিয়াছে, কেহ পলাইতেছে, কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে, কেহ কেহ লুকোচুরি খেলিতেছে, তাহাদের সরল উদার উচ্চহাস্যে গগণ মেদিনী ভরিয়া যাইতেছে। কোনও কোনও বালক

খেলা ফেলিয়া ঝাঁঝ, ঘন্টা, ঘড়ি, কাঁসর প্রভৃতি লইয়া বাজাইবার নিমিত্ত বসিয়া আছে। কোনও কোনও বালক ছুটাছুটীতে পরিশ্রান্ত হইয়া বোধন পীঠের কাছে আসিয়া বুড়াদের দলে মিশিয়া বুড়াদের মত গম্ভীরভাবে পূজা দেখিতেছে, তাহাদের ফুলের মত কচি মুখগুলি চারি দিকের আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বালকের মত সুন্দর কি আছে?

নাতিদূরে পুষ্করিণীর তীরে বাজনদারেরা বসিয়া আছে। ঢাকী ঢাক ঘাড়ে, সানাইদারেরা ঢুলীর সহিত, জগঝম্প, কাড়া, দামামা, নহবৎ,—কিছুরই অভাব নাই। কেবল অভাব—এখনকার কালে যেটা বাঙ্গালীর বড় আদরের হইয়া উঠিয়াছে, সেই বিলাতী ব্যাণ্ড। মশালচীরা বড় বড় মশাল হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মশালের আলোকে চন্দ্রালোকের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে না।

সহসা মন্ত্রপাঠ বন্ধ হইল। বলি হইবে, বাজনদারেরা বাজাইবার হুকুম পাইল। ঢাক ঢোলে কাঠি পড়িল; বালকেরা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের কাঁসর ঘন্টার রোলে বাজনার শব্দ ছাপাইয়া গেল। সেই ভীষণ মধুর বাদ্যের আস্বাবে ভক্তের প্রাণ মাতিয়া উঠিল। বলি হইল, আরতি হইল। পূজার দ্রব্যাদির আয়োজনকারী প্রধান পাণ্ডা নরহরি; সে তাহার দলবল লইয়া পূজার নৈবেদ্যাদি গুছাইতে লাগিল।

এদিকে পূজাবাটীর প্রাঙ্গনপার্শ্বস্থ দালানগুলিতে ঢালা বিছানার উপর লোকজন বসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দালানগুলি ভরিয়া গেল। আজ সানাইদারদিগের প্রথম পরীক্ষার দিন। প্রাঙ্গনে চন্দ্রাতপতলে মেহেদি সানাইওয়ালা সদলবলে শয্যার উপর বসিল। যন্ত্রাদি সুরলয়ে গঠিত হইলে পর মেহেদি শয্যার উপর নতজানু হইয়া সঙ্গীতদেবতাকে প্রণাম করিয়া গলা ফুলাইয়া সানাইয়ে

ফুঁ দিল। আহাহা! সে কি সুর! তখনকার কালে আমাদের দেশে গুণীরও অভাব ছিল না, শ্রোতারও অভাব ছিল না, কাজেই গীত-বাদ্যের চর্চ্চাও ছিল, গুণীরা পেট পুরিয়া দুবেলা দুমুঠা খাইয়া সঙ্গীত-বিদ্যার চর্চ্চাও করিতে পারিত; তাই বিদ্যা লোপ পায় নাই। আর এখন? বলিতে চক্ষু ফাটিয়া শোণিত নির্গত হয়, বড় বড় গুণীর সন্তান পৈত্রিক পেশা ছাড়িয়া পেটের দায়ে নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে! কেন? এখনকার গৃহস্থ বাবু আমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনার জন্য বায়াস্কোপ, গ্রামোফোন, থিয়েটার, কনসার্ট লাগাইয়া বেশ নিশ্চিন্তমনে বৈটকখানায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সুরা ও সুন্দরী লইয়া স্ফূর্ত্তি করিবার অবসর পান। পূজায় যে উপবাসী সংযমী হইয়া মায়ের আরাধনা করিতে হয়, মায়ের পূজা ভোগ আরতি না হইলে যে জলগ্রহণ মহাপাপ, অতিথি অভ্যাগতকে পরিচর্য্যা না করিয়া বৈটকখানায় সুরা ও সুন্দরী লইয়া আত্ম-সুখ-তৃপ্তি-সাধন করা যে অনন্ত নরক, দেশের যথার্থ গুণীর গুণমর্য্যাদা রক্ষা করা যে ধর্ম্ম, তাহা আজিকালিকার কয় জন গৃহস্থে বুঝেন? দারুণ গ্রীষ্মে জলদান, বৃক্ষরোপণ, পুষ্করিণীখনন যে সদনুষ্ঠান, তাহাই বা কয় জন মানেন? সানাইদারের সম্মান ত' দূরের কথা,—কথকতা, রামায়ণ, চণ্ডীর গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি আজি কালি তেমন শুনিতে পাওয়া যায় কি?

যাউক সে কথা। মেহেদি সানাই ধরিল, ফটিক মণ্ডলও ঢোলে ঘা দিল। ঢোলের সে গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে শ্রোতৃমণ্ডলীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সানাইএর গাওনা আরম্ভ হইল প্রথম ঢোলের সঙ্গে, শেষে নহবতের সঙ্গে। সানাই হইয়া গেল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শুধু কাঁকা ধন্য ধন্য নয়। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে মেহেদীর স্কন্ধে বহুমূল্যবান গাত্র-বস্ত্রাদি বর্ষিত হইল। তখনকার কালে গুণীর মান এইরূপে সাব্যস্ত

হইত। তাহার পর এসরাজের সঙ্গীত চলিল; মেহেদি এদিকে অতি উৎকৃষ্ট এসরাজীও ছিল। এসরাজের মধুর খাদের আওয়াজে ও ঘন ঘন মূর্চ্ছনায় বাহবা বাহবা পড়িতে লাগিল। মেহেদীর দুইটী ছেলে, একটী দশ বৎসর অপরটী দ্বাদশ; তাহারা এসরাজের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া সুমিষ্ট সুতানে সভাস্থলে পীযুষ ঢালিয়া দিতে লাগিল। তাহারা মুসলমান বটে, কিন্তু মহামায়ার আগমনী সঙ্গীত গাহিতে তাহাদের চোখে জল আসিল। তাহারা গাহিল :—

নিঠুর নিদয় হয়ে, দুঃখিনী মায়েরে,
এমনি করে কিগো কাঁদাতে হয়।
পাষাণতনয়া, ভাঙ্গড়ের জায়া,
(ভাল) ভাঙ্গড়ের মত দিলি পরিচয়॥
সারা বরষ ধরে, আছি মা পথ চেয়ে,
উমা এল কেবল এই মনে লয়॥
গেলে শিবালয়ে, থাকিস গো ভুলিয়ে,
ভোলানাথ-জায়ার ভোলা কঠিন নয়॥

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সেই করুণরসাপ্লুত মোহন সঙ্গীত পবনহিল্লোলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন সেই সুধানিঃসন্দী মধুর সঙ্গীত কিন্নরকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। শ্রোতৃমণ্ডলী জ্ঞানহারা হইয়া এক মনে এক প্রাণে মুগ্ধচিত্তে গীত শুনিতে লাগিলেন। সেই সময়, সেই আগমনীর দিন, সেই জগদম্বার সম্মুখ,—সে গীত যে কত মধুর, তাহা যে শুনিয়াছে সেই জানে।

ঢোলের নানারূপ করতপে ফটিক সকলকে সন্তুষ্ট করিল, ও তিন চারিটী ঢোল একত্রে বাজাইয়া সকলকে মোহিত করিল। ফটিক মনোমত পারিতোষিকও পাইল। পরিশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ না

হইয়া জগঝম্পের ও কাড়ার ভীষণ আওয়াজে লোকে পালাই পালাই ডাক ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল ; বাজনদারেরা নির্দ্দিষ্ট বাসায় চলিয়া গেল, তখন সে রাত্রির মত পূজার আমোদ ফুরাইল।

পরদিন সপ্তমী, দেশদেশান্তর হইতে লোকে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছে, সকলেই নববস্ত্রপরিহিত, সকলেরই মুখে আনন্দ। ছেলেরা অতি প্রত্যুষেই ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়াছে ; নহবতে মধুর প্রভাতী সঙ্গীত আলাপ হইতেছে ; ছেলেরা আসিয়াই কাঁসর, ঘড়ি, ঘণ্টা ইত্যাদি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে ; বয়োজ্যেষ্ঠেরা ধমকাইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতেছেন।

এদিকে চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর উচ্চকণ্ঠে পূজার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। দর্পনারায়ণ ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ যোড়হস্তে পূজার বাহির দালানে বসিয়া আছেন। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী গ্রামের ঝি বউ সঙ্গে লইয়া পূজার ভিতর দালানে বড় বড় পরদার অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। আরতির সময়ে ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল ও কর্পূরের গন্ধে পূজা-গৃহ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। আরতির বাজনাও বাজিয়া উঠিল, আর পুরনারীগণের শুভশঙ্খধ্বনি বালকগণের কাঁসর ঘড়ি ঘণ্টার উচ্চরোলের সহিত গগনমার্গে উত্থিত হইল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী চামর ঢুলাইয়া ধুনার ধূম উৎপাদন করিতেছেন। বাহিরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া ভীমরোলে দিগঙ্গন কাঁপাইতেছে ; তাহার সহিত শঙ্খ-ঘণ্টা, কাঁসর ঘড়ির বিষম শব্দ মিশিয়া সমগ্র পূজা-প্রাঙ্গনময় ছাইয়া পড়িয়াছে ; ভিতরে মহামায়ার মূর্ত্তির সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে অধে, ধূনার ধূমে আচ্ছন্ন ধূপ গুগ্‌গুল কর্পূরের মধুর সুবাস মৃদুপবনে সঞ্চারিত হইতেছে ; মহামায়ার মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে পরদার অন্তরালে গ্রাম গ্রামান্তরের পুরনারী, সম্মুখে বাহির দালান হইতে দালানের শেষ সোপান পর্য্যন্ত অসংখ্য পুরুষ মধ্যস্থলে শুভ্র

রাখিয়া দুইটী সারি দিয়া যোড়হস্তে ছলছলনেত্রে ভক্তিগদগদচিত্তে দণ্ডায়মান; মধ্যে মধ্যে দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে "মা মা" ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। আহা! সে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! সে বাদ্য, সে ধূপ ধুনার গন্ধ, সে শুভ শঙ্খধ্বনি—কি এক অব্যক্ত মধুর স্বর্গীয় শান্তিরসে পূর্ণ; সে রস যে আস্বাদন করিয়াছে, সেই মায়ের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া জনম সার্থক করিয়াছে।

পূজা, বলি, ভোগ, আরতি,—সমস্ত সমাপ্ত হইলে পর দর্পনারায়ণ জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে সঙ্গে লইয়া মহামায়ার প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিলেন। প্রসাদ পাইয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব ও অতিথি অভ্যাগতদিগকে ভোজনে বসাইলেন। দাস দাসী, লোকজন, ফকির সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলকে খাওয়াইলেন। সে অন্ন-বিতরণ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দর্পনারায়ণ তখনও মুখে জল দেন নাই। একবার ভিয়ান বাড়ী, একবার পূজাবাড়ী, চারিদিকে তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন। সকলকেই তিনি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছেন, সকলকেই প্রশংসা করিয়া কার্য্যে দ্বিগুণ উৎসাহিত করিতেছেন।

অপরাহ্ন হইতে বহুদূরদূরান্তরের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ পূজাবাটীতে পদার্পণ করিতে লাগিলেন। দর্পনারায়ণ গললগ্নীকৃতবাসে যোড়হস্তে হাসিহাসিমুখে সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন; পার্শ্বে ভৃত্যেরা জল ও গাড়ু গামছা লইয়া হাজির আছে। দর্পনারায়ণ ব্রাহ্মণগণের পা ধুইয়া পুঁছিয়া দিতেছেন, ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া শয্যায় উপবেশন করিতেছেন। ব্রাহ্মণদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। অপরাহ্নেই ব্রাহ্মণ ভোজন; আহার্য্যও প্রচুর—দধি দুগ্ধ, পায়স পিষ্টক, শর্করা মধু, নবনীত ছানা, আদাছানার মোণ্ডা, ফল মূল, লাজ মুড়কি, বাতাসা বিরখণ্ডি, কদমা খৈচুর, মোণ্ডা রসকরা। কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং রব। ব্রাহ্মণেরা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। দক্ষিণান্তে তাঁহারা

প্রাঙ্গনপার্শ্বস্থ দালানে সানাইয়ের গান শুনিতে বসিলেন। তখন আমন্ত্রিত কায়স্থমণ্ডলীও একে একে জুটিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দালান ও প্রাঙ্গন শ্রোতৃমণ্ডলীতে ভরিয়া গেল। পূর্ব্বদিনের মত আবার সানাই নহবৎ প্রভৃতির গান বাজনা হইল। গান শুনিয়া সকলেই মেহেদিকে সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। গানও হইতেছে, এদিকে কায়স্থ ভোজনও চলিতেছে। দর্পনারায়ণ চারিদিকে ঘুরিয়া প্রত্যেকের নিকট যোড়হস্ত হইয়া কাহার কি চাই জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেছেন। আমন্ত্রিতেরা তাঁহার সাদর আপ্যায়নে পরম পরিতুষ্ট। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভোজনকার্য্য চলিল। আমন্ত্রিতগণের আহারাদি শেষ হইলে জ্ঞাতি কুটুম্বগণ ও তৎপরে বাজনদার, গাহক ও ভৃত্যবর্গ ভোজনে বসিল। সকলের আহার সমাপ্ত হইলে সারাদিনের পর তৃতীয়বার স্নানান্তে দর্পনারায়ণ দুটী অন্ন মুখে দিতে বসিলেন।

মহা অষ্টমীর দিন পূজার জাঁকজমক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই-দিন এক শত আট বলি। বহুস্থান হইতে বহুলোক সমাগত হইয়াছে। খুব ধূমধামে পূজার কার্য্য চলিল। পূজা বলি ভোগ আরতি যথারীতি সম্পাদিত হইল। এইদিন নবশাখ ও অন্যান্য শূদ্রাদির ভোজন; পরদিন নবমীতে বাগদী কাওরা হাড়ী মুচি মুসলমানদিগের আইবুরের দিন। সে সব বিস্তৃত বর্ণনা করিতে গেলে গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি হয়। তবে সে ভোজন..সে পরিবেশন, সে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড, সে আনন্দ, সে তৃপ্তি, কেবলমাত্র উপভোগ্য, বর্ণনাতীত। এক এক পংক্তিতে পাঁচ শত জন আহারে বসিয়াছে; মাঝে মাঝে বড় বড় মশাল জ্বলিতেছে, দর্পনারায়ণের জ্ঞাতি কুটুম্ব যুবকেরা কোমরে গামছা জড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া পরিবেশন করিতেছে; যে যাহা চাহিতেছে, সে তাহাই পাইতেছে। সে কি আনন্দ! এইরূপ কোনও স্থানে পরিবেশন হইতেছে, কোথাও বা পাতা হইতেছে, কোথাও বা স্থান

পরিষ্কৃত মার্জ্জিত করা হইতেছে। এক স্থানে বৈষ্ণবেরা বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনের নাম তিরিশসেরী, অর্থাৎ তিনি ত্রিশ সের পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ না করিয়া উঠিতেন না। দর্পনারায়ণ স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে ভোজন করাইতেছেন। অষ্টমী নবমী দুই দিনই সারা রাতই ভোজন করাইতে কাটিল। ঐ দুই দিন বহু-দূরাগত কাঙ্গালীদিগকে নববস্ত্রাদিও দান করা হইল।

অষ্টমীর দিন দ্বিপ্রহরে অন্দরের পাকশালার প্রাঙ্গনে ভৃত্যেরা আহারে বসিয়াছে। সবে মাত্র পাতা হইয়াছে, এমন সময়ে এক জন অপরিচিত লোক,—"কোথায় গো মা ঠাকরুণ, আমি দুটি খাব" বলিয়া সেই স্থানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একখানি পাতা টানিয়া লইয়া একধারে বসিয়া পড়িল। ভৃত্যেরা ত' অবাক। ছিরে বাগদী পুরাতন ভৃত্য। সে বলিল, "কেডা তুমি, কমেন থে আস্‌ছো? তোমরা আপনারা?"

লোক। ভাই, এত পরিচয়ে আবশ্যক কি? দুটো খেতে এসেছি মায়ের কাছে, খেয়ে চলে যাব।

ছিরে। আরে খাও খাও, খাবা বৈকি, আঙ্গা মার কাছে আলি কি আর ফিরি যাবা? তা' বারবাড়ীতি না গিয়ে একেবারে বাড়ীর মধ্যি ঢুকোছো, তাই কইছিলাম।

লোক। মার কাছে খাব কিনা, তাই ঢুকেছি। যাক, বকাবকির আবশ্যক কি ভাই, তুমিও খাও আমিও খাই।

লোকটি এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল, "মা, মা, ও মা-ঠাকরুণ।"

সকলে তাহার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক। লোকটী বেশ জোর করিয়া স্বচ্ছন্দমনে পাতা পাতিয়া খাইতে বসিয়াছে, আবার "মা মা" করিয়া আবদার করিয়া হাঁকিতেছে, যেন তাহার কতকালের মা!

যাহা হউক, তাহার হাঁক শুনিয়া পাকশালা ও অপরাপর স্থান হইতে পুরমহিলারা দেখিতে আসিলেন। কনে ঝিমা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনা। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "কেন বাছা, কি হয়েছে, কি চাই তোমার ?"

লোক। না মা, কিছুই চাই না। চাই কেবল আমার মাকে। আমার মা জননী কোথায় আছেন ?

কনে ঝিমা। গিন্নী মাকে খুঁজছ, বাছা ? গিন্নী মাকে ? তিনি এখনই আস্‌বেন। তিনি এসে,না দেখলে ত আর বাছাদের খাওয়া হবে না।

লোক। হাঁ মা, তাঁকেই খুজ্‌ছি। আমার মা এসে না খাওয়ালে আমি ত' খাব না।

এই সময়ে "হাঁ ঠান্‌দি, আমায় ডেকেছে কে" বলিয়া স্বয়ং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আগমনে কি জানি কেন সে স্থানটা যেন আনন্দে ফুটিয়া উঠিল। আগন্তুক অপরিচিত লোকটী ত্রস্তে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিল ও ভাবগদগদকণ্ঠে বলিল, "মা, আমি এলাম, তোমার হাতে ভাত খাব বলে অনেক পথ হেটে এলাম। দেখিস্‌ মা, নিরাশ করিস্‌ নি।"

গৃহিণী ত' অবাক। কে এ আশ্চর্য্য লোক! অনেক অতিথি ভিখারী আসে, কিন্তু তারা ত' এমন নয়। তাদের কথায় ত এমন মন উচাটন হয় না। তাদের কণ্ঠস্বরে ত' এমন পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলে না। কে এ ? কোথা হইতে এসেছে ? যেন কত আপনার জন! কবে, কোথায় একে দেখেছি ? হাঁ হা, দেখেছি; দেখেছি বলেই মনে হইতেছে। কে এ ?—গৃহিণী একদৃষ্টে সেই আগন্তুকের মুখপানে তাকাইয়া মনের মধ্যে এই সকল তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

লোকটী হাসিয়া বলিল, "ছি. মা, আমি এলাম ক্ষুধার জ্বালায় ছুটে খেতে, আর তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে ?"

গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না বাবা, এই যে খেতে দিই এই", বলিয়া তিনি পাকশালার পুরমহিলাগণকে ইঙ্গিত করিলেন।

লোকটী অমনি বলিয়া উঠিল, "না মা, তা হবে না। আজ তোমায় নিজের হাতে পরিবেশন কর্‌তে হবে, তবে আমি খাব।"

গৃহিণী। কেন বাবা, সে ত' আমি করেই থাকি ; তবে পূজার আয়োজন করে দিচ্ছি বলে আমি থাকিতে পাই না।

লোক। তা হউক, কেবল আজকার জন্য এই অতিথির কথাটা রাখ—

লোকটী আরও কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন,—

"এ্যাঁ তাই কি ! হাঁ তাই বটে। বাবা, তুই আমাদের সেই জীবন না ?"

লোক। চিনেছো মা ? ছি মা. সন্তানকে একবার দেখলে চিন্তে পার না !

জীবন হাসিতে হাসিতে কথাটা বলিল বটে. কিন্তু তাহার চক্ষের কোণে জল। সে তাড়াতাড়ি অপরের অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া বলিল, "তা মা, এতদিনের পর এলাম. অনেক দিন মা তোমার হাতে খাইনি, আজ পেটটা পুরে খাব।"

গৃহিণী। হাঁ জীবন, এত দিন কোথায় ছিলি, কার কাছে ছিলি, কি করিস, কি খাস. বিয়ে করেছিস কি. ছেলে পুলে কি, কেন গেলি বাবা ? অযত্ন করেছিলাম কি ? গেলি যদি, আমায় জানিয়ে গেলি নি কেন বাবা, আমি যে তোকে পেটের ছেলের মত দেখতাম, আর মনে কষ্ট দিয়ে গেলি কেন ? আর যাবিনি ত' বাবা ?" বলিতে

বলিতে গৃহিণীর পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িল, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর সকলে সবিস্ময়ে দেখিল সেই দৃঢ় বলিষ্ঠ পুরুষ বালকের মত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

গৃহিণী আরও বলিতে লাগিলেন, "আহা, তোর দুঃখিনী মা আমার হাতে হাতে তোকে সোঁপে দিয়ে গিয়েছিলো, আমি কি তোকে তার মত আদরে রাখ্‌তে পারিনি? আহা, তুই চলে গেলে আমরা কত কেঁদেছি, কত খুঁজেছি। ভাবতুম, মা-হারা ছেলে, মার আদরের অভাবে কোথায় পালিয়ে গেছে।"

জীবন চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "মা, আর কেন মা, আর কেন লজ্জা দিস মা? নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ সন্তান আমি। এমন মা কি কারও হয়? আমি মা-হারা হয়েও মায়ের অভাব কখনও জান্‌তে পারি নি। সে আদর,—সে যত্ন ভুলবো কি করে, মা? তা মা, আমি কুপুত্র, কিন্তু মার কাছে ত' কুপুত্র সুপুত্র নেই মা।"

গৃহিণী অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "যাক্ এখন ওসব কথা। ওসব পরে হবে। এখন খেতে বস বাছারা, বেলা যেতে বসেছে। আমি আজ তোদের নিজে খাওয়াব। হাঁ জীবন, এখনও কি তুই বড়ীভাজা, বড়ীর অম্বল খেতে ভাল বাসিস?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহিণী পাকশালা হইতে অন্নব্যঞ্জনাদি আনিতে গেলেন। জীবনও হাসিতে হাসিতে সে কথার জবাব দিল। তখন অন্যান্য পুরমহিলারা ও ভৃত্যেরা জীবনকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। জীবন "হাঁ, না" করিয়া সায় দিয়া কাজ সারিল।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী অন্নপূর্ণার মত সকলকে খাওয়াইতে লাগিলেন। গব্যঘৃত ও সুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পায়স পিষ্টক পর্য্যন্ত পরিতোষ-রূপে সকলকে ভোজন করান হইল। জীবন অতিথি, কাজেই তাহাকে 'এটা খা, ওটা খা' করিয়া খাওয়াইতে হইল।

ভোজন প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবলমাত্র পায়স পিষ্টক অবশিষ্ট আছে, এমন সময় দালানে খড়মের খট খট শব্দ ও গলার সাড়া পাওয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে "মা লক্ষ্মী কি পাকশালায় আছেন" বলিতে বলিতে স্বয়ং চূড়ামণি ঠাকুর মহাশয় তথায় উপস্থিত। তাঁহার সর্ব্বত্র অবারিত-দ্বার। তাঁহার পশ্চাতে দর্পনারায়ণ ও নিরঞ্জন। সাড়া পাইয়াই গৃহিণী মুখের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাঙ্গনপার্শ্বস্থ চত্বরে দাঁড়াইয়া চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন, "মা লক্ষ্মী যে আজ স্বয়ং অন্নপূর্ণা হয়েছেন। তাত' বেশ কিন্তু এদিকে যে পূজার আয়োজনে গোলযোগ হয়।"

হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি জীবনের উপর পড়িল। দেখিয়াই ত' তাঁহার চক্ষুঃস্থির। বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চূড়ামণি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "আঃ সর্ব্বনাশ, তুমি এখানে ?"

জীবন কেবল মৃদু মৃদু হাসিতেছে। দর্পনারায়ণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে, ঠাকুর মহাশয়, ব্যাপার কি ?"

চূড়ামণি। ব্যাপার বড় সোজা নহে। তোমার বাটীতে আজ জীবন সর্দ্দার অতিথি।

দর্পনারায়ণ। জীবন সর্দ্দার ? কোন জীবন সর্দ্দার, ঘুঘুড়ির ডাকাত ?

নিরঞ্জন এতক্ষণ অবাক হইয়া শুনিতেছিল। ডাকাত জীবন সর্দ্দারের নাম শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল ; বলিল, "ডাকাতের সর্দ্দার জীবন, আমাদের বাড়ীতে ? কোথায় সে ?"

তখন ভোজন শেষ হইয়াছে। জীবন দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র যেন অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে বলিতে লাগিল "হাঁ মা, আমিই-সেই জীবন সর্দ্দার। লোকে আমার নামে কাঁপে বটে, কিন্তু মা আমার হাতে তোমার বা তোমাদের বন্ধুবংশের

কখনও কোনও অনিষ্ট হয় নাই, হইবেও না। মা, আমি তোমার সন্তান, তোমার কত নুন খাইয়াছি, এ জীবনে তাহা কি ভুলিতে পারি? মা জননী, যদি কখনও বিপদে পড়, তোমার অধম সন্তানকে একবার জানিও, কেবল এই ভিক্ষা চাই। আমার পরিচয় ঠাকুরের কাছে পাবে মা।" এই বলিয়া জীবন সর্দ্দার নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক। ঘটনাটী যেন সকলের স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া মনে হইল, সকলে চূড়ামণি-মহাশয়ের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

লবণ-কুঠী।

সুন্দরী ইছামতীর পশ্চিম তীরে দণ্ডীরহাট হইতে ক্রোশাধিক দক্ষিণ-পূর্ব্বে সোলাদানা গ্রাম। নদীর উপর অবস্থিত গ্রাম বড়ই সুন্দর। সোলাদানাও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বড়ই সুন্দর। পাদদেশে বেগবতী সুপ্রশস্তা নদী, বক্ষে বিস্তীর্ণ আম্র ও পনস কানন, বেতস ও বংশকুঞ্জ, গ্রীবা উন্নতকারী অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী, বট, ঝাউ, ও দেবদারুদ্রুম, আর মাঝে মাঝে কৃষিজীবী শান্ত নিরীহ পল্লিবাসীর শান্ত কুটীরাশ্রম। গ্রামখানি যেন আলেখ্যার্পিত স্বভাব-চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

এই গ্রামের দক্ষিণাংশে, যেখানে ইছামতী অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতায়তনা, সেইস্থানে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে জেম্স পারকার সাহেবের লবণের কুঠী। প্রায় পাঁচশত বিঘা জমী ইজারা লইয়া ইছামতীর তীরে এই অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন প্রদেশে পারকার সাহেব এই কুঠী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কুঠীর ভূখণ্ডের পূর্ব্বদিকে নদী, অপর তিন দিক প্রাচীর-বেষ্টিত। কুঠীয়াল সাহেব ব্যবসাদার ইংরেজ বণিক, তাঁহার নানা ব্যবসায়

ছিল। লবণের ব্যবসায়ই তন্মধ্যে প্রধান; অস্থি, চর্ম্ম, শুষ্ক মৎস্য প্রভৃতি কয়েকটী আনুসঙ্গিক। সেই বিস্তৃত প্রাচীরবেষ্টিত ভূখণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক ব্যবসায়ের জন্য স্বতন্ত্র গুদাম, স্বতন্ত্র কারখানা, স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী, ও স্বতন্ত্র লোকজন নির্দ্দিষ্ট ছিল; কেবল সেরেস্তা এক, স্বয়ং সাহেব তাহার কর্ত্তা ও মালিক্, আর দণ্ডীরহাটের কালিচরণ দত্ত তাহার দেওয়ান বা বিধাতাপুরুষ।

যেমন বৃহৎ কুঠী, ব্যাপারও তেমনই বৃহৎ। প্রত্যেক কারখানায়, প্রত্যেক গুদামে, কত লোক খাটিতেছে। সুন্দরবনের লবণাক্ত জল হইতে প্রস্তুত লবণ নৌকাযোগে সোলাদানায় আসিত। কোথাও নৌকা হইতে লবণ কুঠীতে তোলা হইতেছে, কোথাও বা রাশিকৃত অপরিষ্কৃত লবণ পরিষ্কৃত করা হইতেছে, কোথাও বা পরিষ্কৃত লবণ বস্তাবন্দী করিয়া গুদামজাত করা হইতেছে; কোথাও চর্ম্ম রৌদ্রে শুকাইতেছে, কোথাও বা চর্ম্ম লোমশূন্য করা হইতেছে, কোথাও বা চর্ম্ম পেটা হইতেছে কোথাও বা টানা হইতেছে, কোথাও বা চর্ম্ম গণনা করিয়া ছাপ মারিয়া গুদামজাত করা হইতেছে; কোথাও বা অস্থি সংগ্রহ করিয়া একস্থানে রাশিকৃত করা হইতেছে, কোথাও বা সেই পর্ব্বতপ্রমাণ অস্থিরাশি হইতে অস্থি বাছিয়া বস্তাবন্দী করিয়া গুদামে রাখা হইতেছে। শুষ্ক মৎস্যের কারবারে গত কয় মাস ক্ষতি হওয়ায় ঐ ব্যবসায় সাহেব পরিত্যাগ করিয়াছেন ও মাছ ধরিবার জাল, ডিঙ্গি প্রভৃতি সমস্ত সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন; এখন শুষ্ক মৎস্যের গুদাম ও কারখানা খালি পড়িয়া আছে, কয়েকমাস ধরিয়া তাহাতে আর মনুষ্য সমাগম নাই।

দুই বৎসর পূর্ব্বে পারকার সাহেব এই জমী ইজারা লইয়া ঐস্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। বিস্তর ব্যয় করিয়া ছয়মাসে কুঠী নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইল। কত গাছ পালা কাটা পড়িল, কত ঝোপ

জঙ্গল পরিষ্কৃত হইল, কত খানা খন্দ ভরাট করা হইল, কত উচ্চনীচ ভূমিখণ্ড সমতল করা হইল, তবে কুঠী প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বে সাহেব কলিকাতা সহরের কোনও বিখ্যাত ধনী সাহেব সওদাগরের বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী হইয়া বিলাত হইতে এদেশে আসেন। তাহার পর নিজগুণে মনিবের প্রিয়পাত্র হইয়া সামান্য অংশীদার হইতে সমর্থ হন। তখন কলিকাতা সহরে আজি কালিকার মত এত বিদেশী ব্যবসাদার দোকান আপিষ খুলিয়া বসেন নাই। তবে কলিকাতা তখনও এদেশের প্রধান বাণিজ্যস্থান। কাজেই অল্পসংখ্যক ব্যবসায়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সকল ব্যবসাদারই বিলক্ষণ লাভবান হইতেন। পারকার সাহেবের গ্রহ সুপ্রসন্ন। অর্থের অনুসন্ধানে তিনি সপ্তসমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন; ভাগ্যদেবতাও তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন! তিনি মনিবের অংশীদার হইবার পরই তাঁহাদের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইল। পারকার সাহেব সামান্য অংশীদার হইয়াও সেই এক মরসুমে প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা অর্জ্জন করিলেন।

পারকার সাহেব বেতনভুক্ত সামান্য কর্ম্মচারী হইয়া এদেশে আসেন বটে, কিন্তু অনেকে বলিত, তিনি বড় ঘরের ছেলে; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বিলাতের "রেভেনডেলের" আরল বা মহা সম্ভ্রান্ত জমীদার, বিলাতে পারকার সাহেব "অনারেবল" ফ্রেডারিক রেভেনডেল বলিয়া অভিহিত হইতেন। এদেশে আসিয়াই তিনি সেই খোলোসটী ছাড়িয়া ফেলিয়া গোপনে থাকিবার নিমিত্ত পারকার নাম ধারণ করিলেন। কেহ কেহ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিত; তাহারাই বলিত পরকার সাহেব হতাশপ্রেমিক, তাই দেশ ঘর ছাড়িয়া অবিবাহিত অবস্থায় এই বিদেশে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। সাহেব অত্যন্ত সৌখিন লোক ছিলেন। তিনি ভাল থাকিতে, ভাল খাইতে, ভাল পরিতে ভাল বাসিতেন। ব্যবসায়ের লাভের টাকা পাইয়াই তিনি সেকালের সাহেবদের প্রথামত

বারাসতে ছবির মত মনোহর একখানি “ভিলা” বা পুষ্পবাটিকা নির্ম্মাণ করাইলেন ও তাহার তত্ত্বাবধানে দ্বারপাল ও মালী রাখিয়া দিলেন। নাম হইল তাহার “মলি ভিলা”। কেন এ নাম, কেহ জানিত না। তবে কেহ কেহ বলিত, “মলি” অথবা মেরি তাঁহার প্রণয়িনী, তাই তাঁহার নামেই ভিলার নামকরণ করা হইয়াছিল। কাজের ঝঞ্ঝাট না থাকিলেই সাহেব কলিকাতা হইতে অশ্বারোহণে বারাসতের পুষ্প-বাটিকায় চলিয়া যাইতেন ও তথায় নির্জ্জন প্রবাসে মনের তৃপ্তিতে কাল কাটাইতেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। অবসর পাইলেই তিনি সংস্কৃত, ফার্শী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেন। এ জন্য তিনি পণ্ডিত ও মুন্সী রাখিয়াছিলেন। বারাসতেই পারকার সাহেব সুন্দরবন প্রদেশে ইছামতীর দক্ষিণাংশের লবণাক্ততার কথা শ্রবণ করেন। তখনকার কালে লবণের কর ছিল না। সকলেই ইচ্ছামত লবণ প্রস্তুত করিতে পারিত। সাহেব চুপ করিয়া এক কাজে অনবরত লাগিয়া থাকিতে পারিতেন না। কাজেই যাই নূতন ব্যবসায়ের কথা তাঁহার কাণে উঠিল, অমনি তিনি পথপ্রদর্শকের সহিত অশ্বারোহণে ইচ্ছামতীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে নদীর তীরে বহুদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন দেখিয়া সোলাদানা গ্রামখানিকে ব্যবসায়ের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া ধার্য্য করিলেন। যেমন সঙ্কল্প, অমনি কাজ। কলিকাতায় ফিরিয়াই তিনি ধনী অংশীদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। অংশীদারের অগাধ পয়সা, পড়িয়া থাকিয়া ময়লা ধরিয়া যাইতেছে। নূতন ব্যবসায়ের কথা শুনিয়া তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। সোলাদানায় কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসায় চালাইবার কথা স্থির হইল। পারকার সাহেব সোলাদানার কুঠীর বড়কর্ত্তা হইলেন। অতঃপর তিনি সোলাদানাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত

করিতেন। অবশিষ্ট সময় কখনও বারাসতে, কখনও বা কলিকাতায় কাটাইতেন।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তিনি একটী বাঙ্গালী মুহুরীকে সঙ্গে লইয়া আসেন। এই মুহুরী তাঁহাদের কলিকাতার সেরেস্তার একজন পাকা কার্য্যদক্ষ লোক। তাহার নাম কালিচরণ দত্ত। সাহেব কাজের লোক দেখিয়া কালীদত্তকে বারাসতে আনিয়া রাখেন ও তাহারই তত্ত্বাবধানে বারাসতের সেই রম্য নিকেতন প্রস্তুত করান। সেই অবধি কালীদত্ত সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। কালীদত্তের নানা কদর্য্য দোষ ছিল; কিন্তু উদার-প্রকৃতি সাহেব তাহা সব জানিতে পারিতেন না। "মলি ভিলা" শেষ হইলে কালীদত্ত কলিকাতার সেরেস্তায় ফিরিয়া গেলেন। সোলাদানার কুঠীর জন্য লোক আবশ্যক হইলে, পারকার সাহেব আবার তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন ও সঙ্গে করিয়া সোলাদানায় লইয়া গেলেন। কালীদত্ত প্রথমে কিছুতেই সে স্থানে যাইতে সম্মত হন নাই। এমন কি তজ্জন্য চাকুরী ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বহু অর্থের লোভে সোলাদানায় আসিলেন। কালীদত্তের পরিবারের মধ্যে কালীদত্ত নিজে, তাঁহার স্ত্রী ও একটী পুত্র। কুঠীতে সাহেবের বাঙ্গলা ও সেরেস্তা ব্যতীত লোকলস্করের বাসোপযোগী অনেক ঘর ছিল; কিন্তু স্ত্রী পরিজন লইয়া বাস করিবার উপযুক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘর ছিল না। কালীদত্ত প্রথমে সেই লস্করদিগের উপযোগী একখানি গৃহে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন দুই যাইতে না যাইতে সেখানে বাস করা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। একে বাসস্থান ভাল নয়, তাহার উপর রাত্রে লোকজনের বিকট গানবাজনার বিকট শব্দে তাঁহার বিশ্রামের বড়ই ব্যাঘাত হইত। তখন লোকজন তাঁহার বশ হয় নাই; কাজেই

নিষেধ করিলেও কেহ তাঁহার কথায় কাণ দিত না। কালীদত্ত সাহেবের বাঙ্গলার কাছে ঘর বাঁধিবার জন্য সাহেবের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু সাহেব একরূপ হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "ওটী হবে না, তোমায় টাকা দিতেছি, ঐ দূরে যেখানে ইচ্ছা নিজের ঘর বাঁধিয়া লও।" দেওয়ান দেখিলেন সে এক বিষম হাঙ্গামা। এক ত' ঘর বাঁধানই এক হাঙ্গামা, তাহার উপর ঘর হইলেও সেই গোলমালের মধ্যেই বাস করিতে হইবে। কাজেই তিনি নিকটবর্ত্তী কোনও ভদ্র পল্লীতে বাস করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। শেষে দণ্ডীরহাটেই স্থান মনস্থ করিয়া ঘর বাঁধিলেন। সেখান হইতে সোলাদানা ক্রোশাধিক পথ নহে, অথচ ভদ্রপল্লী, কাজেই স্থানটা তাঁহার বড়ই পছন্দ হইল।

বারাসতে অবস্থানকালীন ঘটনাচক্রে দীননাথ অধিকারী নামক এক ব্যক্তির সহিত কালীদত্তের পরিচয় হয়। দীননাথ জাতিতে বৈষ্ণব হইলেও কালীদত্তের সহিত তাহার অত্যন্ত মিশামিশি হইয়াছিল। তিনি তাহার বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। সকলে বলিত, দীননাথের পরীর মত কন্যাটীই এই আকর্ষণের মূল। কালীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কাণে হাত দিয়া বলিতেন, "রাম রাম, ও কথা বল্‌লে পাপ হয়। যখন দীনুর সঙ্গে প্রথম আলাপ, তখন ওর কন্যা কোথায়? দীনু আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো। ওর ঋণ কি আমি শুধতে পারি?" যাহা হউক কালীদত্তের, সঙ্গে দীননাথও সোলাদানায় আসে। তাঁহার সুপারিশে সে কুঠীর পেয়াদাগিরি পাইয়াছিল। প্রথমে সে একাকী আসে। শেষে কালীদত্ত দণ্ডীরহাটে ঘর বাঁধিলে, সেও কিছু দিন পরে সেই গ্রামের প্রান্তদেশে নিজের একখানি কুটীর বাঁধিল; পরে পরিবারও আনিল। সে, তাহার স্ত্রী, তাহার এক বিধবা কন্যা, দুই বৎসরের শিশু পুত্র ও অতিবৃদ্ধা এক পিসি,—এই পরিবার।

প্রাতে উঠিয়াই কালিচরণ ও দীননাথকে কুঠীতে যাইতে হইত; দ্বিপ্রহরের পর বাটী ফিরিয়া আহারাদি করিয়া নিদ্রা, নিদ্রান্তে সায়াহ্নে আবার সোণাদানায় যাত্রা ও রাত্রি প্রহরাধিক অতীত হইলে বাটীতে পুনরাবর্ত্তন—ইহাই তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্য ছিল; তবে বিশেষ সাংসারিক কার্য্যাদি থাকিলে অথবা কুঠীর কাজে বাহিরে ঘুরিতে হইলে স্বতন্ত্র কথা।

আজ পঞ্চমী, কাল হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত কুঠীর ছুটী। এই কয়টা দিন কুঠীর লোকজন পূজার আমোদে মাতিবে, সাহেবও আজ বারাসতে চলিয়া যাইবেন। সেরেস্তা-ঘরে মহা কাজের ঝঞ্ঝাট। আজ সমস্ত লোকজনের বেতন পরিশোধের দিন। আবার সাহেবের হুকুমে ঐ দিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা চাই। হাঙ্গামাও বিস্তর; বেতন আছেই, তাহার উপর আবার পূজার পার্ব্বণী। পার্ব্বণীটা সাহেব ব্যবসায়ের আয় হইতে না দিয়া নিজের তহবিল হইতে দিতেন। কুঠীর লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত হইবে; ইহার মধ্যে নদীয়া জেলা হইতে আনীত লোকসংখ্যাই অধিক; তাহারা সপরিবারে কুঠীতেই বাস করে, স্ত্রীপুরুষে কুঠীর কাজ করে, স্ত্রীপুরুষে উপায় করে। এই সমস্ত লোককে ঐ একই দিনে বেতন ও পার্ব্বণী দিতে হইবে—কাজেই কাজটী বড় সোজা নহে।

সাহেবের বাঙ্গলার নিকটে আম্রকুঞ্জমধ্যে সেরেস্তা ঘর। নদীর ঠিক উপরে বিস্তীর্ণ আম্রকানন ছিল; সেই আম্রকাননের মধ্যস্থলে অনেকগুলি বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত করা হইয়াছে ও সেই ছায়াশীতল মনোহর আম্রকুঞ্জের মধ্যস্থলে সাহেবের বাঙ্গলা ও তাহারই পার্শ্বে বিশরশি দূরে সেরেস্তা-ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। দূরে নদীবক্ষ হইতে আম্রকাননবেষ্টিত বাঙ্গলা ও সেরেস্তাঘরখানি ছবির মত দেখাইত।

ভূমি হইতে কুঠীর মেঝে অনেক উচ্চ, সেই মেঝের উপর প্রকাণ্ড এক দালান-ঘর ও তাহার চারিদিকে বারাণ্ডা; ঘরের দেওয়ালগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত, ছাদ কিন্তু কাঠ ও খড়ের। ঘরের চারিদিকে সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ দরজা জানালা; ঘরটী কাঠের বেড়া দ্বারা অনেকগুলি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে; ইহার কোনটায় কাগজপত্র থাকে, কোনটায় তাহার হিসাব নিকাশ হয়, কোনটা বা দেওয়ান মহাশয়ের সহিত লোকজনের দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা কহিবার স্থান। সমগ্র সেরেস্তা গৃহের একটীমাত্র কক্ষে সাহেবের খাস কামরা; সাহেব প্রত্যহ অন্ততঃ একবার সেইখানে আসিয়া সেরেস্তার কাজকর্ম্ম দেখিয়া যাইতেন।

সাহেবের বাঙ্গলাখানি আরও সুন্দর, যেন একখানি সাজান খেলানার ঘর। সাহেবের বাঙ্গলা সেরেস্তা হইতে আরও উচ্চ, আরও প্রশস্ত। মধ্যে বড় হল, হলের পার্শ্বে উত্তরে ও পশ্চিমে চারি পাঁচখানি সুপ্রশস্ত কক্ষ—সকল কক্ষেই বড় বড় জানালা দরজা, সার্সী খড়খড়ি; দক্ষিণে ও পূর্ব্বে প্রশস্ত বারাণ্ডা। হল, কক্ষ, বারাণ্ডা,—সকলই সুসজ্জিত, সুচিত্রিত। সাহেবের বাঙ্গলার দক্ষিণে অতি সুন্দর ফুল-বাগান, তাহাতে দেশী বিলাতি কত ফুলের গাছ, কত পাতার গাছ, কত লতা।

সেরেস্তায় হুহু কাজ চলিতেছে। স্বয়ং দেওয়ান কালীদত্ত মহাশয় মোট মোট টাকার থোলে পার্শ্বে লইয়া বসিয়া আছেন; পার্শ্বে দীনু পেয়াদা দাঁড়াইয়া আছে; এক এক জনের নাম ডাক হইতেছে, সেও অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইতেছে, আর দীনু হাতে হাতে তাহার পাওনা চুকাইয়া দিতেছে। দুইজন মুহুরী দেওয়ানজীর সম্মুখে বসিয়া টাকা গণনা করিয়া থাক দিয়া রাখিতেছে; একজন দেওয়ানজীর আদেশমত তাহা উপযুক্তরূপে বণ্টন করিয়া দীনুর হস্তে দিতেছে; জমাদার পাওনাদারকে হাঁক দিয়া ডাকিতেছে ও সে

আসিলে দীনু তাহার পাওনা তাহার হাতে দিতেছে। অতি প্রত্যূষেই এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নাম ডাকের ঘটাটাই একবার দেখুন!

	নামের তালিকা।	মাসিক বেতন।
১।	খানসামা।	১৬৲
২।	বেহারা।	১২৲
৩।	পেয়াদা।	১০৲
৪।	বাবুর্চ্চি।	২০৲
৫।	বাবুর্চ্চির সাহায্যকারী ২ জন প্রত্যেকে।	৮৲
৬।	খিদমদগার।	৮৲
৭।	জমাদার।	৮৲
৮।	চোপদার।	৬৲
৯।	আসাসোটাদার।	৬৲
১০।	হুঁকাবরদার।	৲
১১।	মালী ৩ জন প্রত্যেকে।	৲
১২।	ছাতাওয়ালা।	৲
১৩।	সহিস ৩ জন প্রত্যেকে।	৲
১৪।	ধোবী।	৲
১৫।	মশালচী।	৫৲
১৬।	নাপিত।	৪৲
১৭।	মাঝি।	১২৲
১৮।	দাঁড়ী ৮ জন প্রত্যেকে।	৮৲
১৯।	পাল্কী-বেহারা ৮ জন প্রত্যেকে।	৪৲
২০।	পাখাওয়ালা বেহারা ৩ জন প্রত্যেকে।	৬৲
২১।	মেথর।	৬৲
২২।	কুকুরের মেথর।	৬৲

এ ত' গেল সাহেবের ঘরের খাস চাকর বাকর। তাহার পর সেরেস্তার দেওয়ান, মুহুরী, পেয়াদা, ভৃত্য; আবার কুঠীর গুদাম-সরকার, সর্দ্দার মেট, ছোট মেট, লোকজন। তবে সুবিধার মধ্যে এই যে, মেটেরা স্ব স্ব অধীনস্থ লোক লস্করদিগের বেতন একত্রে লইয়া যাইতেছে। যাহাই হউক, কাজ বড় সোজা নহে। তদুপরি আরও একটী কাজ। কোম্পানী সাহেবের শরীর-রক্ষা-ব্যপদেশে সেইখানে একটী পুলিশ-ফাঁড়ি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তখনকার কালে সাহেবসুবা যেখানেই থাকিতেন, সেইস্থানেই ঐ ব্যবস্থা করা হইত। পারকার সাহেব ইহাতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু আপত্তি টিকিল না; কোম্পানীর আইনমতে পুলিশ না রাখিলে তখনকার কালে সাহেবেরা মফঃস্বলে থাকিতে কিম্বা ব্যবসায় করিতে অনুমতি পাইতেন না। কাজেই সোলাদানার কুঠীতেও পুলিশকে স্থান দিতে হইয়াছিল। একজন থানাদারের অধীনে ১২ জন পুলিশ বরকন্দাজ কুঠীতে থাকিত। সাহেবকে তাহাদের বেতন যোগাইতে হইত না বটে, তবে তাহাদের রসদ হিসাবে তাঁহার সেরেস্তা হইতে মাসিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইত।

বেতন দেওয়া হইতেছে। প্রধান মুহুরী ঝনঝন করিয়া টাকার আওয়াজ করিতেছেন ও তাহা হইতে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা বণ্টন করিয়া দিতেছেন। দেওয়ান স্বয়ং গদিয়ান হইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছেন, "নাও, নাও, শীঘ্র সেরে ফেল; বেলা প্রহরাধিক প্রায় হয়ে এল, কাজ সেরে সাহেবের যাত্রার উদ্যোগ করে দিয়ে তবে বাড়ী ফিরতে পারব।"

মুহুরীরা বড় একটা দেওয়ানের মুখের উপর কথা কহিতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু দীনু পেয়াদার সাতখুন মাফ ছিল। সে অমনি বলিল, "বলে ত' যাচ্ছেন আপনি, কিন্তু কাজটী ত' বড় সোজা নয়।

অত তড়িঘড়ি হলে কি চলে ? আর সাহেব ত এখন বোটে চড়ে হাওয়া খাচ্ছে। সাহেব না এলে ত' আর কিছু হবে না।"

জমাদার (তখনকার কালের দ্বারবান) দেবী সিং দাড়ী চুমরাইয়া বলিল, "আরে চুপ রহো, দীনু দাদা। সাহাবকা আওয়াজ ময় নে আবি মালুম যাতা, হোগা কোহি কো সাহাব বোলাতা।"

দেওয়ান ঈষৎ ক্রোধে বলিলেন, "তুই থাম, বেটা ভোজপুরী কিনা ! যেমন গতোর, তেমনি বুদ্ধি। সাহেব গেলো বোটে হাওয়া খেতে, ও বুদ্ধির ঢেঁকী শুনলে সাহেব ডাকছে।"

যেমন কথাবার্ত্তা,তেমনি চেহারা ! একে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি, তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার চক্ষু ও অতি স্থূল অধরোষ্ঠ, আবার মুখে বসন্তের দাগ ; যেন সোনায় সোহাগা। দেওয়ানজীর একটী বড় দোষ ছিল ; কাহারও সহিত কথা কহিতে বা হাসিতে বা কাহারও প্রতি তাকাইয়া দেখিতে গেলে তাঁহার জিহ্বাটী অজ্ঞাতসারে বদন-বিবরের বাহিরে ঝুলিয়া পড়িত। জমাদারের কথার উত্তর দিতে গিয়াও তাঁহার জিহ্বাটী ঝুলিয়া পড়িল। সে বীভৎস কদাকার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। দীনু কিন্তু পূর্ব্বদিকের জানালা হইতে উকি মারিয়া দেখিয়া শশব্যস্তে বলিল, "হাঁ, ঠিকই ত' বটে। সাহেবের বজরা ঝাউতলায় বাঁধা পড়েছে। জমাদারের কথাটা মিথ্যা নয়।"

সকলে বিশেষ মনোযোগের সহিত স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এমন সময়ে যথার্থই ডাক পড়িল, "ডাট্টো খালী ! ডাট্টো খালী !" সকলে বলিল, যথার্থই সাহেব বাঙ্গলা হইতে ডাকিতেছেন। এ সাহেবের সবই বিপরীত, তিনি তাঁহাদের প্রথামত লোক দিয়া লোক ডাকাইতেন না ; আবশ্যক হইলে নিজেই ডাকিতেন। সাহেবের গলার আওয়াজ পাইয়াই দেওয়ানজী মহাশয় এক লম্ফে শয্যা হইতে অবতীর্ণ হইয়া

জবাব দিলেন, "হাজীর হুজুর"। বলিয়াই তাড়াতাড়ি বেনিয়ানটা আঁটিয়া, মাথায় তাজ চড়াইয়া, গলায় উড়ানী ঝুলাইয়া, পায়ে দিল্লীয়াল জুতা পরিয়া, বাঙ্গলার দিকে ছুটিলেন। টাকাকড়ি পড়িয়া রহিল, কাছা খুলিয়া গেল, জুতার পাটী উণ্টা পরা হইল, তাজটা বাঁকা বসিল, উত্তরীয় লুটাইয়া চলিল, সে সব লক্ষ্য নাই। রুদ্ধশ্বাসে যোড়হস্তে দেওয়ানজী মহাশয় সাহেব সকাশে হাজির।

সাহেব তখন বাঙ্গলার দক্ষিণ বারাণ্ডায় আরাম কেদারায় শায়িত আছেন। তাঁহার শ্রীপার-শোভিত পদযুগল সম্মুখস্থ এক কাষ্ঠাধারের উপর স্থাপিত। সাহেবের পরিধানে ঢিলা ইজের, পাতলা পিরিহান। সাহেবের হাতে কেতাব, পার্শ্বস্থ কাষ্ঠাধারেও অনেক কেতাব, মস্যাধার লেখনী ও কাগজ। আর আশ্চর্য্য হইবেন না, অপর পার্শ্বের কাষ্ঠাধারে ঘোলের সরবৎ, ফলমূল, পান এলাচি। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, সাহেবের মুখে শটকার প্রকাণ্ড নল। হুঁকাবরদার রূপার গুড়গুড়িতে গোলাবজল পুরিয়া, রূপার কারুকার্য্যখচিত কলিকায় তাওয়া দিয়া অম্বুরী তামাকু সাজিয়া, চিত্রবিচিত্র বহুমূল্য নলের স্বর্ণনির্ম্মিত মুখটী সাহেবের হাতে দিয়া, সুন্দর ময়ূরপাখায় কলিকার উপর অল্প অল্প হাওয়া করিতেছে। বেহারা কাশপুষ্পের ঝাড়ন দিয়া বারাণ্ডার চিক ও অন্যান্য আসবাবপত্রের ধূলা না থাকিলেও ধূলা ঝাড়িতেছে। ছাতাওয়ালা জালের পাখা লইয়া মাছি না থাকিলেও মাছি তাড়াইতেছে। পাখাওয়ালা ইছামতীর ফুরফুরে হাওয়া সত্ত্বেও পাখা টানিয়া হাওয়া করিতেছে। খানসামা হাতে হাতে সরবৎ ও ফলমূল আবশ্যকমত যোগাইয়া দিতেছে। খিদমদগার কিছু ত্রুটি না হয়, তাহাই দেখিয়া বেড়াইতেছে। বরকন্দাজ কোথাও কিছু গোলযোগ না হয়, তাহাই দেখিতেছে। সাহেবের পায়ের তলায় প্রকাণ্ড বাঘমুখো কুকুর শুইয়া আছে। নাতিদূরে পূর্ব্বদিকে ঝাউতলার বাঁধাঘাটে

সাহেবের সুন্দর ময়ূরপঙ্খী বাঁধা রহিয়াছে; সেখানি জলের তরঙ্গে ঈষৎ নাচিতেছে। আর ঝাউতলার বাঁধাঘাটের বৃহৎ ঝাউগাছের পার্শ্বে বকুল গাছের ফুলে ফুলে ভ্রমরা গুণ গুণ স্বরে মধু সঞ্চয় করিয়া বেড়াইতেছে; সেই গুণ গুণ রবে ও বকুল ফুলের সুবাসে প্রাতঃসমীর ভরিয়া গিয়াছে।

দেওয়ান কালীচরণ সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন। কি প্রভেদ—যেন স্বর্গ আর নরক! সাহেব দেখিতে অতি সুপুরুষ—অতি অমায়িক, তাঁহার মুখে যেন সরলতা, উদারতা ও দয়া মাখানই আছে। সাহেব ঠিক সেই অবস্থায় থাকিয়া কেবলমাত্র কেতাব হইতে চোখ উঠাইয়া বলিলেন, "ডাট্টো খালী, সব ঠিক হোলো? পালানকিন রেডী ঠাকা হোনা চাহি। হামি অপরাহ্ণে যাইবে না, ঠিক করিল রাট্রে চাঁডনী আলোকে যাইবে।"

কালীচরণ। (সেলাম করিয়া) "যো হুকুম, খোদাবন্দ। ও সব রেডী থাকবে। তবে রেতে না গেলে হতো না?" দেওয়ানজী মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

সাহেব। (সাশ্চর্য্যে) কেনো? কি হইল? রাট্রে কি বেহারা যাইবে না?

কালী। আজ্ঞে না হুজুর, বেহারা যাইবে না কি? ওরা যে আমাদের মাইনে করা। তাহার জন্য ভাবছি না। তবে—

সাহেব। তবে কি হইল, বাবা?—হামাকে পোষ্টো কড়িয়া বোলো।

কালী। হুজুর রাতে পথে ভয়—

সাহেব। (ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া) ভয়? আংরেজের ভয় কি আছে, বাবা?

কালী। আজ্ঞে হুজুর, ঘুঘুড়ীর জীবনে ডাকাত বড় বাড়িয়ে তুলেছে।

টাকীর বড় পথে রাতে চলবার যো নাই। বিশেষ হুজুর যাবেন, সঙ্গে টাকাকড়ী থাকবে মনে করে তারা ওৎপেতে বসে থাকবে।

সাহেব। (হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। হামি টাহাই চাহে।

দেওয়ানজী ও খানসামা পরস্পর মুখের পানে তাকাইয়া উভয়ে উভয়কে মনে মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। হঠাৎ সাহেব শটকার নলে টান দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ডাট্টা খালী, হামি রাট্রেই যাইবে, টুমি বেহারা ঠিক কড়িয়া, সাইসকো হামার কালা ঘোড়ার সাজ ডিটে বলিবে, হামার সাঠে যাইবে।"

কালী। যো হুকুম, খোদাবন্দ। তবে আমি আসি, সব বন্দোবস্ত করি গিয়ে।

কালীচরণ সেরেস্তায় ফিরিয়া আসিলেন। বস্ত্রাদি ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "বাবা, ঢের ঢের সাহেব দেখেছি, কিন্তু এমনটী দেখিনি। এর কি সব বিপরীত? যা সকলে করবে, তার ঠিক বিপরীত করবে।"

দীনু জিজ্ঞাসিল, "কেন, কি হয়েছে?"

কালী। হবে আবার কি? ভয় নেই একবারে! বলেকিনা রাত্রিকালে বারাসতে যাবে, ডাকাতের কথা বল্লাম, তা হাহা করে হাসতে লাগল। অন্য সাহেব হলে কত লোক লস্কর বন্দুক তরোয়াল নিয়ে মফঃস্বলে বেড়াত, এর কি সব সৃষ্টিছাড়া।

দীনু। তাতে আপনার কি মাথাব্যথা পড়ে গেল?

কালী। বাঃ সাহেব মারা যাক, আর আমাদেরও অন্ন উঠুক! ওর যে কেমন গোঁ, যা ধরবে তা ছাড়্‌বে না। কত করে বোঝালেম যে, একটা বে কর, না হয় বল্ খুবসুরৎ দেশী মেয়েমানুষ জুটিয়ে দিই; এখন কত সাহেবে তা করছে, আর তাই দেশে অনেক দিশি-গোরা জন্মাচ্ছে। তা তেমনি কি আমার সাহেব? রেগে কাঁই। বলে, তারা ছোটলোক বদমাস, আমি কি তাদের মত। বাপু—বে করলিনি,

মেয়েমানুষও রাখলিনি, একটা আপনার লোক হলোনা। তা আমরা তোর হিতৈষী চাকর, আমাদের কথাটা আসটা শুনে চল্, তাও না? হাজার হোক ছেলে মানুষ। এর পর দেখছি বেখোরে প্রাণটা খোয়াবে, আর আমরাও ভেসে যাব।"

দীন। তা হোক্, মুনিব এমন হবে না। সেদিন পরাণের ডর না ক'রে দুরন্ত নদীর জলে ডুব কেটে শাঁখারীদের ছেলেটাকে বাঁচালে। আবার সেই জেলে মাগীটা খেতে পায়নি, ছেলে কোলে কেঁদে এসে প'ড়লো, জমাদার গোল হবে বলে তাড়িয়ে দিলে। মাগী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে গেল। মাগীর সাথে আমার একদিন দেখা হয়েছিল। মাগী ব'ল্লে, সাহেব বাঙ্গলা থেকে তারে দেখেছিলো, দেউড়ী পেরিয়ে খানিক দূর এসে সাহেব তারে অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তার পর তারে পাঁচটা টাকা চুপি চুপি দিয়ে ব'ল্লে, 'যা ছেলেকে দুধ কিনে খাওয়াস, দরকার হ'লে আবার আসিস, এই গাছতলায় বসিস, দেউড়ীতে গেলে জমাদার গোল করবে। সকালে এই পথে আমি বেড়াই, তোকে দেখতে পাব।'

কালী। হাঁ হাঁ, ঐ করে করেই ত সর্ব্বস্ব খোয়ালে, রাসপশারও গেল, কুঠীতে নূতন লোক জোটান দায় হয়েছে। ওর আর কি, আমরা—

এমন সময়ে নেপথ্যে ডাক পড়িল, "ডাট্রো খালী"। দেওয়ানজী আবার ত্রস্তে ধড়া চূড়া পরিয়া ছুট দিলেন। সাহেব তাঁহাকে দেখিয়াই সাগ্রহে বলিলেন, "হাঁ গো মশা, ভাল কথাটী ভুলিয়া গেল। হামার সে লড়হাইয়া ককের কি হইল? হামি এইবার উহাডিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে।"

কালী। হুজুর, দুই জোড়া যোগাড় হ'লো না। পাওয়া কি যায়? বহুকষ্টে বহুদূরে লোক পাঠিয়ে তবে এক জোড়া যোগাড় করেছি। খরচ বিস্তর হয়েছে।

সাহেব। হাঁরে মশা, টাকার কোঠা টোকে কে জিজ্ঞাসা করিল? হামাকে একবার ডেখা ডেখি।

কালী। "আজ্ঞে, এই যে দেখাচ্ছি। দেখবেন, কেমন ফুলে ফুলে উঠে ডানা ঝেড়ে লড়াই করে, দেখলেই আপনার পছন্দ হবে।" এই কথা বলিয়া তিনি একজন অনুচরকে ইঙ্গিত করিলেন ও সাহেবের নিকট নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া মোরগের গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এক জোড়া লড়ায়ে মোরগ আসিল। কালীচরণ মোরগওয়ালাকে ইসারা করিয়া দিলেন। তাহাদের লড়াই আরম্ভ হইল। সাহেব সন্তুষ্ট। কালীচরণ সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন যে, আট ক্রোশ দূর হইতে ২৫।২৫—পঞ্চাশ টাকা দিয়া তিনি ঐ দুটী বহুকষ্টে ক্রয় করিয়া আনাইয়াছেন। সাহেব তখনই তাঁহাকে নিজ তহবিল হইতে একশত টাকা লইতে বলিলেন। কালীচরণ মহাহ্লাদে সেরেস্তায় চলিয়া গেলেন। সরলপ্রাণ উচ্চহৃদয় সাহেবের নিকট এইরূপ প্রতারণা করিয়া তিনি বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিতেন। মোরগ দুটী তিনি দণ্ডীরহাটের ফুলবাড়ীর কোনও মুসলমানের নিকট ৫৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই মুসলমান উহাদিগকে তাঁহারই কথায় ছুরির খেলা ইত্যাদি শিখাইয়াছিল। সেই জন্যই উহাদের মূল্য ৫৲ টাকা ধার্য্য হয়। কিন্তু সাহেবকে তিনি অনায়াসে ৫০৲ বলিয়া আদায় করিলেন ১০০৲ টাকা। এই সকল নীচমনা লোকের সহবাসেই তখনকার সাহেবদিগের এদেশবাসীদিগকে নীচ বলিয়া ধারণা হইত।

কালীচরণ সেরেস্তায় কাজে বসিয়াছেন, এমন সময় আবার তাঁহাকে ডাক পড়িল। কালীচরণ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "না, ভূতের সন্তান কাজ কর্‌তে দিলে না। এদিকে সকাল সকাল হিসেব পত্র সব চুকিয়ে যাত্রার উদ্যোগ করে দিতে হবে; কিন্তু তলবের ত কামাই নাই।" বলিলেন বটে, কিন্তু সুড় সুড় করিয়া সাহেবের

বাঙ্গলায় হাজিরও হইলেন ; দেখিলেন, মোরগওয়ালা চলিয়া গিয়াছে, সাহেব আবার পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

কালীচরণ সেলামান্তে দাঁড়াইলেই সাহেব এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "খালী! জোম্মোটা টোর বৃঠায় গেলো। বুঢ্ঢা হইলি, বাল পাকাইলি, কি করিলি, বল্ বাবা। হেমন সোনার ভাষা শিখিলি না, পড়িলি না ? শুন শুন, হেকটূকু শুন"—সাহেব এই কথা বলিয়া, তালে তালে পা ঠুকিয়া, মাথা নাড়িয়া, হেলিয়া দুলিয়া, সানন্দে প্রফুল্ল মনে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন :—

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগো দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাং।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥
হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরত জালমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা-
বিষ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥

ডেখ, ডেখ, ভবভূতি শোকের কঠা কেমন লিখিয়াছে। এমন কুঠা পাইবি, বাবা ?"

দেওয়ানজী এতক্ষণ নদীর জলে ময়ূরপক্ষী কেমন নাচিতেছিল তাহাই দেখিতেছিলেন। সাহেবের কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা বটেই ত, হুজুর, তা বটেইত। তবে এখন যাই, কাজ শেষ করে হুজুরের যাত্রার উদ্যোগ করি গিয়ে।"

সাহেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "Poor soul! I pity him. ডেশের হেমন জিনিষ বুঝিলি না, টাহার রস লইতে পারিলি না! যাট্রার কি উড্যোগ করিটেছে ?"

দেওয়ান। আজ্ঞে হুজুর, সে অনেক কাণ্ড। এ ত' আমাদের যাওয়া নয়। চোপদার, আসাসোটাদার, মশালচি, বরকন্দাজ—"

সাহেব। (বাধা দিয়া) Hold! হামাকে কি মারিয়া ফেলিবি? এটো লোক কি করিবে, বাবা?

দেওয়ান। আজ্ঞে, হুজুর, আপনার সঙ্গে যাবে। না ত তারা আছে কেন?

সাহেব। আছে কেন? না ঠাকিলে কুঠা যাইবে, বাবা? না, খাইয়া মড়িয়া যাইবে? এ কেমন কোঠা?

দেওয়ানজী সাহেবের ভাবগতিক বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আজ্ঞে, হুজুর, তা বটেই ত', তা বটেই ত'। থাকবে না ত' যাবে কোথায়? জন্ম জন্ম হুজুরের অন্নে প্রতিপালিত হবে—

সাহেব। ডেখো. ডাট্টোখালী! লোক যাইবে না। সব ছুটী পাইল। পূজায় আনণ্ড করিবে। হামি যাইবে, হাম্মার ঘোড়া যাইবে, হামার সাইস যাইবে।

দেওয়ান। যো হুকুম, হুজুর! কেউ যাবে না,কেবল ঘোড়া যাবে। কিন্তু, হুজুর—

সাহেব। আবার কি হইল রে বাবা!

দেওয়ান। আজ্ঞে, বরকন্দাজেরা ত' সবাই যাবে। থানাদার তাই বলছিল।

সাহেব। (ক্রুদ্ধ হইয়া) Thanadar be hanged! টোমরা কি এই গরীবকে বাঁচিটে ডিবে না? বোলাও ঠানাডারকো, জলদি, জলদি—সাহেব এই কথা বলিয়া কাষ্ঠাধারে পা ঠুকিতে লাগিলেন। দেওয়ানজী আর সেখানে নাই। খানসামা ছুটিয়াছে, ছাতাওয়ালা ছুটিয়াছে, খিদমদগার ছুটিয়াছে, দেওয়ান ছুটিয়াছে, যে যে কাছে ছিল সকলেই থানাদারকে ডাকিতে ছুটিয়াছে।

সাহেব কেতাব রাখিয়া দিয়া ডাকিলেন "লিও"। লিও তাঁহার পদতলে কেদারার নিম্নে শুইয়া ছিল। মনিবের ডাক শুনিয়াই সেই প্রকাণ্ড কুকুর অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া সাহেবের পার্শ্বে আসিয়া বসিল ও লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল। সাহেব শিশ দিতে দিতে তাহার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এমন সময় দেওয়ান্ সদলবলে থানাদারকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

থানাদার সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে পর সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "টুম কয়জন যাইবে?"

থানাদার। চারো আদমী, খোদাবন্দ।

সাহেব। হামার সাঠে কুছু ঠাকিবে না বাবা। টেবে কি জন্য এটো ঝামেলা লাগাইবে?

থানাদার সবিনয়ে বলিল, "এসাই হুকুম, জনাব। কোম্পানীকো নোকর, আপকো বি নোকর। যেইসাই হুকুম মিলেগা, এয়সাই কাম হোগা, খোদাবন্দ।"

সাহেব। কা হুকুম মিলা টুমারা?

থানাদার। আপ যাঁহা যাওঙ্গে আপকা সাত বরকন্দাজ লেকে ময় নে হাজের রহেঙ্গে।

সাহেব। ক্যায়া ওয়াস্তে?

থানাদার। আপকা কুছ তকলিব ঔর মুস্কিল—

মুখের কথা মুখেই রহিল, আর থানাদারের কিছু বলিতে হইল না। অকস্মাৎ লিও বিকট শব্দ করিয়া এক লম্ফে থানাদারের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। থানাদারও "বাপরে জান গিয়া" বলিয়া ধরাশায়ী হইল। সাহেব হা হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। লিও তাঁহারই গুপ্ত আজ্ঞায় থানাদারকে আক্রমণ করিয়াছিল, আবার তাঁহারই আহ্বানে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। থানাদারের তখন

গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে গা ঝাড়িয়া দাঁড়াইলে পর সাহেব সহাস্যে বলিলেন, "টুমি বীড় আছে ঠানাডার; ডাকাইট পড়িলে টুমি রক্ষা করিবে নিশ্চিট। হাঃ হাঃ হাঃ।"

থানাদার অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আপকা সাথ ময় নে তো বিশো দফে এয়সা গিয়া রহা জনাব। কবি কুছ হুজুরকো মুস্কিল হুয়া?"

সাহেব দেখিলেন লোকটা বিষম লজ্জিত হইয়াছে। তখন তাহাকে বলিলেন, "নেহি ঠানাডার, টুম বহুৎ হুসিয়ার আডমী। হামি টুমারা পুলীশ সাহাবকো ভালা রেপোর্ট ডেগা। আবি পূজাকা বকশিশ লে যাও।" সাহেব থানাদারকে দশটা টাকা ফেলিয়া দিলেন। থানাদার বহুৎ সেলাম করিয়া বকশিশ গ্রহণ করিল। সাহেব উঠিলেন, বড় হলে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "লেকিন এক কাম করনা চাহি। বারকন্দাজ লোক্‌কো বহুৎ পিছাড়ি রহেনে বোল ডিও।" থানাদার সেলাম করিয়া বিদায় লইল।

জীবনের শেষ কথা।

শরতের শুভ্র আকাশে শঙ্খ-শ্বেত শতখণ্ড সুন্দর মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। জ্যোতির্ম্ময়ী রজনী নির্ম্মল জ্যোৎস্নাবসনে জগৎ আবৃত করিয়াছে। শুভ্র কাশমালা গলে ধরিয়া শুভ্রা ধরণী শুভ্র জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা মধুময়ীযামিনীপরিশোভিতা সুখদা পবিত্রা ধরিত্রীর নির্ম্মল জলে শুভ্র চন্দ্রমার শত শত শুভ্র ছবি নাচিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে,—ক্ষণেকে মিলাইতেছে আবার দেখা দিতেছে। দিবালোকপ্রতীয়মানা সেই কুন্দেন্দুধবলা শোভনা জ্যোৎস্নায় মত্তহংস আনন্দকলরবে তরঙ্গায়িত সরোবর মুখরিত করিতেছে। তুষারধবল কুমুদ কহলার, করবী টগর, সেফালিকা

রজনীগন্ধা, সেই অনন্ত শুভ্রে গা ঢালিয়া দিয়াছে। ফলভারাবনত ধান্য-লতাজাল বিকম্পিত করিয়া, পুষ্পভারনম্র করবীশাখা আন্দোলিত করিয়া, কুসুমসৌরভ সর্ব্বাঙ্গে বহন করিয়া সরোবরসংস্পর্শশীতল মধুর পবন দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সর্ব্বত্র গন্ধামোদে পুলকিত করিতেছে।

দিক সুন্দর, জল সুন্দর, আকাশ সুন্দর, চন্দ্র সুন্দর, তারকা সুন্দর, পবন সুন্দর—সব সুন্দর। বিকসিত-পদ্মাননা, প্রফুল্লনীলোৎপল-নয়না, নবকাশপরিধানা, কুমুদহাসিনী মনোহারিনী শরতের সবই সুন্দর। এ সৌন্দর্য্য-সম্ভোগে কত আনন্দ!

কিন্তু আজ আনন্দে নিরানন্দ। সর্ব্বানন্দদায়িনী বঙ্গজননীর মর্ম্মস্থল বিদারণ করিয়া গভীর শোকোচ্ছাস উঠিয়াছে। কেন এ বিষাদের মর্ম্মচ্ছেদী নিশ্বাস? আজ যে মা চলিয়া যাইতেছেন, আজ যে মায়ের বিজয়া-দশমী, আজ যে মায়ের বিসর্জ্জন! সারা বরষ পরে তিনটী দিন মাত্র মা আসিয়াছিলেন, তাই নিরানন্দেও আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, শোকতাপজর্জ্জরিত সংসারে শান্তি দেখা দিয়াছিল। মাও যাইতেছেন, বিষাদে সংসার আচ্ছন্ন করিতেছে।

যথারীতি প্রতিমা নামান, শান্তিবারি সিঞ্চন, পুরনারীগণের প্রতিমা-বরণ প্রভৃতি কার্য্য শেষ হইল। দর্পনারায়ণ ঘন ঘন পঞ্জিকা দেখাইতেছেন। সময় হইল, প্রতিমা দালান হইতে প্রাঙ্গণে নামান হইল। বহুলোকে স্কন্ধে বাহিয়া লইয়া প্রতিমা বাঙ্গোড়ের ঘাটে লইয়া চলিল। অনেকে প্রাঙ্গণের ধূলায় লুটিয়া পড়িয়া মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার দালান আঁধার হইয়া গেল।

পথিপার্শ্বে বিস্তর জনতা। সকলেই প্রতিমা দেখিতে আসিতেছে। বাঙ্গোড়ের ঘাটে ৭।৮ খানি ডাব-নৌকা প্রস্তুত। দুই কিম্বা চারিখানি

জেলেডিঙ্গি পাশাপাশি বাঁধিয়া ডাব-নৌকা প্রস্তুত হয়। ইহারই একখানায় প্রতিমা স্থাপিত করা হইল। অপর একখানি ডাবে বাজনদার প্রভৃতি বসিল। ব্রাহ্মণেরা কলাবৌ ও ঘট লইয়া অপর ডাবে উঠিলেন। দর্পনারায়ণ জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে লইয়া অপরাপর ডাবে চড়িলেন। লোক-লস্করও এক ডাবে উঠিল। বাঙ্গোড়ে অন্যান্য গৃহস্থের প্রতিমাও বিসর্জ্জন দিতে আনা হইয়াছে। বাচ খেলা, বাজনা দ্বন্দ্ব, বন্দুক ছোট কাঠের কামান ও দমার পাল্লাপাল্লি চলিল, বাজি বিস্তর পুড়িল। ডাবের উপর লাঠি-খেলা, সড়কি-খেলা, তিরন্দাজীও চলিল। রাত্রি দেড়-প্রহরাধিক গত হইলে সকলে নিরঞ্জন করিয়া ঘরে ফিরেন ও গ্রামের সমস্ত দেব-স্থান প্রদক্ষিণ এবং প্রণাম করিয়া, উদ্বোধনের বিল্বপীঠ ও পূজার দালান প্রণাম করিয়া, ইতর-ভদ্র সকলে যথাক্রমে বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে প্রণামালিঙ্গন ও সমবয়স্কদিগকে ও বয়োকনিষ্ঠদিগকে নমস্কারালিঙ্গন করিয়া, দালান হইতে প্রদীপ, খড়্গ ও মঙ্গলঘট লইয়া অন্তঃপুরে যান। বাঙ্গালীর বিজয়ার এই সর্ব্বসাধারণের নমস্কারালিঙ্গন কি মধুর, কি পবিত্র! অন্তঃপুরে প্রত্যেকে দুর্গানাম লিখিয়া সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন মুখে দেন ও পুরনারীদিগকে প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করেন। আহা, এমন দ্বেষ হিংসা শত্রুতা ভুলিবার অবসর আর কোথাও পাই কি?

সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে চন্দ্র তারকা ফুটিয়াছে। দর্পনারায়ণ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছেন। গ্রাম নীরব, যেন ঘুমের ঘোরে অচেতন। ক্বচিৎ কোথাও একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতেছে, আর সেই ডাকে ভয় পাইয়া ভূপতিত বৃক্ষপত্রের উপর দিয়া খস্ খস্ শব্দ করিয়া শৃগাল বন হইতে বনান্তরে পলাইতেছে।

গ্রামে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ব্যতীত বড় একটা কেহ নাই, সকলেই বিসর্জ্জনের আমোদে যোগ দিতে গিয়াছে। গ্রামের দক্ষিণে

বাজারখোলা। এই স্থানটা স্বভাবতঃই নির্জ্জন। বিশেষতঃ বিজয়ার দিন এখানে জনপ্রাণীর সমাগম নাই।

চারিদিকে ঝোপ ও ক্ষুদ্র জঙ্গল, মধ্যে বাজারখোলার প্রসিদ্ধ কালী-মন্দির। মন্দির দণ্ডিরহাটের বসুদিগের। মায়ের সেবার ও পূজার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। মন্দিরটী বড় নির্জ্জন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরটী একরূপ লুক্কায়িত। চাঁদের কিরণ মন্দিরের সারা গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ঝোপ জঙ্গলও চাঁদনীর আলোকে হাসিতেছে। ছোট ঝোপে চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে, তাহাতে যেন বিকৃতাকার প্রেতযোনি বলিয়া ভ্রম হইতেছে। মন্দিরপার্শ্বে অশ্বত্থবৃক্ষের পাতার ভিতর দিয়া চাঁদের কিরণ গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে; মৃদুপবনে বৃক্ষপত্র সর্‌সর্‌ শব্দ করিয়া নড়িতেছে; অনতিদূরে একটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছের ভিতর দিয়া পবনদেব সঞ্চারিত হইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সাঁই সাঁই শব্দ হইতেছে।

প্রকৃতির এই নীরবতার মাঝে কে ঐ দুটি মনুষ্যমূর্ত্তি মন্দির-সোপানে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্ন? দুইজনেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য; একজন উত্তেজিত হইয়া কি বর্ণনা করিতেছে, অপর তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করিতেছে। যে বলিতেছে সে অসাধারণ বলিষ্ঠ, তাহার শরীরের দৃঢ় মাংসপেশী দেখিলেই অনায়াসে তাহা অনুমান করা যায়; যে শুনিতেছে সে অতি সুপুরুষ, তাহার স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত।

পাঠক, চিনিলেন কি—কে ইহারা? ইহারাই আমাদের পূর্ব্বকথিত সেই চূড়ামণি ঠাকুর ও জীবন সর্দ্দার। বিজয়ার রাত্রে জীবন চূড়ামণি মহাশয়কে এইস্থানেই সাক্ষাতের কথা বলিয়া দিয়াছিল। চূড়ামণি মহাশয় বিসর্জ্জনের আমোদে কদাচিৎ কখনও যোগ দিতেন। তিনি এবৎসরও বিসর্জ্জনে যান নাই। জীবনের নিকট প্রতিশ্রুতি ইহার একটা প্রধান কারণ।

জীবন বলিতেছে, "ঠাকুর অপরাধ লইবেন না। আপনাকে আমি বারবার কষ্ট দিতেছি। কিন্তু বলিয়াছি ত আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমার জীবনের কাহিনীটুকু সবিস্তারে না শুনিলে, আপনাকে যে উপরোধ করিব, তাহা রক্ষা করিতে আপনি সম্মত হইবেন কেন?"

চূড়ামণি, "শুনিবার ইচ্ছা না থাকিলে এখানে আসিতাম না। তোমরা মায়ে পোয়ে নন্দগোপালের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে পলাইবার পর কি হইল? নন্দগোপাল কি আবার তোমাদের সন্ধান পাইল?"

জীবন, "সব বলিতেছি। এই স্থান নির্জ্জন, অতি পবিত্র, মায়ের সম্মুখে বসিয়া যাহা বলিব, তাহা সমস্তই সত্য। আমরা পলাইয়া গ্রামান্তরে গেলাম।" এই কথা বলিয়া জীবন একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; পরে আবার বলিতে লাগিল, "সেখানে তিন বৎসর কাটিল। মা আমার এই তিন বৎসর মনের আনন্দে কাটাইয়াছিলেন। আমরা দিন আনিতাম, দিন খাইতাম; গ্রামেই কাজ করিতাম, গ্রামান্তরে যাইতাম না। ঐ গ্রামেই তিন বৎসর আমাদের অজ্ঞাতবাস হইয়াছিল। আমাদের কোন অসুখই ছিল না। কেবল পিতৃপুরুষদিগের জন্মস্থান চির জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল, এই যা কষ্ট। মা আমার সে কষ্ট গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি যে জমিদারপুত্রের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ভগবানের কৃপায় গোপনে পুত্রকে পালন করিতেছেন, ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। ইহার অধিক আনন্দ ও সুখ কি আছে? জননী আমার অল্পেই সন্তুষ্ট ছিলেন; নীচজাতির ঘরে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-বিশ্বাসিনী ও ভগবানে আত্মনির্ভরশীলা রমণী অতি অল্পই আছে। কাজেই তিনি মনোসুখে ঐ তিন বৎসর কাল কাটাইলেন। আমি ঐ তিন বৎসর

জননার যেরূপ চিত্ত প্রফুল্ল দেখিয়াছি, এমন আর দেখিয়াছি কি না মনে হয় না। তাহার পরই ঝড় উঠিল।" জীবন নিস্তব্ধ হইল।

চূড়ামণি জিজ্ঞাসিলেন, "সে কি" ?

জীবন সে কথা যেন না শুনিয়াই বলিতে লাগিল, "এত সুখ সহিবে কেন ? পাপিষ্ঠ নন্দগোপাল এতদিন চুপ করিয়া ছিল না। যাহার উপর যখন তাহার ঝোঁক পড়িত, তাহাকে সে অল্পে ছাড়িত না। একটা সামান্য খেটেখেগো ছোট লোকের ঘরের বউ তাহাকে ফাঁকি দিবে ? এ অপমান সে সহ্য করিবে ? আমাদের পলায়নের পর সেও চরমুখে আমাদের সংবাদ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ তিন বৎসরের মধ্যে সে বড় কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। বিশেষতঃ সেই সময়ে সে একটা খুনে মোকদ্দমার আসামী ; বহু কষ্টে বহু অর্থ ব্যয়ে সে যাত্রা সে রক্ষা পাইল। ঠিক সেই সময়ে তাহার পিতার কাল হইল। মাথার উপর যাহা কিছু একটা আবরণ ছিল, সেটাও সরিয়া গেল। তখন সে অবাধে অত্যাচার চালাইল। গ্রামের লোকের ঘরে ঝি বউ রাখা দায় হইয়া উঠিল। হঠাৎ এক দিন মদের খেয়ালে ঝোঁক ধরিল, 'পোদের বউকে চাই।' কথাও যেই, কাজেও সেই। গ্রামে গ্রামে লোক ছুটিল। হাজার গোপনে থাকিলেও নিস্তার কোথায় ?"

"তা তো বটেই, তোমরা গ্রামান্তর ছাড়া ত' আর দেশান্তরে যাও নাই"— চূড়ামণি মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই জীবন বলিতে লাগিল, "এক দিন অন্ধকার রাত্রি, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছে, মানুষ ত' দূরের কথা, পশুপক্ষীর পর্য্যন্ত সাড়া শব্দ নাই, সব যেন চৈতন্যশূন্য। প্রকৃতি কিন্তু তখন ভয়ঙ্করী। ঘোররবে দিগদিগন্ত কাঁপাইয়া হুহুঙ্কারে ঝড় বহিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর মেঘগর্জ্জন, দামিনীবিকাশ ও অশনিপতন হইতেছে। আমরা মায়ে পোয়ে সেই ঘোর দুর্য্যোগে

আমাদের আশ্রয়দাতা আত্মীয়ের একখানি জীর্ণকুটীরে শুইয়াছিলাম। আমাদের আত্মীয় অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারই গোলায় আমরা খাটিয়া খাইতাম। ঝড়ের বেগে আমাদের চালাখানি উড়িয়া যাইবার মত হইতে লাগিল। হু হু রবে ঝড়ের ঝাপটা আমাদের পর্ণ-কুটীরের উপর দিয়া বহিল; চাল মড় মড় করিয়া ফাটিয়া পড়িল; চাল ফুঁড়িয়া ঘরের মধ্যে জল পড়িতে লাগিল, আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভয়ে জননীকে আমি আঁকড়িয়া ধরিলাম; জননীও আমায় বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন। হঠাৎ মনে হইল, ঘরে মানুষ ঢুকিয়াছে। সেই সময়ে ভাঙ্গা চালের ও ফাটা দেয়ালের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চমকাইল; বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্ট দেখিলাম, ঘরের মধ্যে মনুষ্যমূর্ত্তি,—একটী নয়, দুইটী নয়, একেবারে চারি পাঁচটী অপরিচিত ছদ্মবেশী মনুষ্যমূর্ত্তি; দেখিয়াই ত' আমরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। অমনি একজন আমাকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া সজোরে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল, আর একজন শাণিত ছুরিকা নিষ্কাশিত করিয়া জননীকে ভয় দেখাইয়া চুপ করিতে বলিল। কিন্তু তাহাদের এ আয়োজন অনর্থক, কেন না সেই বিষম দুর্য্যোগে প্রাণপণে চীৎকার করিলেই বা কে শুনিতে পাইত? জননী বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটিয়া আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিলেন; অন্ধকারে কিসে বাধা পাইয়া সশব্দে পড়িয়া গেলেন। ইতিমধ্যে একজন চকমকি ঠুকিয়া লণ্ঠন জ্বালিল। লণ্ঠনের আলোকে সবই দেখা যাইতে লাগিল; ঘর জলে জলময়; সেই জলের মাঝে দাঁড়াইয়া চারিটী ভীষণমূর্ত্তি মনুষ্য, চারি জনেরই হাতে লাঠি ও অস্ত্র। ঘরের এক কোণে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানে পঞ্চম ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল, ইহার ভদ্রবেশ ও ভদ্রলোকের মত আকৃতি। ঘরের মাঝে এক স্থানে আমার জননী পড়িয়া রহিয়াছেন; দারুণ আঘাতে তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে; কিন্তু তাহাতে

""ার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি তখনও বলিতেছেন, "ওগো আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও ; আমরা গরীব দুঃখী, আমাদের কিছুই নাই।" একজন তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, আর একজন তাঁহার চোখের সম্মুখে ছুরি ঘুরাইতেছে, তাঁহার নড়িবার ক্ষমতা নাই। কোণে যে ভদ্রবেশী লোকটী দাঁড়াইয়াছিল, সে এতক্ষণ কোনও কথা কহে নাই বা কোনও কার্য্যে যোগ দেয় নাই। এইবার সে আলোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম, সে আর কেহ নহে, পাপিষ্ঠ নন্দগোপাল।"

জীবন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার হস্ত তখন দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ, নয়ন পলকশূন্য, দৃষ্টি উৰ্দ্ধগামী। চূড়ামণি স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিলেন, তাঁহারও চমক ভাঙ্গিল, জীবনের মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পরে শুনিলেন জীবন বলিতেছে, "নন্দগোপাল নেশা করিয়া আসিয়াছিল ; সে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। জননী ছুটিয়া অন্যদিকে পলাইতে গেলেন ; কিন্তু তিনি পরবশে, নড়িতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিয়া কাটিয়া কত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাষণ্ড তাহাতে টলিল না। তাহার পাষাণ প্রাণ, ছোটলোক গরীবের দুঃখে তাহার প্রাণ কাঁদিবে কেন? সে নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া বুঝাইল, ছোট লোকের আবার ধৰ্ম্মজ্ঞান কি, তাহারা পয়সা পাইলেই সব করিতে পারে। জননীর সহিত তাহার কিছু বচসা হইল। আমি সব বুঝিলাম না। তবে ভাবে বুঝিলাম, নন্দগোপাল ক্রমেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ; জননীর অনুনয় বিনয়, তিরস্কার, ভয়প্রদর্শন—সবই ব্যর্থ হইল। তখন নন্দগোপাল হিংস্র পশু অপেক্ষাও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পর—তাহার পর নরাকারে সেই নরকের পিশাচ, পশুতুল্য অনুচরের সাহায্যে আপন সন্তানের চক্ষের সমক্ষে নিষ্পাপ জননীর সর্ব্বনাশ সাধন করিল।"

চূড়ামণি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান, তোমার বজ্র তখন কোথায় ছিল?"

কিন্তু কাহাকে বলিতেছেন, জীবন ত' সেখানে নাই, সে তখন সেই বটারণ্যের সঙ্কীর্ণ পথে হিংস্র জন্তুর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, দন্তের পেষণে তাহার ওষ্ঠ ছিন্ন হইয়া রুধির ঝরিতেছে, দৃঢ়মুষ্টিতে সে আপন কেশগুচ্ছ সবলে আকর্ষণ করিতেছে, সে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহারা। চূড়ামণি মহাশয় জীবনের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, তাহাকে বসিতে বলিলেন, নানা মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। জীবন স্থির হইয়া বসিয়াছে, চূড়ামণি মহাশয়ের কথা শুনিতেছে, কিন্তু সে যেন অন্য মনে কি ভাবিতেছে; যেন অতীতের মর্ম্মভেদী স্মৃতি তাহার মানসচক্ষের সমক্ষে কি এক উজ্জ্বল চিত্রপট ধরিয়াছে, আর সে যেন এক মনে তাহাই দেখিতেছে। চূড়ামণি মহাশয় জীবনের মানসিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "জীবন, এখন বুঝিলাম, কেন তুমি ডাকাত হইয়াছ। ওহো দারুণ অত্যাচার, দারুণ অত্যাচার! কিন্তু জীবন, তুমি ত' শিক্ষিত হইয়াছ, তুমি ত' জান সকলই কর্ম্মফল।"

জীবন যেন তখন সম্মুখে অন্যের অদৃশ্য কি এক দৃশ্য দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠিল, "এখনও যেন দেখিতেছি, সেই কাল রাত্রি, সেই দুর্য্যোগ, সেই পিশাচ নন্দগোপাল, সেই ভূমিশয্যায় সংজ্ঞাহীনা হতভাগিনী জননী, আর আমাদের বেষ্টন করিয়া পশুতুল্য সেই পাপের অনুচরবর্গ। এখনও দেখিতেছি, নন্দগোপাল তাহার পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া ঘরের মেঝের উপর টাকা ছড়াইয়া দিয়া কুটীর পরিত্যাগ করিল। এখনও দেখিতেছি, পাপের সহায় সেই নর-পশুরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। এখনও দেখিতেছি, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে সংজ্ঞাহীনা জননীকে

জড়াইয়া ধরিলাম, কিছুতেই কিন্তু মায়ের চেতনা হইল না। কতক্ষণ কাঁদিলাম জানিনা, কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

জীবন কিছুক্ষণ চুপ করিল। আবার বলিল, "যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখিলাম, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, ঝড়বৃষ্টি থামিয়াছে, সেই ছিন্নভিন্ন জলসিক্ত মৃৎপ্রাচীরের মধ্য দিয়া ঘরের মাঝে উষার ক্ষীণ আলোক দেখা দিতেছে; জননী আমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহার আকৃতি ভয়ঙ্কর, একরাত্রে এত পরিবর্ত্তন কখনও দেখি নাই। তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর, চক্ষু রক্তবর্ণ—তাহাতে জল নাই, পলকও নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন। আমি কত কি বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিলাম, কিন্তু তাঁহার মুখে কথা নাই, কোনও সাড়া শব্দ নাই—যেন তিনি কোথায় কোন দেশে চলিয়া গিয়াছেন। বহুক্ষণ এইরূপে কাটিল। তাহার পর হঠাৎ জননীর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। অমনি তিনি বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'মাগো!' তাহার পর আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন, কত কি আপন মনে বকিলেন। আমার একটী কথা এখনও স্মরণ আছে। মা একবার বলিলেন, 'ধর্ম্মপথে থাকিলে কি এই শাস্তি হয়!' "

জীবন নীরব হইল। পরে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসিল, "ঠাকুর সেই অবধি আমারও সর্ব্বক্ষণ এই প্রশ্ন মনে হয়,—ধর্ম্ম কি নাই? যে ধর্ম্মপথে সারা জীবন চলে, যে ভুলেও কখনও কাহারও অনিষ্ট করে না,—যে পাপের প্রলোভনে ভুলে না,—তাহারই কি দুর্গতি হয়?"

চূড়ামণি মহাশয় তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বেই ত' বলেছি, সকলই কর্ম্মফল। তুমি ত' হিন্দুর ছেলে, জীবন; লেখাপড়াও শিখিয়াছ। তুমি ত' জান, জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলে এ জন্মে কি হয়!"

জীবন বলিল, "ঠাকুর আমরা নীচজাতি, চোখের সামনে যা দেখি

তাতে মনে হয়, ধর্ম্মের বিচার নাই। যাক, আমার কথাটা শেষ করি। সেই কালরাত্রি প্রভাত হইল; জননীও আমার হাত ধরিয়া কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গ্রামের পথ তখনও নিস্তব্ধ; লোক জনের সাড়াশব্দ নাই; কদাচিৎ দুই একটা গৃহপালিত পশু পথের উপর চলিতেছে; গাছের ডালে উষার অস্পষ্ট আলোকে পাখীগুলা কলরব করিতেছে। আমরা মায়ে পোয়ে গ্রামের পথ বাহিয়া চলিয়াছি; সঙ্গে কিছুই লই নাই। পথের মাঝে এক পুষ্করিণীতে জননী শৌচস্নান সমাপন করিয়া আর্দ্রবস্ত্রেই চলিতে লাগিলেন। পথ ছাড়িয়া ক্রমে মাঠে পড়িলাম। দুরন্ত মাঠ, মাথার উপর সূর্য্যকিরণ, পদতলে মাঠের আলের বন্ধুর পথ,—ভ্রূক্ষেপ নাই; জননী একমনে পথ চলিয়াছেন, আমিও মায়ের সঙ্গে। মাঠে তখন কৃষাণকুল কাজে আসিতেছে, কোথাও বা কাজে লাগিয়াছে। মাঠ ছাড়িলাম, গ্রামান্তরে প্রবেশ করিলাম; গ্রামের পথে লোকজনের চলাচল আরম্ভ হইয়াছে; বেলাও বাড়িয়া উঠিয়াছে। জননী আমার হাত ধরিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন ও কাতরকণ্ঠে ভিক্ষা মাগিতেছেন, 'ওগো, তোমরা চাকর রাখিবে কি?' কেহ বা শুনিয়াও শোনে না, কেহ বা রাগিয়া উঠে, কেহ বা তাড়াইয়া দেয়, আর কেহ বা রাজী হইলেও জাতির কথা শুনিয়া মুখ বাঁকায়। কত ঘর ঘুরিলাম, ফল কোথাও হইল না। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, মা ভিক্ষা করিয়া আমায় মুড়ি মুড়কি খাওয়াইয়াছেন, নিজে কিন্তু জলস্পর্শও করেন নাই। সে গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে গেলাম, সেখানেও সমস্ত অপরাহ্ণ ঘুরিলাম, ফল কিছুই হইল না। রাত্রে এক গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হইয়া কাটাইয়া দিলাম। আমি আহার করিলাম, জননী জলস্পর্শও করিলেন না। পর দিন প্রত্যূষে অন্য গ্রামে গেলাম, অনেক বেলা ঘুরিলাম, ফল কিছুই হইল না। অবশেষে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা দণ্ডীরহাটে

প্রবেশ করিলাম। সেখানেও অনেকস্থলে হতাশ হইয়া শেষে সেই দেবতুল্য দর্পনারায়ণ বসুর সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এই নীচ দরিদ্রের সন্তানকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।"

চূড়া। তাহার পর, তাহার পর ?

জীবন বলিল, "তাহার পর আমি আশ্রয়ও পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে সব হারাইলাম। জগতে আমার বলিতে ছিলেন,—মা ; আর কেহ ছিল না। মা আমাকে সেই পরম দয়াবান জমিদার-পুত্রের আশ্রয়ে রাখিয়া আমায় ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বিদায় লইলেন। আমার মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি জানিতাম, যেখানেই থাকি, দুজনে একত্রে থাকিব। কিন্তু মা বুঝাইলেন, আপাততঃ দুই চারিদিন আমায় একাকী থাকিতে হইবে। তিনি ঐ সময়ে আমাদের ঘরে ফিরিয়া গিয়া আমাদের দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া আসিবেন। পরে ঐ দণ্ডীরহাটেই কোন গৃহস্থের বাটীতে কাজ জুটাইয়া লইবেন। মা বুঝাইলেন, কিন্তু মন বুঝিল না। কি একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন আমাদের সেই শেষ দেখা। আতঙ্কে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মাও কাঁদিলেন। শেষে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া অনেক কষ্টে বিদায় লইলেন। শেষ চুম্বন করিয়া আমায় দেখিতে দেখিতে চোখের জলে ভাসিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সে দৃশ্য এখনও আমার মনে জাগরূক আছে। হায়! সেই আমাদের শেষ বিদায়!"

জীবন আবার নীরব। তাহার মনে তখন কত কি ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা সেই অন্তর্য্যামীই জানেন। চূড়ামণি এক মনে শুনিতেছিলেন। শুনিলেন, জীবন আবার বলিতেছে, "মাও চলিয়া গেলেন, আমিও ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার আশ্রয়-দাতা হাত ধরিয়া উঠাইলেন, কত স্নেহ বচনে ভুলাইতে লাগিলেন,

শেষে অন্দরে লইয়া গিয়া তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর হাতে হাতে আমায় সঁপিয়া দিলেন। আহা কি রূপ! সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা! সদানন্দময়ী, সদাশান্তিময়ী, করুণাময়ী মা আমার, এমন মা কারও হয় কি? তাঁহারই আদরে, তাঁহারই যত্নে, আমি সময়ে মায়ের শোকও ভুলিয়াছিলাম।"

চূড়ামণি চমকিত হইয়া বলিলেন, "মায়ের শোক? কেন, তোমার মাকে কি আর জীবিতাবস্থায় দেখ নাই?"

জীবন, "না। সবই বলিতেছি শুনুন। জমিদার-ভবনে স্থান পাইলাম, আমার নূতন মায়ের স্নেহ সান্ত্বনা পাইলাম। প্রথম দুই দিন অনেকটা সুখে কাটিল। হায়! সে সুখ কতক্ষণের! তৃতীয় দিনে একজন লোক আসিল; শুনিলাম, সে থানার লোক। আমার প্রভুর সহিত তাহার অনেক কথাবার্ত্তার পর সে আমায় তাহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিল। আমি ভয়ে মনিবের দিকে চাহিলাম। তিনি স্নেহবচনে আশ্বাস দিয়া আমায় বলিলেন, "কোনও ভয় নাই, আমি সঙ্গে আমার নিজের লোক দিতেছি, কাজ সারিয়া সে আবার তোমায় আমার কাছে আনিবে!"

আমরা দণ্ডীরহাট হইতে যাত্রা করিলাম। আমি সব পথ চিনিতাম না। তবুও পথ যেন পুরাতন বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল যেন এই পথ দিয়া পূর্ব্বে মায়ের সঙ্গে দণ্ডীরহাটে আসিয়াছিলাম। পথ দেখিয়া মায়ের কথা মনে পড়িতে লাগিল, কি জানি কেন প্রাণের ভিতর কিরূপ করিয়া উঠিল, যেন মনে হইল, মা আমার চক্ষের সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সেই বিষাদমাখা কাতর নয়নে কি এক অব্যক্ত অস্ফুট যাতনার আভাষ! আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। থানার লোক কঠোর হাসি হাসিয়া বলিল, "কিরে ছোঁড়া, থাকিস থাকিস চমকে উঠিস্ কেন? তোর মৃগী রোগ আছে নাকি?" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। থানাদার ক্রুদ্ধ হইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, "এঃ

নেকাম দেখ, ঝাঁঝরা চোখে পাণি ঝরে আছেই যে! বলি, হ'ল কি? আঃ গেল, চল্ চল্।" আমি আরও কাঁদিয়া উঠিলাম। থানাদার তখন আমার পিঠে শপাৎ করিয়া ছড়ি বসাইয়া দিল। তখন আমার মনিববাটীর লোকটী থানাদারকে বাধা দিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ও বালক, মায়ের কাছছাড়া, সেইজন্যই কাঁদছে। ওকে আর মারবেন না।" থানাদার বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে একবার তাঁহার মুখপানে একবার আমার মুখপানে তাকাইয়া বলিল, "এঃ, তুমি যে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হলে দেখছি। যখন জমিদার-সরকারে কাজ কর, তখন আবার লোকদেখান ভিজে বিড়ালগিরি কেন?" জমিদারের লোক বলিলেন, "এমন কথা বলবেন না। সব জমিদারই কি সমান, না সকলেই নিষ্ঠুর?"

আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। মাঠের পর মাঠ, আলের পর আল পার হইয়া আমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, তথা হইতে অন্য গ্রামে উপস্থিত হইলাম। শেষে দেখিলাম, আমরা যে গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া দণ্ডীরহাটে গিয়াছিলাম সেই গ্রামে আসিয়াছি। ক্রমে আমরা আমাদের সেই জীর্ণ কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। সেখানে সেই মধ্যাহ্নের রৌদ্রে বিস্তর জনতা। কুটীরদ্বারে বেতের মোড়ার উপর একজন লোক বসিয়াছিল, তাহাকে ঘেরিয়া অনেকগুলা বরকন্দাজ বন্দুকহাতে দাঁড়াইয়াছিল। থানাদার আমাকে তাহার নিকট লইয়া গেল। তাহার দীর্ঘগুম্ফশ্মশ্রুশোভিত ভয়ঙ্কর মুখ দেখিয়াই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। শুনিলাম থানাদার বলিতেছে, "ধর্ম্মাবতার, এই সেই ছোকরা, ইহাকেই দাঁড়িরহাটের বোসেদের বাড়ী হইতে আনিয়াছি। এই ছোঁড়াই সব জানে।"

তখন সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ মূলার ন্যায় দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া

কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসিল, "হাঁরে ছোঁড়া, তুই সব জানিস? কি কি জানিস সব বল, নইলে তোকে, বুঝিছিস, আছাড় মারব।"

যেমন ভয়ঙ্কর কঠোর স্বর, তেমনি ভয়ঙ্কর কঠোর কথা। আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, কাঁদিয়া ফেলিলাম। অমনি থানাদার বিকট চীৎকার করিয়া কহিল, "কিরে শালা, তোর চোখ যে ঝরেই আছে। হুজুর, এ ছোঁড়া ভারি তেঁদোড়, কোন কথা হলেই কিছু বলবার ভয়ে আগে থেকেই কান্না সুরু করে। ওর সব নেকাম।" বেত্রাসনে আসীন পুরুষ বলিল, "তাইত, এ যে আহ্লাদে নাড়ুগোপাল দেখছি। বল, শালা, বল, কি জানিস বল।"

আমার মনিব-কর্ম্মচারী এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন; এই কথাবার্ত্তার পর তিনি অগ্রসর হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "দারোগা-সাহেব, আপনিই মালিক, আপনি রাখলেও রাখতে পারেন, মারলেও মারতে পারেন। ওটা ত' একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু, ওকে শাসন করতে কতক্ষণ! কিন্তু বোধ হয় নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে আপনি ওকে বলতে ভুলে গেছেন যে ওকে কি বলতে হবে। না, দারোগাসাহেব?"

দারোগা। তাইতো, তা বটেইত, ওকে ত' বলা হয় নাই কি বলতে হবে। তুমি বড় মনে করে দিয়েছ। তুমি কে হে বাপু?

কর্ম্মচারী আত্মপরিচয় দিলেন। দারোগাসাহেব পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিতে আজ্ঞা করিলেন।

দারোগা-সাহেব অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁরে, তোর নাম কি, বল্‌ত?"

আমি। আজ্ঞে, আমার নাম জীবন।

দারোগা। কি বল্লি, জীবন? উঃ নামটা ত' খুব লম্বা চওড়া। বল দেখি, এই ঘরে তুই এর আগে থাকতিস কি না।

আমি। আজ্ঞে হাঁ, থাকতাম।

দারোগা। আর কেউ থাকতো কি ?

আমি। আমার মা থাকতেন।

দারোগা। বেশ, এখান থেকে দাঁড়িরহাটে গেলি কেন ?

আমি। (নিরুত্তর)।

দারোগা। বল না, কেন গিয়েছিলি ?

আমি। চাকুরীর চেষ্টায়।

দারোগা। কেন, এখানে ত তোরা চাকুরী কত্তিস।

আমি। (নিরুত্তর)।

দারোগা। চুপ করে রইলি যে ? বল্ না কেন এখান থেকে চলে গিয়েছিলি ; তোদের মনিব তোদের উপর কোন অত্যাচার করেছিল ?

আমি। না, তিনি আমাদের খুব দয়া করতেন।

দারোগা। তবে গেলি কেন ?

আমি। (নিরুত্তর)।

দারোগা। (ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) আঃ গেলো ! সুখেই যদি ছিলি, তবে গেলি কেন ? আর কেউ অত্যাচার করেছিল ?

আমি। হাঁ।

দারোগা। কে সে ?

আমি। জমিদার নন্দগোপাল।

যদি সেই স্থলে সেই মুহূর্ত্তে কোনও ভীষণ হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় জনতার মাঝে এতটা চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত না। নন্দগোপাল—অত্যাচার—এই দুটা কথা শুনিয়াই সকলে চমকিয়া উঠিল। জনতার মাঝে গুজগুজ ফুসফুস—নানা কানাকানি চলিল।

দারোগা সাহেব ক্ষণকালের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে

চমক ভাঙ্গিলে বলিলেন, "খবরদার, ঝুটা বাত বলিস না। ভিড় তফাৎ।"

অমনি বরকন্দাজের পাল হল্লা করিয়া জনতা সরাইতে লাগিল। কাহারও বুকে, কাহারও পৃষ্ঠে, বন্দুকের গুতা পড়িল। ভিড় গেল, রহিলাম কেবল আমি, পুলীশের লোক ও আমার মনিব কর্ম্মচারী। তাঁহাকেও পুলাশ তাড়াইয়া দিতেছিল, কেবল দারোগার ইঙ্গিতে সেই কার্য্য হইতে নিরস্ত হইল।

দারোগাসাহেব তখন কঠোরস্বরে বলিলেন, "জমিদার তোদের উপর কি অত্যাচার করিয়াছিল ?"

আমি। "সে কথা আমি বলতে পারবো না,"—বলিয়াই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

দারোগা। পাজী হারামজাদ, নেকাম রাখ্; জমিদারের নামে বদ্‌নাম দিচ্ছিস, কিন্তু কি হয়েছে বলছিস্ না। তোর বেলকুল ঝুট। ছোকরা বয়সে এত ফন্দী ? যাক, ও সব ঝুট শুনতে চাই না। এখন তোরা কবে পালিয়েছিলি, আর কবে ফিরে এলি, বল।

আমি। আমরা চারি দিন আগে চলে গিয়েছিলাম। আমি আর ফিরে আসিনি। মা যে দিন গিয়েছিলেন, তার পর দিনই ফিরে এসেছিলেন।

দারোগা। ফিরে কোথায় এসেছিল, আর কি জন্যে এসেছিল ?

আমি। তা আমি জানি না।

দারোগা। ঝুট্। কথা ভাঁড়ালে তোর হাড় চামড়া তফাৎ করব। ঠিক বল, তোর মার সঙ্গে কি কথা ঠিক করেছিলি ?

আমি। দোহাই, দারোগা সাহেব, আমি সত্য কথাই বলেছি।

দারোগা। হুঁ, তোকে কি করিয়া বলাইতে হইবে তাহা জানি। এখনও বল, না হলে—

এই সময়ে আমার মনিব-কর্ম্মচারী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "দারোগা সাহেব, বিদায়ের পূর্ব্বে ওর মায়ের সঙ্গে ওর কি কথা হয়েছিল, তাহাই জিজ্ঞাসা করুন না কেন, তা হলেই সব জানতে পারবেন ”

দারোগা। হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, বিদায়ের পূর্ব্বে কি কথা হয়েছিল বল। তোর মা কি তোকে বলেছিল যে, সে খেতে পায় না, তাই তোকে ওখানে রেখে তার পর নিজে মরবে ?

আমি। "না, হুজুর, মা মরবেন এমন কথা কখনও বলেন নাই।" বলিয়াই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

দারোগা। রাখ্ তোর কান্না এখন রাখ্। আগে জবাব দে। তোর মার মনে খুব কষ্ট হয়েছিল, মনের দুঃখে তাই ছুটে বেরিয়েছিল ?

আমি। আজ্ঞে হা।

দারোগা। ঠিক, ঠিক, এইবার ছোঁড়া ধাতে এসেছে। তোর কাছ থেকে চলে আসবার সময় খুব কেঁদেছিল ?

আমি। আজ্ঞে, হাঁ।

দারোগা। বহুৎ খুব। আচ্ছা, যেন ছাড়তে চায় না, এই রকম করেছিল।

আমি। আজ্ঞে হাঁ।

দারোগা। কেয়া তাজ্জব ! এতক্ষণ তবে চালাকি কচ্ছিলি কেন ? যেন আর দেখা হবে না, এই শেষ দেখা—এমনি ভাব দেখিয়েছিল ?

আমি। আজ্ঞে, হাঁ।

দারোগা। বস্, হো গিয়া। তুই খুব হুসিয়ার লৌণ্ডা। এখন তোর মাকে দেখলে চিন্তে পারবি ?

আমি সাগ্রহে দারোগা সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম,

"কৈ, কোথায় মা? কুঁড়ের ভিতর আছেন কি?" বলিয়া তথায় প্রবেশ করিতে গেলাম।

দারোগা বাধা দিয়া বলিলেন, "আরে সবুর, সব হচ্ছে। কেতা-মাফিক কাম হোনা চাহি।" এই বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিলেন। অমনি দুই জন বরকন্দাজ—আমার দুই হাত ধরিয়া চলিল, দারোগা আগে আগে যাইতে লাগিলেন।

আমরা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ওহোহো, কি দেখিলাম! আজিও আমার চক্ষের সমক্ষে সে দৃশ্য জাজ্বল্যমান। দেখিলাম, শূন্যে আমার স্নেহময়ী জননীর দেহ বিলম্বিত; কিন্তু সে দেহে প্রাণ নাই, সে চক্ষে দৃষ্টি নাই। অমনি প্রহরীদের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার লম্বিত পদযুগলে মুখ লুকাইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। শুনিলাম দারোগা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কেমন, এই তোর মা?"

আমি কি উত্তর দিয়াছিলাম স্মরণ নাই—কেন না তখন আমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। কতক্ষণ সে অবস্থায় ছিলাম মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম আমি আমার কৃষাণ মনিবের গৃহে। গৃহস্থ-পরিবারেরা আমায় ঘেরিয়া বসিয়া আছে, কেহ বাতাস করিতেছে, কেহ মুখে জল দিতেছে, কেহ বা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। আমি উঠিয়াই বলিলাম, "কৈ, মা কৈ; আমি মার কাছে যাইব।" বলিয়াই ছুটিয়া ঘরের বাহিরে যাইতেছিলাম, সকলে আমায় ধরিয়া ফেলিল। গৃহস্বামী আমার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক করিয়া স্নেহবচনে আমায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইলেন, পুলিশের লোকে আমার জননীর মৃতদেহ দাহ করিতে আদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখনই দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইবে।

বহুকষ্টে শ্মশানে যাইবার লোক জুটিল। জমিদারের কর্ম্মচারী বাহিরে বসিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে ও অর্থে আমার স্বজাতীয়েরা জননীর মৃতদেহের সৎকার করিতে সম্মত হইল। যথারীতি সৎকার-কার্য্য সম্পন্ন হইল; আমি মুখ-অগ্নি করিলাম। সেই শেষ কাজের পূর্ব্বে আমি জননীর পদধূলি মস্তকে লইয়া প্রাণ ভরিয়া একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। চক্ষের জলে ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সব শেষ হইল; আমরা হরিবোল দিয়া সন্ধ্যার পরে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

জমিদার-কর্ম্মচারী পূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছিলেন। তিনি সৎকারের সমস্ত ব্যয়ই দিয়া গিয়াছিলেন। যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া যান, পরদিন আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়া দিবেন। আমি সেই রাত্রি সেইখানে রহিলাম। গৃহস্বামী বলিলেন, আমাদের পলায়নের পর তিনি আমাদের বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু ফল পান নাই। পূর্ব্বদিন রাত্রে হঠাৎ আমার জননী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন ও তাঁহাকে দণ্ডীরহাটে আমার চাকুরীর সংবাদ দেন, পরে তাঁহার কুটীরে রাত্রিযাপন করিতে যান। মধ্যরাত্রে গৃহস্বামী কোনও কার্য্যোপলক্ষে ঘরের বাহিরে যান ও কুটীরমধ্যে মানুষের অস্ফুট কাতরোক্তি শুনিতে পান। তাঁহার অত্যন্ত ভয় হয়। তিনি পুত্রদিগকে ডাকিয়া আলোক লইয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে দেখিলেন,—সর্ব্বনাশ! আমার জননী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেই রাত্রেই নারাণপুরের থানাদারের নিকট সংবাদ দেন। ঘটনাক্রমে বসিরহাটের দারোগা রহমৎ খাঁ সাহেব ঐ রাত্রে কোন কার্য্যোপলক্ষে নারাণপুরের থানায় উপস্থিত ছিলেন, আত্মহত্যার কথা শুনিয়াই তিনি শেষরাত্রে সদলবলে এখানে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি গৃহস্বামীকে বাঁধিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, টাকার লোভে গৃহস্বামী

লোকজনের সাহায্যে আমার জননীকে গলায় ফাঁসি দিয়া মারিয়াছে। গৃহস্বামী বুঝাইলেন যে, আমার জননী অতি দরিদ্র. তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত। কিন্তু যুক্তি তর্ক খাটিল না। শেষে তিনি বলিলেন যে, আমি আসিয়া যদি তাঁহার বিপক্ষে কিছু বলি, তাহা হইলে যে শাস্তি হয় দিবেন। তাঁহার মুখে দণ্ডীরহাটে আমার অবস্থানের কথা শুনিয়া দারোগাসাহেব থানাদারকে আমায় আনিতে পাঠান। দারোগা ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু গৃহস্বামীকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। তাহার পর আমি আসিয়া নন্দগোপালের নাম করিতেই সংক্ষেপে কার্য্য সারিয়া তিনি লাস জ্বালাইবার হুকুম দিলেন। দারোগা সাহেবের সহিত জমিদার নন্দগোপালের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই তাঁহার জন্য তাঁহার এত মাথাব্যথা।

সমস্ত শুনিলাম। রাত্রিতে নিদ্রা হইল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইলাম। গভীর রাত্রে শুনিলাম, মা যেন সেই কুটীরের চারিধারে করুণস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। শরীর লোমাঞ্চিত হইল, ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। যাহা হউক, এইরূপে রাত্রি কাটিল। এইখানে আমার জীবন নাটকের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

পরদিন প্রাতে আমার মনিব-প্রেরিত লোকের সঙ্গে দণ্ডীরহাটে পৌঁছিলাম। আমার জীবনের আর এক অঙ্ক আরম্ভ হইল। অন্নদাতা দর্পনারায়ণের যত্নে, মা অন্নপূর্ণার আদরে, আমি ক্রমে শোক ভুলিতে লাগিলাম। আমি শিশুকালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়িতে যাইতাম। সেখানে আমার বর্ণপরিচয় হইয়াছিল। দণ্ডীরহাটে আসিয়া জমিদারপৌত্রকে স্কন্ধে লইয়া গ্রাম্য পাঠশালে লইয়া যাইতাম ও সেইখানে বসিয়া থাকিতাম। গুরুমহাশয় ছেলেদের পড়াইতেন, আমিও সেই সব পাঠ অভ্যস্ত করিতাম। আমার স্মরণশক্তি অতি প্রখর ছিল। যাহা একবার শুনিতাম তাহা আর ভুলিতাম না।

এই জন্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাঠশালের পাঠ আয়ত্ত করিয়া লইলাম। আমার লেখাপড়ায় মন আর আমার তীক্ষ্ণ ধীশক্তির কথা গুরুমহাশয়ের মুখে অবগত হইয়া আমার অন্নদাতা আমায় যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। আমি তাঁহারই নিকট শেষে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা—এমন কি সংস্কৃত ও ফার্সী পর্য্যন্তও শিখি। এইরূপে আদরে যত্নে দণ্ডীরহাটে আমার বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইল।

"কিন্তু যাহাই করি, জীবনে তিনটী বিষয় সর্ব্বক্ষণ আমার মনে জাগরূক থাকিত। একটী আমার জননীর শোচনীয় পরিণাম, একটী পিশাচ নন্দগোপালের দারুণ অত্যাচার, আর একটী আমার অন্নদাতা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্ন। সর্ব্বাপেক্ষা নন্দগোপালের অত্যাচারের কথাটা বুকের মাঝে আগুনের মত রি রি করিয়া জ্বলিত। বয়সের সঙ্গে প্রতিহিংসাবৃত্তি মনের মাঝে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি সহায়সম্পত্তিহীন অনাথ বালক, কি করিয়া অত্যাচারীর পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিব, কি করিয়া জননীর অপমানের, নির্য্যাতনের, প্রতিশোধ লইব—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহারা হইতাম, আমার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিত। ভগবান আমার সে সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন।

"আমি বাল্যকাল হইতেই হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলাম। আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় বালকেও আমাকে বলে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। আমার যখন ১৪ বৎসর বয়স, তখন হইতে আমি কুস্তিগিরি, লাঠিয়ালী, সড়কিয়ালী শিখিতে লাগিলাম। শিখিবার সুযোগও জুটিল। জমিদার-গৃহে একজন বিখ্যাত পাইক ছিল।"

চূড়ামণি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কে, হরিপুলো? সে তো আর নাই।"

জীবন, "আজ্ঞে হাঁ, সেই আমার প্রথম অস্ত্রশিক্ষার গুরু। আমি দুই বৎসরের মধ্যেই তাহার সর্ব্বপ্রধান সাকরেদ হইয়া উঠিলাম। সকলে আমার সাহস ও বীর্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ আমার অন্নদাতা পিতা দর্পনারায়ণের। তিনি নিজে অসুরতুল্য বলিষ্ঠ ও সুচতুর খেলোয়াড় ছিলেন, কাজেই আমার বীর্য্য দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইত। তিনিও প্রত্যহ প্রাতে হরিপুলোর সহিত কুস্তি, লাঠি, সড়কি, তরবারি প্রভৃতি সকল খেলাই খেলিতেন; অথচ তখন তিনি নিজে জমিদার। আমি দণ্ডীরহাটে যাইবার দুই বৎসর পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তাঁহার জননী তৎপূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছিলেন।

"ষোল বৎসর বয়সে আমি হরিপুলোর সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিলাম। তখন আরও শিখিবার জন্য মন ব্যস্ত হইল। কিরূপে বলিষ্ঠ হইয়া শত্রু দমন করিব—তখন মনের বাসনা কেবল এইরূপ।

"বাসনা পুরিতেও বিলম্ব হইল না। সেই সময়ে মধ্যমপুরে হরিবেদে নামে একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল ডাকাত ও যাদুকর ছিল। সে লাঠির উপর ভর দিয়া দুই ঘণ্টায় বিশ ক্রোশ পথ অনায়াসে যাতায়াত করিত। একবার কোনও গ্রামে ডাকাতি করিতে গিয়া হরিবেদে লাঠির উপর ভর দিয়া গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপ টপকাইয়া বাটীর ভিতর লাফাইয়া পড়ে। তিরন্দাজী ও তরবারি-চালনায় এবং ভোজবিদ্যায় ও হরবোলা বিদ্যায় সে বিশেষ পারদর্শী ছিল। আমি ষোল বৎসর বয়স হইতে লুকাইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম। দণ্ডীরহাট হইতে মধ্যমপুর মাত্র এক ক্রোশ পথ। কাজেই অতি প্রত্যুষে অথবা ঠিক সন্ধ্যার সময় আমি সকলের অলক্ষ্যে গিয়া হরিবেদের কাছে লাঠিবাজী, তিরন্দাজী ও তরবারিচালনা শিক্ষা করিতাম।

তাঁহার নিকটেও আমি দুই বৎসর শিক্ষা করি। সেই অত্যল্প কালের মধ্যেই আমি গুরুকে ছাপাইয়া উঠিলাম। হরিবেদের একটী ছোট খাট ডাকাতের দল ছিল। হঠাৎ হরিবেদে বিসূচিকারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন তাহার দলের লোকেরা একবাক্যে আমায় গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল। আমি বয়সে সকলের কনিষ্ঠ, অথচ আমার বাহু-বলের গুণে আমিই দলপতি মনোনীত হইলাম, কিন্তু মনঃক্ষুণ্ণ কেহই হইল না। আমার দক্ষিণ-হস্ত ঐ ভুতো বাগ্দী হরিবেদের একজন প্রধান চেলা ছিল।"

চূড়ামণি, "কে? যে আমায় এখানে নিয়ে এলো?"

জীবন, "আজ্ঞে হাঁ। এতদিন যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম, ভগবান তাহাই ঘটাইয়া দিলেন। দল পাইলাম, দল ক্রমে পুষ্টও হইতে লাগিল, আর দণ্ডীরহাটে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রথমে দলের লোকের মন যোগাইয়া না চলিলে দলের লোক মানিবে কেন? তাহাদের কাছে সর্ব্বদা না থাকিলে, তাহাদের দিনরাত্রি না চালাইলে, তাহারা বশে থাকিবে কেন? কাজেই বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে আমার সুখের সংসার ত্যাগ করিলাম। দণ্ডীরহাট ত্যাগ করিবার সময়ে প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কি করিব, ভবিতব্যতা কে খণ্ডাইবে? আমার কর্ত্তব্য যে তাহা হইলে সম্পন্ন হয় না। জননীর ঋণ অত্যল্পও শুধিতে যদি না পারিলাম, তাহা হইলে জীবন ধারণে ফল কি? জননীর প্রেতাত্মার করুণ ক্রন্দন মনে পড়িতে লাগিল, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, পলাইয়া আসিলাম। তাহার পর দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আড্ডার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ফলে ঘুঘুড়ির জঙ্গলই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যোপযোগী বলিয়া ধার্য্য হইল। আড্ডা বসিল। ডাকাতিও চলিল।"

জীবন ক্ষণেকের জন্য নিস্তব্ধ হইল। চূড়ামণি বলিলেন, "বুঝিয়াছি,

কেন তুমি এই ঘৃণিত দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ। দারুণ অত্যাচার! দারুণ অত্যাচার!"

জীবন সেই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "হাঁ, দারুণ অত্যাচার। অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে কয়েকবার প্রতিকারের আশায় বসিরহাটের দারোগার কাছে গিয়াছিলাম। সে প্রতিবারই আমায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। বুঝিলাম, এ জগতে ধনবান অত্যাচারী জমিদারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান সহায়হীন দুঃখী-সন্তানের কেহ নাই।'

চূড়ামণি বলিলেন, "তোমার মনিব দর্পনারায়ণকে জানাও নাই কেন? জানাইলে প্রতিকারের চেষ্টাও ত হইত!"

জীবন, "না, জানাই নাই। তার কারণও ছিল। কেন তাঁহাকে —আমার সেই অন্নদাতাকে—বিপদে ফেলিব? তিনি আমার যথেষ্ট করিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, নন্দগোপাল ধনবান জমিদার, তাহার সহায় দারোগা, কাজেই সে ব্যাপারে মাথা দিতে গেলে আমার মনিবের নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবে।"

চূড়ামণি সাশ্চর্য্যে বলিলেন, "বুঝিয়াছি, জীবন। ধন্য তোমার কৃতজ্ঞতা! ধন্য তোমার মনুষ্যত্ব!"

জীবন কথা চাপা দিয়া বলিল, "আর আমার মনিব মাঝে মাঝে সরকারের কাজে ঢাকা চট্টগ্রামে যাইতেন, কত দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার মন থাকিলেও তাঁহার অবসর জুটিত কোথা?"

চূড়ামণি বলিলেন, "যাউক সে কথা। ডাকাতি করিতে প্রথম তোমার প্রাণ কাঁপে নাই কি?"

জীবন, "না, একটুও না।"

চূড়ামণি, "সেকি?"

জীবন, "হাঁ, ঠিক কথা। প্রথম ডাকাতি করি—আমার চিরশত্রু নন্দগোপালের বাটীতে।"

চূড়ামণি। ওঃ! তাই বল। শত্রুর ঘরে ডাকাতি—আবার যে সে শত্রু নয়—এতে প্রাণ না কাঁপিতেও পারে।

জীবন। আজ্ঞে হাঁ, অন্যস্থানে প্রথম ডাকাতি করিতে গেলে প্রাণ হয়ত কাঁপিত। প্রাণ কাঁপাও ত আশ্চর্য্য নয়। তবে ডাকাতি যথেষ্ট করিয়াছি বটে, কিন্তু ধনবান অত্যাচারী জমিদার মহাজনের ঘরে, অন্যত্র নহে।

চূড়ামণি। তা জানি, জীবন। সকলেই জানে, তুমি গরীবের মা বাপ, নিরাশ্রয়ের সহায়, ব্রাহ্মণের বন্ধু, উপকারীর গোলাম। কিন্তু ডাকাতি তবুও ডাকাতি ত' বটে। ডাকাতি যে রকমেই হউক, আর যার উপরেই হউক, ডাকাতি নিন্দনীয়, সমাজের অনিষ্টকর।

জীবন। ঠাকুর, সব ত' শুনিয়াছ।, যাউক, নন্দগোপালের বাটীতে ডাকাতি করিতে গিয়া প্রতিশোধ লইতে পারিলাম না। নন্দগোপাল ঠিক সেই রাত্রে কোথায় নষ্টামী করিতে গিয়াছিল। তাহার ধনরত্ন সমস্তই লুণ্ঠিত, আসবাবপত্র ভগ্ন, চূর্ণবিচূর্ণ, এমন কি গৃহও স্থানে স্থানে ভগ্ন হইল। আসিবার কালে তাহার গৃহে আমরা আগুন ধরাইয়া দিয়া আসিলাম। ধূ ধূ আগুন জ্বলিল, আমিও সানন্দে তাহা দেখিতে লাগিলাম। নন্দগোপাল পরদিন রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে গৃহ-শূন্য ও অর্থ-শূন্য হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নানা মামলা মোকদ্দমায়, নিজের অত্যাচারের খোরাকে, সে জমিদারী-শূন্যও হইয়াছিল। রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সে দৌলতিয়ার ঘরে প্রবেশ করিল। দৌলতিয়ার জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেখানে দুজনে নানা বচসা হইল। শেষে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে দৌলতিয়াকে হত্যা করিয়া তাহার অলঙ্কারাদি লইয়া সেই রাত্রে

দেশত্যাগ করিল। আমার প্রতিশোধ লওয়া হইল না, তবে কতকটা মনের আগুন নিভিল। আর ডাকাতি হইতে ফিরিবার যো নাই, কেননা তখন আমি সমাজ-ছাড়া, পুলিশেরও লক্ষ্য। সেই অবধি ডাকাতিই পেশা। নন্দগোপালের বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু পরিশ্রম বৃথা হইল। দিন যায়, দিন আসে, কিন্তু আশা ছাড়িলাম না। ভগবান এতদিন পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।

জীবনের স্বর গম্ভীর হইয়া আসিল। চূড়ামণি চমকিত হইলেন। জীবন বলিতে লাগিল, "আজ আট নয় বৎসর পরে আমি সেই পিশাচের সন্ধান পাইয়াছি। তবে এখনও নিশ্চিত জানিতে পারি নাই যে, সেই নন্দগোপাল কিনা। সেই উদ্দেশ্যে আমার গুপ্তচরও নিযুক্ত করিয়াছি। স্বয়ং বিধাতা সহায় হইলেও এইবার আর তার নিস্তার নাই।" বলিতে বলিতে জীবনের চক্ষু ধক ধক জ্বলিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতে লাগিল, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল।

হঠাৎ চূড়ামণির ডাকে জীবনের চমক ভাঙ্গিল। তাহার পর আরও ক্ষণকাল অতি গোপনে উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিল। শেষে জীবন বলিল, "আপনার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। দেখিবেন সকল দিক বজায় রাখিয়া কাজ করিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করিবেন। কখনও কোনও আবশ্যক হইলে দীননাথের নিকট জানাইবেন, আমি সংবাদ পাইব। এখন শ্রীচরণের ধূলা দিন, বিদায় হই। ঐ শুনুন বিসর্জ্জনের বিষাদ-বাজনা বাজিতেছে, যাহারা নিরঞ্জনে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিতেছে। আর আমার হেথায় থাকা উচিত নয়, আমি চলিলাম। আবার সময় হইলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।" এই বলিয়া জীবন চূড়ামণি মহাশয়ের পদধূলি লইয়া লাঠির ভরে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সোণাকুড়ের বাঙ্গোড়।

দণ্ডীরহাটের বসুপল্লীর পশ্চাতে বিস্তীর্ণ এক খাল, ইচ্ছামতী নদীরই শাখা। বহুপূর্ব্বে ইচ্ছামতী এই স্থান দিয়াই প্রবাহিত হইত। তাহার পর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে নদীর গতি ক্রোশাধিক দূরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং তদবধি এই খালটী ঐ স্থানে প্রবাহিত হইতেছে। খালটি পশ্চিমে বসিরহাটের নিকট ইচ্ছামতী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া নানা গ্রামের মধ্য দিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্ব দিকে পাথরঘাটা নামক স্থানের নিকট ইচ্ছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খালে এদেশী বড় বড় কিস্তী, পূর্ব্ব দেশের ভড়, এমন কি চট্টগ্রামের ছোট দেশী জাহাজ পর্য্যন্তও বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত করিত। বহুপূর্ব্বে যখন ইচ্ছামতী এই স্থানে প্রবাহিত হইত, তখন ইহার উপর দিয়া বড় বড় বাণিজ্যতরীরও গতায়াত ছিল। এই খালে ঘটনাক্রমে একখানি জাহাজের মাস্তল জলমগ্ন অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। সে জাহাজ প্রকাণ্ড, তাহার খালে যাতায়াতের সম্ভাবনা ছিল না। তীরস্থিত গ্রামবাসীদিগের উদ্যোগে নিমজ্জিত জাহাজের ভগ্নাবশেষ উত্তোলিত হয়। সেই ভাঙ্গা জাহাজে নানাপ্রকার দেশী বিদেশী পণ্যদ্রব্য, এমন কি স্বর্ণ পর্য্যন্তও পাওয়া যায়। তদবধি ঐ খালের নাম হইল "সোণাকুড়ের বাঙ্গোড়", আর খালের উভয় পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডের নাম হইল "সোণাকুড়ের বিল"।

বাঙ্গোড়ের জল গ্রামবাসীদের প্রাণ। জল যেমন সুমিষ্ট, সুপেয়, মৎস্যও তেমনি প্রচুর ও সুস্বাদু। গ্রামে পুষ্করিণী থাকিলেও পল্লীবাসীরা বাঙ্গোড়ের জলই ব্যবহার করিত। প্রত্যেক সমৃদ্ধ পল্লিবাসীর খিড়কীর পুষ্করিণী বাঙ্গোড়ের সহিত যুক্ত ছিল। বাঙ্গোড়ের জলে স্নান, বাঙ্গোড়ের জলপান, বাঙ্গোড়ে বাণিজ্য, বাঙ্গোড়ে বাচখেলা, বাঙ্গোড়ে ঠাকুর-

বিসর্জ্জন, বাঙ্গোড়ের তীরে শবদাহ—বাঙ্গোড় গ্রামবাসীদিগের তীর্থসদৃশ, বাঙ্গোড় গ্রামবাসীদিগের জননীর মত।

এই বাঙ্গোড়ের তীরে বড় বড় নৌকার কারখানা,—বড় বড় বাজার, ধান্য গুড় ইত্যাদির গঞ্জ ও ব্যবসায়ের স্থান। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে নদীবক্ষে আনীত শ্রীহট্টের চূণ, কমলালেবু ও শীতলপাটী; ঢাকার বস্ত্র, বাসন ও গহনা; বুধহাটার মাদুর, বেনা ও উলু; সুন্দরবনের গোলপাতা, সুন্দরির খুঁটী, ব্যাঘ্র বা হরিণচর্ম্ম, ব্যাঘ্রনখ জীহ্বা চর্ব্বি, মধু ও মোম—প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য ঐ সকল গঞ্জে ও বাজারে বিক্রয় হইত। আবার এতদঞ্চল হইতে গুড়, দড়ী, মুগ, কলাই, লঙ্কা, ছোলা, ধান্য ইত্যাদি দ্রব্য পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশে নৌকাযোগে চালান হইত। এই আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে দেশের বিস্তর লোক জীবিকা অর্জ্জন করিত। এই জন্যও বাঙ্গোড় গ্রামবাসীর প্রাণ ছিল।

বাঙ্গোড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। উভয় তটে বিশাল বিরাট তিন্তিড়ী আমলকী ঝাউ দেবদারুদ্রুম, মধ্যে কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল-স্বাদু-শীতল জল। মাঝে মাঝে বাঁধাঘাট। সেই সকল বাঁধাঘাটের উভয় পার্শ্বে বকুলবৃক্ষ। জলের উপর ছোট বড় কতপ্রকার জলযান, কোন খানা চলিতেছে, কোন খানা বা নৌকাঘাটায় বাঁধা আছে। জেলেরা ডিঙ্গি করিয়া মাছ ধরিতেছে, তাহারা দুই পায়ে ও এক হাতে বোটে বাহিতেছে, অপর হস্তে কলিকায় তামাকু খাইতেছে। আরোহীরা নৌকা বাজারে বাঁধিতেছে, আবার কোনওখানা বা খুলিয়া যাইতেছে। মহাজনী নৌকার কোনখানার মাল খালাস হইতেছে, কোনওখানা বা মাল বোঝাই লইয়া যাত্রা করিতেছে। নৌকাঘাটায় নৌকা মেরামত হইতেছে, তক্তা চেরা হইতেছে, কামারদোকানে পেরেক আঁধারে ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, নৌকায় গাবের নির্য্যাস মাখান হইতেছে। সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খলে কার্য্য চলিতেছে।

বাঙ্গোড়ের তীরে বসুদিগের খিড়কীর বাগান হইতে নদীতটপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ শ্যামল তৃণক্ষেত্র, অতি সুন্দর, অতি নয়নারাম। বসুদিগের গৃহগুলি বাগানের আম নারিকেল পনস খর্জ্জুর ইত্যাদি বৃক্ষের পত্রমধ্যে একরূপ লুক্কায়িত। বাগানগুলি রাঙ্গচিতার বেড়ায় ঘেরা।

এখনও ভোর হয় নাই। বাগানের উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় সবেমাত্র রাঙ্গা উষা নামিয়াছে, এই সবে দুটী একটী পক্ষী কুলায় হইতে বাহির হইয়াছে। এই মাত্র দুই একটা পাখী ডাকিয়াছে। গোশালায় গাভী বৎস এখনও ঘুমাইতেছে। কচিৎ দুই একটা পালিত কুকুর নিদ্রাভঙ্গে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। রাখালেরা ষষ্ঠীতলার গোচারণের মাঠে গাভী লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসন্তান শয্যা ত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম লইতেছে। গাছের পাতায় পাতায়, মাঠের শ্যামল তৃণে, নিশার শিশির ঝলমল করিতেছে, এখনও শুষ্ক হয় নাই। শীতল প্রভাত সমীরণ ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে, সেই মৃদুপবনে জলে মৃদুতরঙ্গভঙ্গ হইতেছে, গাছের ফুল টুপ টুপ ঝরিয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মণেরা স্নানান্তে স্তোত্রগীত গাহিয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন।

এমনই সময়ে বাঙ্গোড়-তটে বিস্তীর্ণ শ্যামল তৃণক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সমবেত হইতেছেন। প্রথমে যুবক ও প্রৌঢ়েরা আসিলেন; পরে সূর্য্য-কিরণ যতই গাছের মাথা হইতে নামিয়া আসিতে লাগিল, ততই অল্পবয়স্ক কিশোর ও বালকদিগের সমাগম হইতে লাগিল। সকলে একে একে বাঙ্গোড়ের বাঁধাঘাটে বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মল্লবেশ ধারণ করিয়া তটভূমির মল্লক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। তৃণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে মল্লক্ষেত্র। তখনকার কালে প্রাতে মল্লক্ষেত্রে এইরূপ ব্যায়ামের নিয়ম ছিল। কেহ অল্প, কেহ অধিক, স্ব স্ব ক্ষমতামত ব্যায়াম করিতেছে। তাহার পর সকলে গায়ে মাটী মাখিয়া ঘর্ম্ম

অপলোপ করিতেছে ; ঘাড়ে, গর্দ্দানায়, বুকে, পিঠে, হাতে, পায়ে প্রচুর মাটী মাখিয়া সকলে বাঙ্গোড়ের জলে অবগাহন করিয়া সাঁতার দিয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হইতেছে। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্য-কিরণ চারি দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, অচেতন জগৎ জাগিয়া উঠিয়া সূর্য্যালোকে হাসিতেছে।

বাঙ্গোড়ের জলে গ্রামবাসীদিগের জলক্রীড়া হইতেছে, এমন সময় বালকমহলে একটা তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। "গেল গেল," "ডুবে গেল" ইত্যাদি রব উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে নিরঞ্জন সাঁতার দিয়া ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; সে শুনিল, নরহরির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভজহরি অধিক জলে তলাইয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন ভজহরির জলনিমজ্জনের স্থানটা জানিয়া লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডুব দিল। সকলেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে নৌকা আসিয়া পড়িল। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ একটী বালককে বলিলেন, "তুই দৌড়িয়া যা, দাদাঠাকুরকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।" বালক তীরবেগে ছুটিল ; পথে সে দেখিল, ধোনা তিওরের সঙ্গে দাদাঠাকুর বাঙ্গোড়ের দিকেই আসিতেছেন ; ধোনার স্কন্ধে জাল, হাতে কলিকা ; দাদাঠাকুরের কাঁধে গামছা ; তৎক্ষণাৎ বালক তাঁহাদিগকে লইয়া ঘাটে ফিরিল। তখন বাঙ্গোড় তোলপাড় করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু ভজহরি কিম্বা নিরঞ্জনের দেখা নাই। কেবল একবারমাত্র নিরঞ্জনকে কেহ কেহ দূরে মাথা তুলিতে দেখিয়াছিল। দর্পনারায়ণের মুখমণ্ডল গম্ভীর। তিনি প্রথমে সকলের সঙ্গে ডুব দিয়া চারিদিকে খুঁজিতেছিলেন ; পরে একখানি নৌকায় চড়িয়া চারিদিক অন্বেষণ করিতেছেন। ধোনা তিওরকে দেখিয়াই বলিলেন, "একখানা বেড়া-জাল, শীঘ্র যাও।" ধোনা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। ধোনাও অদৃশ্য হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বহুদূরে একখানি নৌকার কাছে একটা পদার্থ

ভাসিয়া উঠিল। সকলে "ঐ যে, ঐ যে" বলিয়া সেইদিকে সাঁতার দিয়া ধাবমান হইল। অনেক নৌকাও সেইদিকে ছুটিল। যে নৌকার কাছে পদার্থ ভাসিল, তাহাতেই দর্পনারায়ণ বসিয়াছিলেন; পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তিনি জলে ঝম্পপ্রদান করিলেন ও অসীম দৈহিক শক্তিবলে নিমজ্জিত পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া জলের উপর উত্তোলন করিলেন। নৌকার লোকে তাঁহার নিকট হইতে উহা নৌকায় তুলিয়া লইল। তখন সকলে সভয়ে দেখিলেন, নিরঞ্জনের প্রাণহীন নগ্নদেহ ভজহরির মৃতদেহকে আকর্ষণ করিয়া আছে। ফুল্ল-কুসুমতুল্য নিরঞ্জনের কমনীয় মুখমণ্ডল তখনও যেন হাসিতেছে, আর ভজহরির কচি মুখখানি যেন ঘুমন্ত শিশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। একি হইল? ভগবান হাসিতে হাসিতে একি বিপদ ঘটাইলেন? নিরঞ্জন যে গ্রামের সকলের বুকের পঞ্জর! ভজহরি যে সকলের লোচনানন্দ! সকলে অস্থির হইয়া হা-হুতাশ করিতেছে; দর্পনারায়ণ কিন্তু গম্ভীর, স্থির, প্রশান্ত। তিনি নৌকা তীরে লাগাইতে বলিলেন। নৌকা ঘাটে লাগিল। দর্পনারায়ণের আদেশে ঘাটের শানের উপর দুইটী দেহ স্থাপিত করা হইল। দাদাঠাকুর উভয়ের পার্শ্বে বসিয়া পরীক্ষা করিয়া হর্ষোৎফুল্লাননে বলিলেন, "ভয় কি? প্রাণ আছে।" এই কথা বলিয়াই তিনি নানা প্রক্রিয়ার সাহায্যে মৃতপ্রায় নিরঞ্জন ও ভজহরির শ্বাস বহাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও শুষ্ক বস্ত্র, কম্বল, কাষ্ঠ, অগ্নি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। দুই তিনজন লোক বায়ুবেগে তাঁহার আজ্ঞাপালনে ছুটিল। আশ্চর্য্য সে প্রক্রিয়া। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দাদাঠাকুর নিরঞ্জন ও ভজহরিকে বমন করাইয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাহাদিগের গাত্রের জল মুছাইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া কম্বলের

উপর শায়িত করিলেন ও চারি পাঁচ জনে মিলিয়া গাত্রে অগ্নির উত্তাপ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ঠিক সেই সময়ে নিরঞ্জন অস্ফুট-স্বরে কি বলিবার চেষ্টা করিল; সকলে অমনি উল্লাসে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। ক্রমে মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগের দুটী একটী করিয়া কথা ফুটিতে লাগিল। অনেকে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ কেহ অত্যধিক আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন জলে ডোবার কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, বহুলোক বাঁধা-ঘাটে সমবেত হইয়াছে। বেলাও তখন প্রায় একপ্রহর। সকলে হরিধ্বনি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কিন্তু দর্পনারায়ণ নির্ব্বিকার; পূর্ব্বে তিনি যেমন পুত্রের মৃত্যু জানিয়াও শোকে মুহ্যমান হন নাই, এখনও তেমনি চক্ষের সমক্ষে পুত্রের পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তি অবলোকন করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন না। তিনি সকলকে আদ্র-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বলিতেছেন। বালকদিগকে হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "কই, তোরা ত' এখনও আদা ছোলা, মাখন মিছরি খেলিনি, তবে এড়াভাত খাবি কখন! যা যা, দৌড়ে যা।" আবার যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "বাবা সকল, ভিজে কাপড়ে থেকো না, কাপড় ছাড় গিয়ে। যাও, আদা ছোলা, কাঁচা দুধ খেয়ে, আবার নারিকেল মুড়ী ত' খেতে হবে। এত বেলা অবধি ভিজে কাপড়ে রয়েছো, আবার দ্বিপ্রহরে স্নান ত' করবেই, তা হলে শরীর অসুস্থ হবে যে।" তখনকার কালে বাঙ্গালী দিনে তিন চারিবার স্নান করিত। যাহারা আদ্র-বস্ত্রে ছিল তাহারা গৃহাভিমুখে গেল, কিন্তু বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আসিল। দর্পনারায়ণ ও অন্যান্য দুই একজন কর্ত্তা-ব্যক্তির জন্য বাটী হইতে বস্ত্র আসিল।

দাদাঠাকুর এতক্ষণ একমনে জলমগ্ন প্রাণী দুটীর সেবা করিতে-

ছিলেন। যখন দেখিলেন যে, উভয়ের বেশ চেতনা হইয়াছে, তখন তাঁহার মুখে কথা ফুটিল। এক গাল হাসিয়া সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কেরামতিটা একবার দেখলি ত'? এসব বিদ্যে কি আর ধান দিয়ে শেখা যায়? বিদ্যের কদর বুঝত শিবুদা। বাবা, ঢাকায় বহুকাল সাক্‌রেদী করে তবে বিদ্যে পেয়েছি।"

তখন সকলেরই মন প্রফুল্ল। দাদাঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। একজন জিজ্ঞাসিল, "দাদাঠাকুরের ওস্তাদটী ছিল কে?"

দাদাঠাকুর। কেন? সরকারী ডুবুরী মিঞা। ছোট কর্ত্তা ত' জানেন। আমি কি মিথ্যা বলছি।

দর্পনারায়ণ তাঁহার কথায় সায় দিলেন, "হাঁ হাঁ ঢাকার কালেক্টর সাহেব জল পুলিশের জন্য একজন পাকা ডুবুরী নিযুক্ত করেন। তাহারা নবাবী আমল হইতে বংশানুক্রমে ডুবুরীর কাজ করিয়া আসিতেছিল। দাদাঠাকুর তাকে মৌতাতে বশ করে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন।"

আবার একটা উচ্চহাস্যের রোল উঠিল। দাদাঠাকুর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ঐ ত' বাবা, তামাসা কর। কিন্তু আজ ত' হাতে হাতে প্রমাণ পেলে।"

দর্পনারায়ণ অপ্রতিভ হইয়া দাদাঠাকুরের দুটী হাত ধরিয়া মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, "তা আর একবার বল্‌তে। দাদা, আজ আপনি আমার যা উপকার করেছেন, তার ঋণ জন্মজন্মান্তরেও শুধতে পারবো না।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল, অত বড় প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ দেহ বৃক্ষ-পত্রের মত কাঁপিয়া উঠিল।

দাদাঠাকুর। "ঐ ত', ঐ ত', ওসব ঋণ টিনের কথা তুলে আমায়

ত্যক্ত করো কেন, বাবা? হাঁ হে, নিয়েন কি কেবল তোমার ছেলে, আমাদের কেউ নয়?"

দাদাঠাকুরের চোখে জল। সকলেরই চোখ ছল ছল করিতেছে। দাদাঠাকুর দেখিলেন যে ব্যাপার গুরু গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইতেছে। অমনি তিনি কথা উলটাইয়া লইয়া বলিলেন, "ওরে, এটা কি আর জলে ডোবা? এক হাটু জল, তাতে আবার ডোবাই বা কি, আর ভাসাই বা কি? হ'ত বুড়িগঙ্গা, তা হলে বরং একটা ডোবার মত ডোবা হত।" কথার ভঙ্গীতে এমন কি নিরঞ্জন পর্য্যন্তও অস্ফুট হাসিয়া উঠিল। দাদাঠাকুরের অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনিও অমনি ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া সরস গল্প যুড়িয়া দিলেন।

সেঁক তাপও চলিতে লাগিল, দাদঠাকুরও বলিতে লাগিলেন, "হাসিস্ কি? মনে কচ্ছিস, বুড়া বামনা মিছে কথা বলছে! বুড়িগঙ্গা পদ্মা ত' আর দেখলিনে, সে দেখিছি আমি আর ছোট কর্ত্তা। ওরে বাপরে, তার কাছে ইচ্ছামতী না এই বাঙ্গোড়! বাপ তার কুলকিনারা নেই। এক একটা ঢেউ কি—যেন বালিস! সেই দুরন্ত নদীতে, বুঝলি কি না, সেই বুড়িগঙ্গাতে আমরা সাঁতার কাটতুম, ডুব ফঁুড়তুম, ছিলুম যেন জলের পোকা। একদিন ত', বুঝলি কি না, একদিন শিবুদাতে আর আমাতে বুড়িগঙ্গায় ডুব ফঁুড়ছি—সে কি ডুব ফোঁড়া রে বাবা! ডুব আর ফুরোয় না। এমন সময় যেই একবার শিবুদা ডুব ফঁুড়ে জল হতে মাথা তুলেছে, অমনি তার মাথাটা, বুঝলি কি না, তার মাথাটা একটা মড়ার দুই উরুর মাঝে গেথে গেল।"

সকলে শিহরিয়া উঠিল। দাদাঠাকুর দেখিলেন জমিয়াছে; তখন আবার আরম্ভ করিলেন, "মড়াটা জলে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার পা দুটা পদ্মাসনের ন্যায় হইয়া জুড়িয়া গিয়াছে। শিবুদাও মাথা

তুলিয়াছেন, অমনি মড়ার দুই উরুর গর্ত্তে তাঁহার মাথাটী আটক পাড়িল।”

একজন হাসিয়া বলিল, “শিবুদাও ডুব ফুঁড়িয়া উঠিয়াছেন, মড়াটাও অমনি সেখানে জুটিল? মড়াটা বুঝি পূর্ব্বে টের পাইয়াছিল!”

দাদাঠাকুর মনে মনে বিষম চটিয়াছিলেন, কিছু বলিব না বলিব না করিয়াও বলিয়া ফেলিলেন, “মড়া টের পেয়েছিল কি না, তা আমি কি জিজ্ঞাসা কত্তে গিয়েছিলুম? মড়িঘাটার মড়িপোড়ার ব্যবসাদারদের কাছে জেনে আয় গিয়ে। যত হয়েছে চেঙ্গড়া আপদ!”

সকলে বলিল, “যাক যাক, যেতে দাও দাদাঠাকুর, ওর কথা ধরতে আছে, ওটা একটা পাগল।”

দাদাঠাকুর। দেখ দেখি! ঘটনা যা ঘটেছিল, তাই বলে যাচ্ছি। এর ভিতর আবার ঠিকুজী কুলুজি কেন রে বাপু! গলা আটকে গিয়ে শিবুদা একেবারে কাবু। ছাড়াবার বিস্তর চেষ্টা পেলে, নাকানি চোবানিই সার হল। ওঃ কি বীভৎস দৃশ্য! পচা মড়ার বিকট দুর্গন্ধ, মাংসের উপর ক্রিমি কীট বেড়াচ্ছে, আর চারিদিকে হাঙ্গর কুমিরে মাংস খাচ্চে। এদিকে শিবুদার নড়ন চড়ন শক্তি রহিত; নিজের হাত পা দেহ সবই খোলা, কিন্তু গলা আটকে সবই পরবশে। চ'খের সাম্‌নে পচা মাংসে ক্রিমি কীট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ সেদিক হইতে চোখ ফিরাইবার সামর্থ্য নাই! কি যন্ত্রণা! তিনি তখন চীৎকার করে লোক ডাকছেন। আবার আশ্চর্য্য এই, কাছে একখানি নৌকাও নাই যে, দাদাকে সেই যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করে। আমি আর থাকতে পারলুম্ না, অমনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। এক ডুব ফুঁড়ে শিবুদার পা ধরে টান মেরে

বহুকষ্টে খালাস করলুম। ওঃ দাদার গায়ে কি গন্ধ! সারা বুড়ি-গঙ্গার জলে সে গন্ধ নষ্ট হবে বোলে মনে হল না। শিবুদা ত' ডেঙ্গায় উঠেই বমি করে ভাসিয়ে দিলেন। অনেকটা জল খেয়েছিলেন, উঠে গেল। তারপর তিন চার দিন গোলাপ জলে স্নান করে গায়ের গন্ধ মরে। শিবুদার মুখে তিন দিন আর কোন আহার রুচ্‌ল না। বাপ! সে সব কথা স্মরণ করলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

দাদাঠাকুরের অলক্ষ্যে গা টেপাটিপি হাসি তামাসা চলিতেছিল; সে দিকে কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি তখন নিরঞ্জন ও ভজহরির দেহে নানারূপ প্রক্রিয়া করিতেছেন। নিরঞ্জন উঠিয়া বসিয়াছে, ভজহরি শুইয়া আছে। দর্পনারায়ণ তাহাদিগকে গৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; যাইবার সময় স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভাই সব, আজ বড় আনন্দের দিন। চল, আমরা আমাদের জাগ্রত দেবতা শ্যামা মায়ের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করি। আজ সারা রাত তুলসীতলায় হরি-সঙ্কীর্ত্তন ও হরির-লুট। গ্রামে গ্রামে সংবাদ দেও, সকলে প্রেমানন্দে মাতিবে ও ভগবানের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইবে। দীন দুঃখী কাহাকেও বলিতে ভুলিও না। চল যাই।"

সকলে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, দাদাঠাকুর স্নানে গেলেন।

নিশীথে দুর্ঘটনা।

সাহেব কোন কথা শুনিলেন না। একমাত্র সহিসকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পর বারাসত যাত্রা করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে উঠিবার সময় বলিয়া গেলেন,—"সাবধানে থাকিও, কবে ফিরিব ঠিক নাই। দেওয়ানজী আমার হইয়া কাজ চালাইবে। পূজার পরেই হাড় ও চামড়ার দাদন দিতে আরম্ভ করিবে।"

দেওয়ান অগ্রসর হইয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া সেলাম করিয়া কহিলেন, "হুজুর সাবধানে যাবেন। সেই পাঁচনলা বন্দুকটা সঙ্গে নিয়েছেন ত' ?"

সাহেব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "কেন ডর হইয়াছে রে বাবা ? ডাকু কি হামাকে খাইয়া ফেলিবে ? হামার বোড়ো আনন্দ হয় যডি পঠে ডাকুর সহিট সাক্ষাট হয়। Come Leo, follow me."

এই কথা বলিয়া সাহেব প্রফুল্লমনে অশ্বারোহণ করিলেন। কুঠীর যাবতীয় কর্ম্মচারী ও লোক-লস্কর ফটকের ভিতরে ও বাহিরে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা সসম্ভ্রমে সাহেবকে সেলাম করিতে লাগিল। এ সেলাম আন্তরিক। সাহেব তাহাদের অন্নদাতা প্রভু, এ হিসাবে তাহারা সাহেবকে সেলাম করে নাই ; সাহেব দয়ালু সদাশয় পুরুষ, তাই তাহাদের সেলাম আন্তরিক। সাহেব প্রতি-নমস্কার করিতে করিতে, শিস্ দিতে দিতে, ফটকের বাহিরে আসিলেন, লিও তাঁহার পার্শ্বদেশে ছুটিয়া চলিল, পশ্চাতে সহিস ; হাসি হাসি মুখে সাহেব বিদায় লইলেন।

বৃদ্ধ সাধন মুচি সাহেবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সাহেব অদৃশ্য হইলে নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে বলিল, "দোই মা অক্ষে কালী, মনিবিরি যেন মুস্কিলি না পড়তি হয়। এ্যান্‌ধারা মনিব কি আর হতি হয় ?"

শীতল মুচি পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, "তা আর বলতি ?

মোর ছাওয়ালডারে ওলাবিবি ধরেলো,—মুই কেঁদে গে পলাম; সাহেব নষুদির বাকস নিয়ে নিজি গে নষুধ খাওয়ালে, সারা রাদডে জাগলে, তবে ছাওয়াল বেঁচেল।"

সাধন হঠাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "হাদে উই লাও কেত্তিকে! কোথা কতিছিস, সারা শরীলডে ছ্যাপ পড়তিছে, ক্যানধারা মানুষ তুই?"

শীতল ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"কমনেকার পোচা মের্দ্দঙ্গ তুই, সপন দেখ্‌তিছিস নাকি? ছ্যাপ পড়তিছে, না গু পড়তিছে!"

সাধন আর একটু সুর চড়াইল, "গাল না দিলি কোথা কতি পারিস নে? ছোট ভেগে কিনা।"

শীতল, "ছোট ভেগে তোর মামু, মুই ছোট ভেগে হতি গেলাম কেন?"

সাধন, "হাদে, চুপ মার দিনি, পোচা ঢাকের তোলা!"

শীতল, "হা তোর সুমুন্দিরুনি কেথায় চেরাগ জ্বালি! কোথা কতি জানিস্‌নে, চণ্ডীমণ্ডপের বাড়ের খুটী!"

ক্রমশঃ দুই এক কথা হইতে হইতে কলহ পাকিয়া উঠিল, শেষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। তখন দেওয়ানজী মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিয়া বলিলেন, "পাজী বেটারা, সাহেব যেতে না যেতেই কামড়াকামড়ি সুরু করে দিলি। যা, সব ঘরে যা। ঝগড়া যে করবে, তার ছুটী বন্ধ।" দেওয়ানজীর কড়া হুকুম শুনিয়া সকলে সুড়সুড় করিয়া আস্তানায় ঢুকিল।

দেওয়ানজী সেরেস্তায় যাইতেছেন, এমন সময়ে খানাদার সুসজ্জিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দেওয়ান তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কি সাহেব, এখনও যাওনি?"

খানাদার বলিল, "ওসব ঠিক্ কর্ দিয়া। চারো বরকন্দাজকো

ভেজ দিয়া। ওহ্ লোক সব সাহাবকে পিছে পিছে চুপ চুপকে চলে যায়েগা। আউর মেয়ভি আবি যাউঙ্গা; লেকিন মেরে পর মেহেরবানি—

দেওয়ান। বাঃ, আবার কি মেহেরবানি? খোরাকীর দ্বিগুণ দিলাম, পূজার এনাম দিলাম—

থানাদার। হাঁ হাঁ, ও বাত ত' ঠিক হায়। লেকিন ওহ্ সব সাহাবকো পাস মিলা। আপকা মেহেরবানি কুছ্ হোনা চাহিয়ে।

দেওয়ান। হাঃ, আমি আর কি দিব, আমি আর কি দিব! আমি ত' দিচ্ছিই—

থানাদার। হাঁ হাঁ, আপকা পরওয়ারিস তো হ্যায়ই। লেকিন আজ রাতকেওয়াস্তে কুছ মেহেরবানি হোনা চাহিয়ে। রাতভর সাহাবকা পাহারা পর রহেনা হোগা। দেখিয়ে, দত্তজী, আপকা ভি তো কাম থোড়া বহৎ হামসে নিকলতা হায়। উস্ রোজ আপ মধ্যম-পুরকে আহীরী ছোকরীকে লেকর বহৎ মুসিবৎমে পড়েথে। ময় আপ্কো জান—

দেওয়ান। আরে চুপ্ চুপ্। এখন কি চাই বল।

থানাদার। আপকা মেহেরবানি। আপ খুসিসে পাঁচ আদমীকে সরাব পিলা দিজিয়ে।

দেওয়ান। আচ্ছা, এই নিয়ে যাও। কিন্তু এখানে যে বরকন্দা-জেরা থাকবে, তাদের খুব হুসিয়ার হয়ে পাহারা দিতে বলে যেও। কি জান, সাহেব নেই।

থানাদার। হাঁ হাঁ ও সব ঠিক হোগা। আপকো পৌছানেকে ওয়াস্তে হামেসা যো দো বরকন্দাজ যাঁতেহে, সো যায়েঙ্গে।

এই কথা বলিয়া সেলাম করিয়া থানাদার চলিয়া গেল। দেওয়ানজী সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেরেস্তার কাজ করিলেন। মুহুরীরা

মনে মনে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। কাজ শেষ করিয়া কাগজ-পত্র গুছাইয়া সেরেস্তা বন্ধ করিয়া চারিদিক একবার ঘুরিয়া বেড়াইয়া জমাদারকে ফটকে চাবি বন্ধ করিতে বলিয়া দেওয়ানজী দীনু পেয়াদা ও দুইজন সশস্ত্র বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে চলিলেন। মুহুরীরা লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া স্বস্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

দীনুর হাতে লণ্ঠন; দীনু আগে, মাঝে কালীচরণ, ও কিছুদূরে পশ্চাতে বরকন্দাজদ্বয়। বরকন্দাজেরা পরস্পর মাতৃভাষায় কথা কহিতে কহিতে যাইতেছে, মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছে, আর পরস্পর তামাসা করিতেছে, অন্য বিষয়ে তাহাদের খেয়ালই নাই। যাইতে যাইতে দীনু বলিল, "দেওয়ান মশাই, থানাদার কোন্ আহিরী ছুকরীর কথা বল্‌তেছিল, মধ্যমপুরের হারুঘোষের মেয়ে?"

দেওয়ান। হাঁ হাঁ, সেই বটে। ছুঁড়িটা বড় ভুগিয়েছে।

দীনু। হাঁ শুনেছিলাম বটে, গোয়ালার পাল মশাইকে বাঁকপেটা করেছিল। থানাদার আপনাকে বাঁচায়।

দেওয়ান। আরে না না, ওসব কথা শোন কেন? কথা রটলে আর রক্ষে আছে, তিল তাল হয়ে দাঁড়ায়। বলে অমন কত হাতী গেল তল, তা গাধা বলেন কত জল! ওত' একটা গয়লা ছুঁড়ি!

দীনু। তবে কি হয়েছিল?

দেওয়ান। হবে আর কি? মধ্যমপুরে আমি লোকের চেষ্টায় ও দাদন দিতে যাই, তোমার তখন জ্বর। সেখানে ঐ ছুঁড়ীটাকে দেখি। দেখেই খেলোয়াড় বলে মনে হয়। আর আমায় ত জান, আমার চুল পাকলো ঐ কাজে।

দীনু। আজ্ঞে, তা বটেইত, তা বটেইত। ও সব কাজে আপনার খুব কেরামতি এসে।

দেওয়ান কোন উত্তর দিলেন না, মনে মনে ভাবিতেছিলেন "হাঁ

তা এসে বটে। কেবল কেরামতি দেখাতে পাচ্ছি না তোমার মেয়েটার কাছে। ঐ খানেই হার মেনেছি। আহা, তার। ছুঁড়ী কি সুন্দর! যেন পরী! ছোটলোকের ঘরে এমন হয়? গোবরে যেন শালুক ফুটেছে।”

দীনু জিজ্ঞাসিল,—“কি ভাবছেন মশাই?”

দেওয়ান। আমি, না, কই কিছু ভাবিনি ত'। বলছিলাম কি, সেই গয়লা ছুঁড়ীটার কথা। ছুঁড়ীটা খেলোয়াড়, এক কথায় বশে এলো। আর রূপচাঁদে কি না হয়? টাকাতেই সংসার চলছে।

দীনু। টাকাই সব, সে কথা আর বলতে। ও ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও যাই বলুন, সব চলে টাকায়।

দেওয়ান। সেদিন গেছে দীনু, টাকায় ছিনিমিনি খেলেছি।

দীনু। (সাগ্রহে) আজ্ঞে হাঁ, ওকথা অনেকবার বলেছেন। আপনি অনেকবার আপনার ছেলেবেলার সুখের কথা বলবেন বলবেন করেও বলেন নি। আচ্ছা, ছেলেবেলায় কি আপনার খুব টাকা ছিল? আপনার বাপ মা খুব জমিদার ছিল?

দেওয়ানজী সন্দিগ্ধচিত্তে একবার দীনুর পানে তাকাইলেন, পরক্ষণেই বলিলেন, “সে অনেক কথা দীনু। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার কাছে বলতে কি, তবে আবশ্যক হয় না বলেই বলিনি।”

দীনু। তা ত' বটেই, তা ত' বটেই।

দেওয়ান। যাক, ছুঁড়ীটাকে হাত করলাম বটে, কিন্তু তার একটা ছোট ভাই সব মাটী করলে। সেই গুওটাই লোকজানাজানি চলাচলিটা করে দিলে। তারপর টাকায় সব মুখ বন্ধ করে দিলাম।

দীনু এতক্ষণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। কথা শেষ হইলে বলিল, “আমি সবে দুদিন জ্বরে পড়েছি, এরি মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল?

জ্বরের আগে ত দেখেছিলাম, ঐ সোলাদানার নিতি কাওরাণী কুঠীতে যাওয়া আসা কচ্ছে।”

দেওয়ানজী যেন কথাটা শুনিয়াও শুনেন নাই। বরকন্দাজদিগকে হাঁকিয়া বলিলেন, “এই ষষ্ঠীতলার মাঠে পড়েছি। রাস্তা ধরে ফকির-হাট হয়ে গেলে অনেক ঘুর হবে। এই মাঠের আল দিয়ে যাই, দীনুর বাড়ী হয়ে ঘরে যাব।”

একজন বরকন্দাজ বুঝাইল, ধানের ক্ষেতের মাঝে সঙ্কীর্ণ আইল, রাত্রে সর্পভয়, কাজেই তাহারা ওপথে যাইবে না।

দেওয়ানজী রাস্তা হইতে মাঠে নামিতে নামিতে বলিলেন, “তবে তোমরা রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাও; আমরা দুজনে”—মুখের কথা মুখেই রহিল, দেওয়ানজী মহাশয় হঠাৎ কিসে বাধা পাইয়া পড়িয়া গেলেন। দীনু লণ্ঠন রাখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল; তাহার হাঁকডাকে বরকন্দাজেরাও ফিরিয়া আসিল। ইতিপূর্ব্বেই জ্যোৎস্নার আলোকে দীনু অস্পষ্টভাবে দেখিয়াছিল যে, পথের নীচে মাঠের আইলের উপর কি একটা পদার্থ পড়িয়া আছে। লণ্ঠনের আলোকে সকলে সভয়ে দেখিল পদার্থ মনুষ্যমূর্ত্তি! সে উপুড় হইয়া আছে, তাহার মস্তক ও পদদ্বয় খানায় ঝুলিতেছে, শরীরের মধ্যস্থল আইলের উপর লুটাইতেছে; বসন রক্তসিক্ত, প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ!

তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়াই বরকন্দাজেরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “আরে, এহি ত থানাদার!” সকলেই দেখিল, বাস্তবিক থানাদার বটে!

“কি সর্ব্বনাশ! সাহেবের ত কোন বিপদ ঘটে নি?”—দেওয়ানজীর একথা আর কাহারও কাণে গেল না, সকলে তখন থানাদারকে লইয়া ব্যস্ত। তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; বুকে হাত দিয়া দেখা হইয়াছে,—নিশ্বাস পড়িতেছে, প্রাণ আছে। উচ্চস্থান

হইতে পড়িয়া গেলে যেরূপ চোট লাগে, সেইরূপ দুই একটা সামান্য আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাব হইয়াছে, অন্য আঘাতের চিহ্নমাত্র নাই। মুখে সরাবের বিকট দুর্গন্ধ, মনে হইতেছে যেন তাহার সমস্ত অঙ্গ হইতেই সুরার তীব্র গন্ধ নির্গত হইতেছে। তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া পথে শায়িত করিয়া চক্ষে মুখে নয়ানজুলীর জল দেওয়া হইতে লাগিল।

মাঠের অপর পার্শ্বে দণ্ডীরহাটগ্রামপ্রান্তে দীননাথের গৃহ। দীননাথ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "তারা, তারা"; সাড়া পাইল না, বলিল, "না, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এত রাতে কে আর জাগিয়া আছে?"

তখন থানাদারকে দীনুর বাটীতে বহিয়া লইয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বরকন্দাজেরা বাধ্য হইয়া সেই ধানক্ষেতের আইলের উপর দিয়া সাপের মুখে পা পড়িবার ভয় থাকিলেও থানাদারের দেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল, দীনুও তাহাদের সাহায্য করিল, দেওয়ানজী অগ্রে আলোক লইয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন।

চোখে মুখে জল ও গাত্রবস্ত্র খুলিয়া দেওয়াতে থানাদারের অল্প চেতনা হইয়াছিল। সে চাহিয়াই ক্ষীণজড়িতস্বরে বলিল, "মেরে ঘোড়ে?"

দেওয়ানজী তাহার মুখের উপর আলো ফেলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "থানাদার, সাহেবের কি হ'ল? ডাকাতে মেরে নেয়নি ত?"

সাহেবের নাম শুনিয়াই থানাদারের নেশা কাটিয়া গেল। সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "সাহাব? হাঁ হাঁ, নাহি নাহি। দেওয়ান সাহাব, কসুর মাফ্ কি জিয়ে,"—বলিয়া সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেওয়ান আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, কি হয়েছিল সব বল। সাহেব কোথায় গেল?"

থানাদারের তখন বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে বরকন্দাজদিগের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কথায় বুঝা গেল, সে সন্ধ্যা

হইতেই নেশা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সাহেব চলিয়া গেলে পর সে আরও নেশা করিয়া সঙ্গে সরাব লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করে। মনে ভাবিয়াছিল, সাহেব ধীরে ধীরে যাইবেন, সে দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া ফকিরহাটে তাঁহাকে ধরিবে। পূর্ব্বে সে চারিজন বরকন্দাজ পাঠাইয়াছিল, সাহেবের যাত্রার পূর্ব্বেই তাহাদের সোলাদানা পরিত্যাগ করিয়া ফকিরহাটের বাজারে আসিয়া আশ্রয় লইবার কথা ছিল। পথে অশ্বারোহণে আসিতে আসিতে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার নেশা আরও চড়িয়া যায়; সে আরও সরাব পান করিতে থাকে। এমন সময় হঠাৎ সে বহুদূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পায়। শুনিয়াই সে প্রাণপণে অশ্বচালনা করে। অশ্বও তাহার কষাঘাতে বায়ুবেগে ছুটে। নেশার ঝোঁকে হঠাৎ তাহার হস্ত হইতে অশ্ববলগা ছাড়িয়া যায়, সেও অশ্ব হইতে দূরে খানায় নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার পর আর তাহার সংজ্ঞা ছিল না। কতক্ষণ সে সেই অবস্থায় পড়িয়াছিল, অশ্বই বা কোথায় গেল, সাহেবেরই বা কি হইল, তাহা সে জানে না।

কথায় কথায় সকলে মাঠ ছাড়িয়া দীননাথের বাটীতে উপস্থিত হইল। দেওয়ানজী থানাদারকে সেই রাত্রির মত দীননাথের বাহিরের দাওয়ায় বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিয়া দীননাথকে সঙ্গে লইয়া গৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দীননাথ বাটীতে বলিয়া কহিয়া বসিবার চেটাই, আলোক ও তামাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দেওয়ানজীকে পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

দেওয়ান-গৃহিণী।

দীনু লণ্ঠন লইয়া আগে আগে, দেওয়ানজী পশ্চাতে। দুইজনে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছেন।

"দীনু, বড় ভাবনার কথা। সাহেব কোথায় গেল? বন্দুকের আওয়াজ কেন হইল? এই থানাদার বেটা যদি মাতাল না হত!"

"আজ্ঞে, তা ত' বটেই, ও যদি মাতাল না হত।"

"আচ্ছা, দীনু, তোমার কি মনে হয়? বোধ হয় বন্দুকের আওয়াজটা মিথ্যা। ও বেটা নেশার ঝোঁকে খেয়াল দেখেছিল।"

"আজ্ঞে, আমারও তাই মনে হয়, ঐ বেটা খেয়ালই দেখেছে।"

"আর তা না হলে রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ হল, অথচ গাঁয়ে কোনও সাড়াশব্দ নাই। কেউ জাস্তেও পাল্লে না, কথাটা নিয়ে ঘোঁট পাচালও কল্লে না?"

"আজ্ঞে, তাই ত', গাঁয়ে ত সব নিশুতি, কোন গোল নাই। কেবল ঐ পূজোবাড়ীর দিকে একটু একটু গোলযোগ শোনা যাচ্ছে।"

"আচ্ছা, তাই বা কেমন করে হবে? পূজাবাটীতে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো, স্ত্রীপুরুষ, সব একত্র হয়েছে, পূজার বাজনা বেজেছে, গোলযোগ চলেছে, বাজী পুড়েছে, কাঠের কামান দেগেছে; সে গোলমালে একটা বন্দুকের আওয়াজ কেউ না শুনলেও পারে।"

"তা ত বটেই, বন্দুকের আওয়াজ আর কে শুনবে,—সব তখন পূজায় মেতেছে।"

"কিন্তু একটা কথা। ফকিরহাটের বাজারে ত লোক ছিল। তাহারা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইত। তাহা হইলে এতক্ষণ একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত।"

"আজ্ঞে, ও কথায় আর ভুলটী নেই। তবে একটা কথা আছে।

ফকিরহাটের আজ হাট বার নয়, লোক আসে নাই। দোকান ঘর তিনখানা; তা ছিদামমোদক ত' ঘরে জ্বরে ভুগছে, দোকান বন্ধ। কানাই মুদী আর তার ভাই,—এই দুজনেরও দুখানা দোকান। তা তারা সন্ধ্যাবেলাই দোকানপাট তুলে পূজো-বাড়ী ছুটেছে। কে আর ফকিরহাটে ছিল? ও তল্লাটেই কেউ ছিল না। যদি কেউ থাকে ত' মাঠের পারে আমার ঘরের বুড়ীটা, আর বিশে কাওরার বুড়ো অথব্ব মাটা ছিল। তারা বদ্ধ কালা,—বন্দুকের আওয়াজ কি শুনবে?"

"যা হ'ক, কাল সকালে উঠেই তল্লাস করতে হবে। ভয়ের কথা কিছু নাই বোধ হয়—কি বল দীনু? বরকন্দাজেরা ফকিরহাটে ছিল। তারা কি আর সাহেবের বিপদ দেখলে চুপ করে থাকত? বিপদ ঘটলে অন্ততঃ একজনও ছুটে গিয়ে কুঠীতে খবর দিত। দেখ, পূজোবাড়ী নিস্তব্ধ, সব ঘুমাচ্ছে, কেবল সেনেদের বাড়ীতে গোলযোগ শুনা যাচ্ছে।"

"কেবল আজকার দিনটা। কাল হতে সেই দশমী পর্য্যন্ত আর ঘুম বড় থাকবে না। কত লোকই ছোটকর্ত্তার বাড়ীতে আমোদ করবে, খাবে!"

"এককালে আমিও অমন কত"—দেওয়ানজী কি বলিতে গিয়া হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলেন ও ব্যস্তে বলিলেন, "আঃ বাঁচা গেল, এই যে ধোনা হরির টোকো আমতলা, এইবার বাড়ী।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহারা ভদ্রবাগানে উপস্থিত হইলেন। এই বাগানেই দেওয়ানজী মহাশয়ের আবাস গৃহ। বাগানের চারিদিকে জিউলী ও এরণ্ড বৃক্ষের বেড়া। পূর্ব্বদিকে প্রবেশ দ্বার ও দ্বারের পার্শ্বে মালীর ঘর। বাগানের মধ্যে নানা বৃক্ষাদি, মধ্যস্থলে দেওয়ানজীর সুন্দর গৃহ। দেওয়ানজী সাহেবী বাঙ্গলার অনু-

করণে এই গৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। দেওয়ানজী মহাশয় "মালী মালী" বলিয়া ডাক দিলেন। মালী ত্রস্তে উঠিয়া বাগানের দ্বার খুলিয়া দিল। আবাসগৃহের দ্বারদেশে প্রদীপহস্তে দাঁড়াইয়া একটী সুন্দরী পূর্ণযুবতী রমণী, সে দীননাথকে দেখিয়াই অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিল। দীননাথ দেওয়ানজীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিল।

দেওয়ানজী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই রমণী দ্বারে অর্গল লাগাইয়া প্রদীপ হস্তে পথ দেখাইয়া চলিল। রমণীর বয়স ত্রিংশৎ হইবে, কিন্তু যৌবনের ঢল ঢল লাবণ্য এখনও তাহার সুন্দর দেহযষ্টি বেষ্টন করিয়া আছে। রমণী একবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল, "ও লোকটাকে সঙ্গে আন কেন? ওর মুখ দেখলেই ওকে আমার ভাল লোক বলে মনে হয় না।"

দেওয়ানজী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বসন পরিত্যাগ করিতে করিতে রমণীর দিকে না তাকাইয়া বলিলেন, "কার কথা বলূছ, দীননাথের? আরে রাম! দীনু বড় ভাল লোক। কেন তুমি ত' জান, দীনু আমার প্রাণরক্ষা করেছিল।"

রমণী। তা আর জানি না, বিলক্ষণ জানি! বারাসতে ও আমার হাড় জ্বালিয়েছিল। ওর জন্যে রোজ রেঁধে রেঁধে আমার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। ওঃ সে আদর কদর কত, যেন গুরুপুত্তুর!

দেওয়ানজী বসন পরিত্যাগ করিয়া মাদুরের উপর উপাধানে ভর দিয়া শ্রান্তি দুর করিতেছেন, গৃহিণী (সেই রমণীই যে দেওয়ান-গৃহিণী, তাহা আর বুদ্ধিমান পাঠককে বুঝাইতে হইবে না) হাতপাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। মালী তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছে। দেওয়ানজী তামাকু সেবন করিতে করিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ঐ কেমন ঝোঁক, যাকে দেখতে পার না, তার কিছুই দেখতে পার না। যাউক, গোপলা কোথায়? ঘুমুচ্ছে বুঝি?"

গৃহিণী। "ঘুমুবে না ত' কি জেগে থাকবে? রাত যে তিন পহর হয়েছে? এই কেঁদে কেঁদে বাছা ঘুমুলো।

দেওয়ান। কেন, কেন, কাঁদছিল কেন?

গৃহিণী। ছেলেটা পুজো বাড়ীতেই সারা দিন রাত রয়েছে। ওকে কিন্তু কেউ দেখতে পারে না। মুখপোড়া হাড়হাবাতে ছোঁড়াগুলো ওকে কেবল দেখ-মার করে। আজও বাছাকে যা না তাই বলে গাল দিয়েছে; চুলোমুখো মড়িপোড়ারা বাছাকে আজ নির্দ্দয় করে ঠেঙ্গিয়েছে। থাকৃতুম সেখানে, নিব্বংশেদের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতুম।"

দেওয়ান একটু উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "বটে বটে, আচ্ছা দেখে নিচ্ছি বেটাদের। জানে না, কার ছেলের গায়ে হাত তোলে?"

গৃহিণী। থাক, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। মরদ ত' মস্ত। এখন এস খাবে এস, ভাত কড় কড় হয়ে গেলো।

দেওয়ান। "বাহাদুরী কিসের? গাঁয়ের লোককে একবার জানিয়ে দেব যে, দেওয়ান কালীদত্তের সঙ্গে লাগার কি মজা!" কথা শেষ করিয়াই দেওয়ানজী বিকট শব্দে মুহুর্মুহু তামাক টানিতে লাগিলেন।

গৃহিণী। ওঃ তোমার ভয়ে ত' সব সারা হল! এ আর তোমার কু—"

দেওয়ান। চপলা!

কর্ত্তার ধমকে গৃহিণী চমকাইয়া উঠিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "দেখ, আমাদের উপর গাঁয়ের কেউ সন্তুষ্ট নয়। গাঁয়ে এসে ঘর বেঁধে বাস করছি, যাহোক দু পয়সা তুমি রোজকার করে আনৃছ, আর অমনি লোকের বুক চড়চড় করছে; পোড়া লোকের চোখে আগুন লাগে না!"

দেওয়ান। দেখাচ্ছি, দেখাচ্ছি বেটাদের; কুঠীর দেওয়ানের সঙ্গে লেগেছেন সব, কত ধানে কত চাল তা ত' বোঝেন না! ও দর্প-

নারাণের দর্প চূর্ণ না করি ত' বাপের বেটাই নই। বেটা যেন গাঁয়ের রাজা! আর ছেলে বেটা নবাবপুত্তুর!

চপলা। "অমন কথা বোলো না। গাঁয়ে যদি কেউ আমাদের হয়ে এক কথা বলবার থাকে ত দর্পনারায়ণ। তিনি দয়া না করলে গাঁয়ে বাস করবার জায়গা পেতে কোথায়? তাঁর দোষ কি? আর নির—নিরঞ্জন না থাকলে আজ ত' ছেলেটাকে হাবাতেরা মেরেই ফেলত। সেই ত বাছাকে বাড়ীতে দিয়ে গেল।" কথাটা বলিবার সময় গৃহিণীর গলা কাঁপিল।

দেওয়ান। চপলা! তুমি মেয়েমানুষ, ও সব চাল বোঝ না। তুমি কি মনে কর দর্পনারায়ণ বেটার টিপুনী না থাকলে গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো এত বাড়িয়ে তুলতে পারে?

চপলা। যাক, ওসব কথা, কাল তখন হবে। এখন এস খাবে এস।

দেওয়ান ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, খাই এই। আপাততঃ একটু ওষুধ দাও দেখি।"

চপলা। না না, এত রাত্রে আবার ওষুধ কেন। কাল খেও। এখন ভাত খাবে এস।

দেওয়ান। গা হাত গুলো বড় কামড়াচ্ছে। সারা দিনটা খেটে খুটে রাত্রে ঘরে ফিরবার সময়ে দুর্ঘটনা। ওষুধ একটু না খেলে আর খাতে আসছি না।

চপলাসুন্দরী ঠাঁই করিয়া অন্ন পরিবেশন করিতে করিতে জিজ্ঞাসিলেন, "কি, দুর্ঘটনা আবার কি? কখন হল?"

দেওয়ানজী বলিলেন, "খাবার সময় সব বলছি। আপাততঃ একটু দিয়ে প্রাণটা বাঁচাও।"

গৃহিণী "যা ধরবে তা ত' না করে ছোড়ব না"—এই কথা বলিয়া

কাঁঠালকাঠের বড় সিন্দুকের ভিতর হইতে একটী বোতল ও গেলাস বাহির করিলেন। বোতলে বিলাতী সুরা; সাহেবের দেওয়ান হইয়া অবধি কালীচরণের "দেশী"তে রুচি হইত না, তাই সাহেবের জন্য বিলাত হইতে আনীত বহুমূল্য সুরায় তিনি ভাগ বসাইতেন। কলিকাতায় চাকুরীর সময় কখনও কখনও তাঁহার ভাগ্যে একটু আধটু সাহেবীপ্রসাদ জুটিত, বারাসতে সাহেবের বাটীর ম্যানেজার হইয়া মাত্রা চড়িয়া গেল, আর দেওয়ান হইয়া ত পোয়া বারো।

গৃহিণী গেলাসে সুধা ঢালিয়া কর্ত্তার হস্তে দিলেন, (গেলাস বোতল সব কুঠীর), কর্ত্তা এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা উদরস্থ করিলেন। উপরি উপরি এইরূপ তিন চারি গেলাস উদরস্থ হইলে পর গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কর্ত্তা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "হয়ে যাক এক গেলাস!"

গৃহিণী বলিলেন, "না না, ও ছাই আর রাতে খাবো না। কি অভ্যাসই করিয়েছ!"

কর্ত্তা গৃহিণীকে টানিয়া লইয়া ঈষৎ জড়িতস্বরে বলিলেন, "তাও কি হয় চপু? আমি খাব, আর তুমি সাদা চোখে বসে বসে দেখবে?"

গৃহিণী কর্ত্তার উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে এক গেলাস পান করিয়া ফেলিলেন। তখন উভয়ের দুই চারি গেলাস বেশ চলিল। কর্ত্তার মহা আনন্দ। অঙ্গটী দোলাইয়া, হাত নাড়িয়া, ফিক ফিক হাসিয়া, কর্ত্তা বলিলেন, "এই, দেখ ত' চপু, এমন না হলে আমোদ। বাবা, কোথা উড়ে গেল গায়ের ব্যথা! বারাসতে যদি এমনটী না শেখাতুম, ত' এমন আমোদ পেতে কোথা? চল, এইবার তোমার কি শাক চচ্চড়ী আছে দেবে চল।"

কর্ত্তা ভোজনে বসিলেন; গৃহিণী পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। গৃহিণী কর্ত্তাকে অন্ধকার দুর্ঘটনার কথা জিজ্ঞাসিলেন, কর্ত্তা আহার করিতে করিতে সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা করিলেন। কথা শেষ হইলে

গৃহিণী বলিলেন, "থানাদারকে তোমার দীনুর বাটীতে রেখে সাহেবকে একবার খুঁজে দেখলে না কেন?"

দেওয়ান। এই রাত্রে কোথায় খুঁজব? সাহেব ওখানে থাকলে কি আর কুঠীতে খবর পাঠাত না? দীনু বল্লে সকালে খোঁজ কর্‌তে। আমারও বোধ হয় সেই ভাল।

চপলা। দীনু, দীনু, দীনু! ভ্যালা যাহোক দীনু পেয়েছিলে! ও মুখপোড়াকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। তুমি দেখ না, কিন্তু ও তোমার দিকে মাঝে মাঝে কেমন এক রকম কোরে চায়, দেখলেই আমার ভয় করে। ও লোক ভাল না।

দেওয়ান। (হাসিয়া) চপু, তোমার কথা ত জানাই আছে। যার উপর যখন তোমার বিষদৃষ্টি পড়ে, তখন আর তার রক্ষা নাই। আবার যাকে ভাল দেখ, তার সবই ভাল। এই দেখ না, দর্পনারাণে ও নিরে বেটার নামে তোমার মুখে লাল ঝরে, অথচ ও বেটারা আমার শত্রু।

চপলা। না না, ওরা তোমার শত্রু হবে কেন? ওরা বড় ভাল লোক, ওদের জন্যে গাঁয়ের লোকে আমাদের কিছু বলতে পারে না।

বলিতে বলিতে চপলার কণ্ঠস্বর গদ্ গদ হইয়া আসিল, কি এক ভাবের আবেশে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। কালীচরণের অল্প নেশা হইয়াছিল, তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই, তাই বলিলেন, "দেখ, ওদের তুমি চেন না। লোক চিন্‌তে এখনও তোমার ঢের বাকি। ঐ নিরে ছোঁড়াটা বিষম পাজী। ফুটফুটে টুকটুকে মুখখানাতে যেন হাসি মাখিয়েই রেখেছে, রাত দিন খুড়ী খুড়ো বলে ঘরের ছেলের মত আসছে যাচ্ছে, যেন কত কালের সম্বন্ধ! ছোঁড়ার সব বুজরুকি। ছোঁড়া ভারি ধড়িবাজ। তোমায় খুড়ী বলতে ত' অজ্ঞান! কেমন না?"

চপলা। "কে, আমায়—না, কই—কি বলে," এই কথা বলিতে বলিতে গৃহিণী যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলেন। হঠাৎ কথাটা চাপা দিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "বলি, হাঁগা, দীনু তোমার ত ভাল, তা হলেই হল। আমি বলছি কিন্তু ঐ দীনু মুখপোড়া ভাল লোক নয়। তুমি যতই বল না কেন, ও তোমার শত্রু। তা না হলে, তোমার দিকে মাঝে মাঝে ওরকম করে চায় কেন? লোক জনের কাছে আমাদের পরিচয় নেয় কেন?"

দেওয়ান। আরে না না। দীনুকে আমি খুব জানি। ও লোক ভাল। যা করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, না হলে এত দিন আমি থাকৃতাম কোথায়?

চপলা। ঐ এক কথা—প্রাণ বাঁচিয়েছিল। আচ্ছা, প্রাণ বাঁচিয়েছিল, প্রাণ বাঁচিয়েছিল,—এ ত' তোমার মুখে লেগেই আছে। কি করে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তা কিন্তু এক দিনও বল্লে না। কতবার বলবে বলবে করে বলতে ভুলে গেলে, আবার বলতে বলতেও কখন কখন থেমে গিয়েছ। বলি, প্রাণটা আবার ও মুখপোড়া বাঁচালে কি করে?

দেওয়ান। ওহো, বটে বটে, ও কথাটা তোমায় বলা হয় নি বটে। ওঃ সেই বারাসতের কাণ্ড মনে পড়লে এখনও গা শিউরে উঠে। দাও ত' আর এক গেলাস।

গৃহিণী। তা দিচ্ছি', খেয়েই ওঠ। পাতের ধারে ও বেগুনটা ঠেলে ফেলে রাখা হল কেন? ওটী খেতে হচ্ছে।

দেওয়ান। খাচ্ছি গো খাচ্ছি। আর কত খাব? সব তরকারিগুলি খেতে ভাল, কোনটা রেখে কোনটা খাই। এখনও দুধ মিষ্টি রয়েছেন! দাও দাও, আর এক গেলাস মধু দাও দেখি।

গৃহিণী। না না, আর বেশী খেলে মাতাল হবে; খেয়ে ওঠ, আর একটী গেলাস দেব এখন। এখন সেই বারাসতের গল্পটা বল দেখি।

দেওয়ান। গল্প বলছি, কিন্তু বদনাম দিও না। আমি মাতাল হই, এমন মদ সৃষ্টি হয়েছে?

গৃহিণী। না তা হয় নি। এখন ঐ আমড়ার অম্বলটুকু দিয়ে দুটী ভাত ভেঙ্গে নিয়ে খেতে খেতে বল দেখি।

দেওয়ান। দেখ চপু, সে আজ প্রায় দু তিন বৎসরের কথা। তখন বারাসতে সাহেবের বাগানবাড়ী তৈয়ার হচ্ছে। আমার উপর তার তদারকের ভার। তখন বারাসতেই থাকি।

গৃহিণী। আহা ও সব কথা বলতে কে বলছে। আমিও ত' তখন বারাসতে। গোপাল তখন তিন বছরের। ঐ খানেই ত' ঐ মুখপোড়া তোমায় এক দিন আধ-মরা অবস্থায় ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

দেওয়ান। হাঁ গো হাঁ। গোড়া বেঁধে না বল্‌লে সব বুঝবে কেন। সাহেবের কলিকাতার দোকানে বারাসতের বড় বড় সাহেবসুবোরা কাপড়চোপড় ও অনেক রকম জিনিসপত্র কিনত।

গৃহিণী। কি বিপদেই পড়েছি গো। বলেছি ত' একটু বেশী খেলেই হুঁস থাকে না। কেবল পুরাণ কাসুন্দীই ঘাঁট্‌ছো।

দেওয়ান। এটা পুরাণ কাসুন্দী হল বুঝি?

গৃহিণী। না ত' কি? কলিকাতায় সাহেবের দোকানে কি বিক্রি হয়, তা বুঝি জান্‌তুম না?

দেওয়ান। যাক্। বারাসতে অনেক বড় বড় সাহেবসুবোর বাগান বাড়ী। অনেকে ঐখান থেকে কলিকাতায় আফিস করেন। তা ছাড়া বারাসতে একটা গোরাবারিকও আছে।

গৃহিণী। হাঁ হাঁ, তোমার মুখেই শুনেছিলাম বটে, তুমি সেখানে দোকানের পাওনার টাকা আদায় করতে যেতে।

দেওয়ান। ঐ গোরাবারিকে দুশো আড়াইশো ছোঁড়া গোরা থাকে। শুনেছি বিলাত থেকে ঐ সব ছোঁড়াদের যুদ্ধ শেখাবার জন্য

বেতন দিয়ে এ দেশে আনা হয়। ছোঁড়ারা একবারে জাত কেউটে, কেউ ১৬, কেউ ১৭, কেউ ১৮। যুদ্ধ শেখা ত' তাদের মাথা, ঐ কেবল একবার কুচকাওয়াজ করা আর বন্দুকছোড়া, বস্ ঐ কাজ হয়ে গেলো ত' সারা দিন ধিঙ্গি লাফ পেড়ে বেড়ানো। খেলার সময় মাথার উপর কেউ নেই।

গৃহিণী। হাঁ,বারাসতে থাকতে শুনেছি যে. ছোঁড়ারা ভারি দুরন্ত; বারিকের আশে পাশে লোকজন চল্‌বার যো নাই।

তখন দেওয়ানের আহার শেষ হইয়াছে; আচমনান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে শয্যার উপর তিনি উপবেশন করিয়াছেন। দেওয়ানজী তামাকু সেবন করিতেছেন, গৃহিণী তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছেন।

দেওয়ান। বাপ! দুরন্ত ব'লে দুরন্ত! আমার হাড় সেঁকে দিয়েছিল আর কি।

গৃহিণী। সে আবার কি, তোমায় কি করেছিল?

দেওয়ান। শোন না, সব বলছি। বারিকের কর্ত্তা কাপ্তেন রিচার্ডসন। তিনি বড় ভাল সাহেব। তিনি আমাদের খরিদ্দার। বারিকের লেফটেনাণ্ট ব্রাউটন এবং লেফটেনাণ্ট অলিভার সাহেবও আমাদের খরিদদার। একদিন ঠিক দুপুর বেলায় গিয়েছি বিল আদায় করতে; ডান হাতে ছাতা, বাম হাতে বিলের তাড়া; গুটী গুটী বারিকের ভিতরে প্রবেশ করছি, এমন সময় হৈ হৈ রৈ রৈ রব ও হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ উচ্চহাস্য শুন্‌তে পেলাম। বারিকের বড় ফটকে একটা ছোট চোরা দরজা আছে। তার মধ্য দিয়ে গ'লে গিয়ে অঙ্গনে উপস্থিত হলেম। সেখানে গিয়ে যে ব্যাপার দেখলাম সে অদ্ভুৎ!

গৃহিণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "কি রকম, কি রকম?"

দেওয়ান। গিয়ে দেখি, প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চারিদিকে আগম নিগমের

পথ রুদ্ধ; প্রায় দুই শত ছোকরা গোরা সেই প্রাঙ্গণের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে প্রকাণ্ড বংশদণ্ড ও ইষ্টকখণ্ড; মধ্যস্থলে একটী শৃগাল এক খোঁটায় বাঁধা; সেই শৃগালটাকে দশ পনেরোটা দেশী বিলাতী কুকুরে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতেছে, আর ছোকরারা শৃগালটাকে বাঁশের খোঁচা মারিয়া ও ইট মারিয়া উত্তেজিত করিতেছে; কুকুরগুলা শৃগালকে আক্রমণ করিতেছে, শৃগাল খেঁক খেঁক করিয়া তাড়া করিয়া যাইতেছে, কুকুরগুলা পলাইতেছে, ছোকরারা হাততালি দিয়া উচ্চহাস্য করিতেছে; আবার কুকুরগুলাকে ধরিয়া ঝুপ ঝাপ করিয়া শৃগালের সম্মুখে ফেলিয়া দিতেছে ও শৃগালকে ইট মারিয়া খোঁচা মারিয়া রাগাইয়া দিতেছে। একে শৃগাল, তায় খোঁটায় বাঁধা, কতক্ষণ যুঝিবে; তবুও সে অনেক কুকুর জখম করিল; পরে কিন্তু ক্রমাগত ইট, খোঁচা ও কুকুরের কামড় খাইয়া শৃগালটা কাবু হইয়া পড়িল; কুকুরগুলা তাহাকে টানিয়া হিচড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। তখন আবার বিষম হৈ হৈ রৈ রৈ, হুররো হুররো,—শব্দ উঠিল। আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া সভয়ে এই বীভৎস কাণ্ড দেখিতেছি।

গৃহিণী। বাবা, বাবা! এর নাম খেলা? গড় করি বাপু খেলার পায়! সব বিটকেল!

দেওয়ান। হাঁ, বিটকেলই বটে। আমি বিলগুলি হাতে করে একটী কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি; হঠাৎ আমার উপর ছোকরাদের দৃষ্টি পড়িল। আর যায় কোথা! ছোঁড়াগুলো বাঘের মত এসে আমায় ঘিরে ফেলে হোঃ হোঃ হাসি জুড়ে দিলে। সে হো হো হাসির বিকট রব মনে পড়লে এখনও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কেহ আমার নাক ধরিয়া টানে, কেহ আমার কাণ মলিয়া দেয়, কেহ আমার ছাতা কাড়িয়া লয়, কেহ বা আমার কাছা খুলিয়া দেয়;

কোথায় গেল ছাতা, কোথায় গেল চাদর, কোথায় গেল চাপকান! হঠাৎ আমার বিলগুলিতে একজনের দৃষ্টি পড়িল; নিমেষের মধ্যে বিলগুলি লুণ্ঠিত হইল। তাহার পর বিল লইয়া টানাটানি ছেঁড়া-ছিঁড়ি। আমি নিরুপায় হইয়া হাতে পায় ধরিয়া কত কান্নাকাটি করিলাম,—কে বা তাহা শুনে। কান্না শুনিয়া হাস্যরোল উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল।

গৃহিণী। তার পর, তার পর?

দেওয়ান। তাহার পর আর কি! ছোঁড়ার দল আমার হাত পা ধরিয়া চেঙ্গদোলাদোল করিয়া শূন্যে উঠাইল, কতকগুলা ছোঁড়া মাঝে মাঝে আমায় বাঁশের খোঁচা দিতে লাগিল, আমি পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিলাম। এদিকে কতকগুলা ছোকরা দৌড়িয়া গিয়া বড় ফটক খুলিয়া দিল, আমিও বাহিত হইয়া বাহিরে চলিলাম। ওঃ সে আনন্দ দেখে কে! বেটারা যেন আমাকে পাকা কলাটী পাইল। বারিকের বাহিরে পথের পার্শ্বে একটা পানা পুকুর আছে। ছোঁড়াগুলো আমায় সেই পুকুরে ঝুপ করিয়া ফেলিয়া দিল।

গৃহিণী। এঁ্যা, বল কি? পুকুরে ফেল্লে কি গো?

দেওয়ান। হাঁ ফেল্লে বৈকি! ঐ তাদের আমোদ।

গৃহিণী। এমন আমোদের মুখে মুড়ো খেংরা!

দেওয়ান। সাহেবের মুখে শুনেছি যে, কোম্পানী বাহাদুর ঐ ছোঁড়া-বারিক তুলে দেবার জন্যে লেখালিখি কচ্ছেন। এমন কোম্পানী নয়,—অন্যায় কারও দেখতে পারেন না, তা হ'ক না সে জাতভাই!

গৃহিণী। আহা, তুলুক, তুলুক। তোমায় কি কষ্টই না দিয়েছে!

দেওয়ান। শুধু কি আমায়, অমন কত লোককেই কষ্ট দেয়, আর বলে যে আমোদ কচ্ছি।

গৃহিণী। তোমায় যে কষ্ট দিয়েছিল, এইরকম অনেককে দিত বুঝি ?

দেওয়ান। দাঁড়াও, কষ্টের কথা এখনই শুনলে কি ? সেই পুকুরে ফেলে আমায় একবার ডুবায়, একবার তুলে। সর্ব্বাঙ্গে পানা মেখে নাকানি চোবানি খেয়ে প্রাণ যায় আর কি ! আমার ঐ কষ্ট, বেটারা কিন্তু হো হো হাসে। কতক্ষণ এমন করেছে জানি না, আমার তখন জ্ঞান লোপ হয়েছে। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলাম আমি পুকুর পাড়ে শুইয়া আছি, দুইজন লোকে আমায় সুশ্রুষা করছে, তারা দুজনেই আমার অপরিচিত। আমার চেতনা হয়েছে দেখে আমায় তারা তুলে নিয়ে চল্লো। কিছুক্ষণ পরে এক পর্ণকুটীরে আমরা উপস্থিত হলাম। সেই কুটীরই দিননাথ অধিকারীর ও সেই অপরিচিতদিগের মধ্যে দীননাথ একজন।

গৃহিণী। তবে যথার্থই দীনু তোমায় বাঁচিয়েছিল।

দেওয়ান। দীনুই যথার্থ আমার জীবন-দাতা। অপর ব্যক্তিকে আমার স্মরণ নাই। তাহাকে সেই একবার মাত্র দেখিয়াছি। দীনু ও দীনুর পরিবারবর্গ সে যাত্রা আন্তরিক সেবা শুশ্রূষায় আমাকে রক্ষা করে।

গৃহিণী। তা জানি। সেই সময় তোমার দীনু আমাদের বাটীতে হাঁটাহাটি করত, তোমার খবর এনে দিত। তোমায় ত' দু তিন দিন পরে বাটীতে দিয়ে গেল। ওঃ! সে সময় দীনু তোমার পরিচয় কত করে জিজ্ঞাসা করিত।

দেওয়ানজী মহাশয় কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "দেওয়ানজী মহাশয়, দেওয়ানজী মহাশয় !"

দেওয়ানজী কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এত রাত্রে কে ? মালী ?"

আগন্তুক বলিল, "আজ্ঞে না, আমি নরহরি।"

"নরহরি? এত রাত্রে কেন?"

নরহরি ব্যগ্র হইয়া বলিল, "মহাশয়, বড় বিপদ। ভজার মধ্য রাত্রি হইতে ভেদবমি হইতেছে, আপনি একবার আসুন, আমি আলো এনেছি।"

দেওয়ানজী বিড় বিড় করিয়া আপন মনে বকিতে লাগিলেন,—"ভ্যালা আপদ, রাত্রেও বিশ্রামের যো নাই।" পরে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "তা আমি গিয়ে কি করবো?"

নরহরি। আজ্ঞে, আপনার কাছে সাহেবের অনেক ভাল ঔষধ আছে। আজ রাত্রে কবিরাজ মহাশয় গ্রামে নাই, তিনি টাকী গিয়াছেন। তাই ছোটকর্ত্তা আপনার কাছে ঔষধ নিতে বল্লেন।

দেওয়ানজী মহাশয় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ঔষধের বেলা বুঝি আমি? আমি যেতে পারবো না বাপু।"

এই সময়ে গৃহিণী দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, "কর কি? ঐ জন্যেই ত' গাঁয়ে তোমার এত শত্রু। কাজ ত ভারি, একটু বিনি পয়সার ওষুধ দেওয়া। না দিলে লোকে বশ হবে কেন? যাও।"

নরহরি দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, দেওয়ানজী তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া ঘর হইতে ঔষধ লইয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন। নিকটেই নরহরির বাটী। একখানি ঘরে ভজহরি শুইয়া আছে, আর ভজহরির মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। সকলেই নীরব, কেবল ভজহরি গায়ের জ্বালায় ও দারুণ তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছে, মাঝে মাঝে "জল জল" করিয়া চীৎকার করিতেছে। ঘরে একটী প্রদীপ মিটি মিটি

জ্বলিতেছে। ঘরের দাওয়ায় মাদুরের উপর ছোটকর্ত্তা ও অভয় ঠাকুর বসিয়া তামাকু খাইতেছেন।

দেওয়ানজীর সাড়া পাইয়াই সেন-গৃহিণী ও মালতী উঠিয়া পশ্চাতের দ্বার দিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। দেওয়ানজীকে আসিতে দেখিয়া দর্পনারায়ণ বলিলেন, "এই যে দত্তজা মহাশয়! আপনি এসেছেন, বড় ভালই হয়েছে। একবার দেখুন দেখি, ছোঁড়াটা অনেকবার ভেদবমি করে কাহিল হয়ে পড়েছে, তৃষ্ণা ও গায়ের জ্বালায় ছটফট করছে। তবে আমার অনুমান হয়, ভয়ের কারণ নাই।"

দেওয়ানজী কোনও কথার জবাব না দিয়াই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও প্রথমেই আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিতে বলিলেন। রোগী দেখা হইল, ঔষধ দেওয়া হইল। হরিমতী কাঁদিয়া বলিল, "দেওয়ান কাকা, ভাল হবে ত?" দেওয়ানজী হরিমতীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ভয় নেই, সেরে যাবে।" মদ্যপানে দেওয়ানজীর চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে বিকট দুর্গন্ধ। দেওয়ানজী আর একবার প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিতে বলিলেন। হরিমতী আবার উঠিয়া প্রদীপ ঠিক করিয়া আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিল। দেওয়ানজী সেই উজ্জ্বল আলোকে হরিমতীর যৌবনলাবণ্যোদ্দীপ্ত অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ভাবিলেন, "মরি মরি! এত রূপ! এতদিন ত' লক্ষ্য করি নাই। এ রূপ ভোগে না আসিলে জন্মই বৃথা।" দেওয়ানজী গৃহে ফিরিবার সময় কেবল ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

মন্ত্রণার ফল।

গ্রামের সদর পথের উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ এক জলাশয়। জলাশয়ের চারিদিকে চারিটি বাঁধাঘাট; দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ফল, মূল, শাকশবজী ও ফুলের বাগান। উত্তরতটে বাঁধাঘাটের দুইপার্শ্বে দুইটী চম্পকবৃক্ষ; সেই বাঁধাঘাটের উত্তরে বৃহৎ তুলসীমঞ্চ, পূর্ব্বে কিছু দূরে বিল্বপীঠ। জলাশয়ের পূর্ব্বপার্শ্বে বাগানের মধ্যস্থলে গোশালা ও গোলাবাড়ী; পশ্চিমে অতিথিশালা, পালকী-আড়া, বাজনাখানা, এবং ভিয়ানবাটী। জলাশয়ের উত্তরে তুলসীমঞ্চের পশ্চাতে বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র, তাহার পশ্চাতে সদরবাটী, কাছারী ও পূজার দালান। পূজার দালানের পশ্চাতে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও তাহার তিন পার্শ্বে অন্দরের একতল কোঠা। তাহার পশ্চাতে রন্ধনশালা, ঢেঁকিশাল, অন্দরের পুষ্করিণী ও বাগান এবং সেই বাগানের উত্তরে সোণাকুড়ের বিল ও বাগোড়। ইহাই দর্পনারায়ণের পৈত্রিক ভিটা।

বেলা প্রহরাধিক অতীত হইয়াছে, সূর্য্যতাপ একটু প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, গোশালার সম্মুখে শরতের সেই কোমল মধুর রৌদ্রে গাভীগণকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গোলাবাড়ীতে গোলা হইতে ধান্য মাপিয়া বাহির করা হইতেছে, অতিথিশালে অন্তঃপুর হইতে অতিথি ভিখারীদিগের সিধা ও ভিক্ষা আসিতেছে, কাছারীবাটীতে কলম চলিতেছে, বাগানে মালীরা কাজে মনোযোগ দিয়াছে। চম্পক বৃক্ষে দুটী একটী চম্পক মধুর বায়ুর আন্দোলনে ঝরিয়া পড়িতেছে আর চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছে। জলাশয়ে হংসেরা শ্রেণী দিয়া মনের আনন্দে সাঁতার দিতেছে। তুলসীমঞ্চের পশ্চাতে বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রে অনেকগুলি গ্রাম্যলোক একত্র হইয়াছে। বড়ঠাকুর মহাশয়, সেজ-ঠাকুর মহাশয়, দাদাঠাকুর মহাশয়, মেজকর্ত্তা, সেজকর্ত্তা, নকর্ত্তা,

ঘোষ মহাশয়, মিত্র মহাশয়, বিশ্বাস মহাশয়, পালজা, সেনজা, শিবুদা, জগদা, হারাণ মণ্ডল, পরাণ কামার, মতি বারুই, তিনু কপালি, পরাণ কাওরা, হাজারী বাগদী, আএনদ্দী মিঞা, মিঞাজান মণ্ডল, নাজীর গাজী, আছিরদ্দী মণ্ডল—প্রভৃতি অনেকেই সেই স্থানে উপস্থিত, কেবল ছোটকর্ত্তা দর্পনারায়ণ নাই।

দাদাঠাকুর সকলের পরে আসিয়াছেন। ছোটকর্ত্তাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কই, ছোটকর্ত্তা কই? তাঁর বুঝি আসবার সময় হয় নাই?"

মেজকর্ত্তা নিমচাঁদ ঘোষ বলিলেন, "না, নারাণ এখনও আসে নি। এলো বোলে।"

দাদাঠাকুর অমনি বলিলেন, "তা আসবে কি করে? প্রাতঃকালে ভগবানের নাম নিয়ে উঠেই বিলে কোস্তাকুস্তি, জলক্রীড়া, আহ্নিক পূজা; তারপর আদা ছোলা গুড় মুড়ীর শ্রাদ্ধ সেরে এখন ধামা ঘাড়ে সারা গ্রাম টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কার বাড়ী হাঁড়ী চড়ে নি, কার বাড়ী রোগীর ঔষধ পথ্য চাই, কার কি বিপদ আপদ হল—ঘুরে ঘুরে দেখছেন। বেলা দুপহর না হলে ত' আর তাঁর বার হবে না।"

বৃদ্ধ নাজীর গাজী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, "ঠাকুর, ছোট-কত্তা যে আঙ্গা মা বাপ। তিনি আঙ্গা না দেখলি মোরা যাই কন্‌নে কও দিখি?"

নাজীর গাজীর কথায় তাবৎ লোকেই সায় দিল। মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, দাদাঠাকুর! কাজটা কি ছোটকর্ত্তা বড় মন্দ করছেন?"

দাদাঠাকুর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সে কথা হচ্ছে না, সে কথা হচ্ছে না। বড় দাড়ী নেড়ে আমায় বুঝাতে এলেন। ছোট কত্তার কথা আর আমায় শেখাতে হবে না। বলে জন্ম গেল কেটে"—

মিত্র মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবে ছোটকর্ত্তার দোষ দিচ্ছ কেন, দাদাঠাকুর ?"

দাদাঠাকুর মিত্রমহাশয়ের কথাতে যত না হউক কিন্তু তাঁর ফিক্‌ফিক্ হাসিতে চটিয়াছিলেন ; বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দোষ দিব না, বেশ কর্‌বো। ছোটকর্ত্তার কথায় কাজে আমি দোষ দিব, তাতে কথা কয় কে ?"

সকলেই দাদাঠাকুরের এই অকারণ ক্রোধে মহা আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন ; দাদাঠাকুরের ক্রোধ বা ভ্রূকুটীভঙ্গী তাঁহাদের গা-সহা ছিল। বিশ্বাস মহাশয় তামাসা দেখিবার জন্য বলিলেন, "কেন, ছোটকর্ত্তা কি তোমার গোলাবাড়ীর রেয়েত, দাদাঠাকুর ?"

আর যায় কোথা ! দাদাঠাকুর তিড়বিড় করিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল বাক্যসুধা বর্ষিত হইতে লাগিল, কেহ আর তাঁহাকে থামাইয়া রাখিতে পারে না।

হঠাৎ সব গোল থামিয়া গেল। সকলেরই মুখে এক কথা, "চুপ, চুপ, ছোটকর্ত্তা আসছেন।" যথার্থই দর্পনারায়ণ আসিতেছেন ; সঙ্গে তিন চারি জন লোক, তাহাদের কাহারও হস্তে সাগুর ধামা, কাহারও হস্তে খইএর ধামা, কাহারও হস্তে মিছরির ধামা, কাহারও হস্তে ঔষধের ধামা। দর্পনারায়ণ আসিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন ও অপর সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। দাদাঠাকুরের রাগ কোথায় উড়িয়া গেল, দর্পনারায়ণকে দেখিয়াই তিনি একগাল হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন, "কই সাগু, খই, মিছরির ধামা দেখছি, চাল ডালের ধামা যে নাই ?"

দর্পনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে এবার কাহারও খাবার অভাব নাই ; সকলেরই

গোলায় ছুই চারিটি ধান আছে। আহা! প্রতি বৎসর আমাদের ঘরে ঘরে যদি এমনি সচ্ছল হ'ত!"

নাজীর গাজী বলিল, "কত্তামশাই, যা কয়েছো তা ঠিক। আঙ্গা তিন কুড়ি তিন বয়েস হলো, এ্যান ধারা ফসল মুই দেহিনি, এস্‌ছে অগ্রাণির ফসলডাতেও সোণা ফল্‌বে মনে হতিছে, তবে ঐ দেব্‌তা যদি না গোলযোগ করে।"

দর্পনারায়ণ বলিলেন, "সবই দেবতার হাত, নাজীরদা, সবই দেবতার হাত।"

দাদাঠাকুর এই সময়ে বলিলেন, "ওটাতে কি? ঔষধ বুঝি? কবিরাজি ত'?"

দর্পনারায়ণ বলিলেন, "কবিরাজি না ত' আর কি হবে, দাদাঠাকুর?"

দাদাঠাকুর। কবিরাজি ত' উৎকৃষ্ট। তবে তুমি যে আবার ঐ ছাই পাঁশ বিদিশী ঔষধ ধরেছ।

দর্পনারায়ণ। ধরলেম আবার কবে, দাদাঠাকুর? সেই পঞ্চমীর রাত্রে কবিরাজ মহাশয় এখানে ছিলেন না বলে ভজহরির জন্ত দেওয়ান কালীদত্তের নিকট থেকে বিদেশী ঔষধ আনতে বলেছিলাম।

দাদাঠাকুর। আমি তখনই নিষেধ করেছিলাম, ও পাপ ঘরে এনো না। ওতে ম্লেচ্ছের জল আছে ঐ ঔষধ খেলে জাত যাবে।

নরহরি এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে দাদাঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি, দাদাঠাকুর? আপনিই ত' ঐ ঔষধের কথা সেই রাত্রে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন; আমরা সেখানে এক ঘর লোক।"

দাদাঠাকুর। কে আমি? রাধামাধব! আমি ঐ ঔষধ আনতে বল্‌ব?

দর্পনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, "দাদাঠাকুর, নরহরি ঠিক কথাই বল্‌ছে। আপনি না বল্‌লে আমার মনেই হ'ত না।"

দাদাঠাকুর। কি বিপদ! আমি বল্‌ব ঐ ঔষধ আনতে, তাও আবার ঐ চণ্ডালের ঘর থেকে!

দর্পনারায়ণ। মনে নাই দাদাঠাকুর, আপনি নানা টোটকা জানেন ব'লে আমি আপনাকে ঔষধ দিতে বল্‌লাম, আপনি ভয় পেয়ে বল্লেন যে রোগী বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, টোটকা খাটবে না, দেওয়ানের কাছ থেকে বিদেশী ঔষধ এনে দাও, কি জানি, কি হয়।

দাদাঠাকুর। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হবে, তা হবে। কি জান বয়েস হয়েছে, সব কথা স্মরণ থাকে না, সব কথা স্মরণ থাকে না।

দর্পনারায়ণ। আমি নিজে ঐ ঔষধের পক্ষপাতী নহি, ব্যবহারও করি না, আমাদের গ্রামেও কেহ বোধ হয় করেন না। তবে আমি চূড়ামণি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে, ঔষধার্থে সুরাপানও শাস্ত্রোক্ত বিধি।

দাদাঠাকুর। হাঁ হাঁ, তাই বটে, তাই বটে।

দর্পনারায়ণ। যাক, নরহরি তোমার ভাই কেমন?

নরহরি। আজ্ঞে, একটু ভাল।

দর্পনারায়ণ। আহা বড় ভুগছে। নিরঞ্জন আজ দুদিন ভাল আছে, অন্ন পথ্য করেছে। যাবার সময় কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো।

নরহরি। আজ্ঞে, তাই করবো। কবিরাজ মহাশয় বল্‌ছিলেন, কিছু ভয় নেই।

দর্প। না, ভয়ের কোনও কারণ নাই, তবুও খুব সাবধানে রেখো, যেন কোন অত্যাচার না হয়। নাজীর দাদার খবর কি? আঁছিরদ্দী মিঞা কি মনে ক'রে? হারাণমণ্ডল যে?

নাজীর প্রথমেই কথা কহিল, বলিল, "এজ্ঞে, মোরা আলাম নারাণপুরির সেই জমীডার লেগে। ও গাঁর জমিদার যে বড় গোল বেধিয়েছে।"

দর্প। কেন গোল কিসের? জমী ত' আমাদের ফুলবাড়ীর সীমানার মধ্যে, তোমাদের ধানের আবাদের জন্য জমা দিয়েছি। এতে আর গোলযোগ কি?

নাজীর সকলের হইয়া কহিল, "এজ্ঞে, গোল ত' নেই, গোল বেধিয়েছে ঐ কাপালীর পো জমিদার। মোদের অদ্ধেক জমী ঘিরি লেছে, বলে,—এডা আঙ্গা জমী, ফসল বুন্‌তি—কাট্‌তি দিতিছি না।"

দর্প। বটে, জোর নাকি? কোম্পানীর মুল্লুকে জোর খাটবে না। তোমরা জমী চষো, ফসল বোনো, দেখি কি করতে পারে।

দর্পনারায়ণের বলিষ্ঠ দেহ যেন আরও স্ফীত হইয়া উঠিল, মুখ আরক্তিম হইল। সভাস্থ সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ নাজীর গাজী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এজ্ঞে, মোরা কেবল ঐ হকুমডো চাই। হুকুম পালি মোদের জমি কেড়ে লেয় কেডা? ও কাপালীর পোলার মুণ্ডুটা ছিঁড়ি ফেল্‌বো না? দুষমণের ছাওয়াল কত মার দুধ খেয়েছে, তান্‌লি একবার দেখে লিই!"

সকলেই নাজীরের কথায় নাজীরের সঙ্গে সঙ্গে "হুঁ" "হুঁ" করিয়া সায় দিল।

দর্পনারায়ণ হাসিয়া কহিলেন, "না না, নাজীর, ও সব কাজে যেয়ো না। আমি মারধোরের কথা বলি নাই। আগে ভাল ভাবে কাজ করে যাও, তাতে বাধা পাও, তখন দেখা যাবে। ও যদি অকারণে বিনা আগুনে লাঠি ধরে, আমরাও তখন পেছুপা হব না। যাক, আর কোনও কথা আছে?"

তখন এ জমীর সীমানা, ও জমীর চৌহদ্দী, এ জমীর ভাগাভাগি,

ও জমির বিলিবন্দোবস্ত, এ বিবাদের কথা, ও লাঠালাঠির কথা প্রভৃতি বহু বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিল। সেই গ্রাম্য পঞ্চায়েতে তাহার মীমাংসাও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল। সকলেই সন্তুষ্ট হইল। কথা শেষ হইলে উঠিবার সময় নাজীর গাজী বলিল, "এজ্ঞে, আর এড্ডা কোথা আছে। ও দেওয়ান দত্তোজা বড় জ্বেলিয়েছে, ওর জন্যি কি গরীব দুঃখীতি গাঁয়ে বাস করতি পারবে না?"

দর্প। কেন? কি হয়েছে?

নাজীর। সুম্মুন্দি কুঠীর লেঠেল সাথি করে গরীব দুঃখীর ঘরে ঘরে ঘুরতিছে আর ঐ ঝারে তারে কুঠীর গোলামী করতি বলতিছে।

দর্প। তা তোমরা না গেলেই পার।

নাজীর। এজ্ঞে, মোদের ত' কুঠীতি যাবার জন্যি কলাডা কেন্‌তেছে।

দর্প। বস্! তা হলেই ত' সব গোল চুকে গেল।

নাজীর। এজ্ঞে, ওরি মধ্যি চাড্ডিখানি কোথা আছে। লোক নেবার ছুতো করে গরিবির ঘরে ঢোকে আর তাদের বউ ঝিউড়ীর পানে নজরা মারে, কুটনীর হাতে দে পয়সা পেঠিয়ে দেয়। হাঃ তোর পয়সার কেথায় মুই আগুন দি। ওরে হারামখোর, তোর পয়সা কি মোদের সাথি কবরে যাবে? হ্যানধারা পয়সার মুয়ে মুতি দি!

দাদাঠাকুর এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "নাজীর ঠিক কথাই বল্‌ছে। বেটার বড় বাড় বেড়েছে। কুঠীর দেওয়ান বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। জানে না দর্পহারী মধুসূদন আছেন! চাটগাঁয়ের উমেশ দারোগারও অমনি বাড় বেড়েছিল, দুদিন গেল না।"

দর্প। দাদাঠাকুরের এত রাগ কেন?

দাদাঠাকুর। রাগ কেন? রাগ কি শুধু আমার? পূজোর গোল-

মালে এতদিন কথা চাপা ছিল তাই, না হলে শত মুখে কত কথা শুনতে পেতে ; বেটার দেওয়ানগিরি ঘুরে যেতো।

দর্প। বাস্তবিক আমি কিছুই জানি না। মেজখুড়ো, সেজখুড়ো, আপনারা শুনেছেন কি ?

দাদাঠাকুর সকলের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "শুনবে কি, চাক্ষুষ দেখেছে, চাক্ষুষ দেখেছে।" সকলে "না না" করিলেও দাদাঠাকুর কাহারও কথা শুনিতে দিলেন না, নিজে সকলের উপর ছাপাইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "বেটা পয়সার দেমাকে গাঁয়ে কাউকে গ্রাহ্য করে না। নিশুতির সময় ঝাঁ ঝাঁ রাত্রে পেয়াদা দীনু বোষ্টমের মেয়ের ঘরে ঢোকে। স্পর্দ্ধাটা একবার দেখ।"

দর্পনারায়ণ গ্রামের মণ্ডলদিগের মুখের পানে তাকাইয়া গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারা এ সব কথা শুনেছেন ? কি ব্যবস্থা করেছেন ?"

"শুনেছি বটে," "দেখিনি কিন্তু," "সত্যি মিথ্যে জানিনা," "তবে লোকে বলে বটে," "শাসন আবশ্যক,—" ইত্যাদি নানা রব উঠিল।

দাদাঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন, "শাসন বলে শাসন, ও দুবেটারই সমাজ বন্ধ কর, ধোপা নাপিত বন্ধ কর। জব্দ করা চাইই চাই।"

দর্পনারায়ণ। আজ বেলা হয়েছে। আজ ও কথার মীমাংসা হতে পারে না। এর পর একটা দিন স্থির করে দেওয়ান ও পেয়াদা উভয়কেই সংবাদ দিয়ে আনিয়ে পঞ্চায়েতে ইহার মীমাংসা করা যাবে। আপনারা কি বলেন ?

সকলেই দর্পনারায়ণের কথায় সম্মত হইলেন। সভা ভঙ্গ হইল, যে যাহার কাজে গেল ; কেবল গ্রামের ভদ্রমণ্ডলেরা শেষ তামাকু সেবন করিয়া উঠিবেন বলিয়া বসিয়া রহিলেন।

সকলেই গেল, অথচ নরহরি নড়ে না। দর্পনারায়ণ একটু আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি দাঁড়িয়ে রহিলে যে ?"

নরহরি। আজ্ঞে, আমার একটা নিবেদন আছে।

দর্প। কি নিবেদন বল।

"আজ্ঞে, আজ্ঞে",—নরহরি এই কথা বলিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ বিস্মিত হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। কেহই কিন্তু তাঁহার কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না। তখন দাদাঠাকুর নরহরিকে বলিলেন, "দেখ বেলা বাড়িতেছে, তোমার কি কথা আছে শীঘ্র বল। সকলেরই কাজ আছে। ছোট কর্ত্তার এখনও গোশালা অতিথিশালা দেখা হয় নাই, বাগান তদারক করা হয় নাই।"

দর্প। তা হ'ক। নরহরি, তোমার যদি কিছু বলিবার থাকে স্বচ্ছন্দে বল। আর যদি গোপনে আমার নিকট কিছু বক্তব্য থাকে, চল অন্যত্র যাই।

নর। "আজ্ঞে না, কথাটা এই স্থানে বলাই আবশ্যক। আপনারা আমাদের মা বাপ, আপনারা না রাখ্‌লে গরীব দুঃখীদের কে রাখবে, কর্ত্তা মশাই ?"—বলিয়া নরহরি হাপুসনয়নে কাঁদিয়া ফেলিল।

সকলেই বিস্মিত হইলেন। দর্পনারায়ণ স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "তোমার উপর কি কোনও অত্যাচার হয়েছে, নরহরি ? তোমার কোন চিন্তা নাই। সকল কথা খুলিয়া বল। গ্রামের এই কর্ত্তারা সব রয়েছেন, অত্যাচারের প্রতিকার অবশ্যই হবে।"

নরহরি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কর্ত্তামশাই, সব কথা বলতে ভয় হয়। কিন্তু না বলিলেও নয়, ঘরের ঝি বউএর উপর অত্যাচার হলে কি করে চুপ করে থাকি বলুন।"

সকলে চমকিত হইলেন। দর্পনারায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমকিত;

তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, দেহযষ্টি কাঁপিতে লাগিল ; উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ঝি বউএর উপর অত্যাচার ! কার এত বড় বুকের পাটা যে, গ্রামের মধ্যে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার করে ?" মেজকর্ত্তা, সেজকর্ত্তা, মিত্র মহাশয়, নকর্ত্তা প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন, "নরহরি, স্পষ্ট করিয়া সব বল, কার উপর অত্যাচার হয়েছে, কেই বা অত্যাচার করেছে, আর কবে অত্যাচার হয়েছে। তুমি বড় মুখ-চোরা মানুষ। কিন্তু এসব ব্যাপারে মুখ বুজে থাক্‌লে কাজ চলে না। তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি নিশ্চয় জেনো, যদি আমার পুত্রও দোষী হয়, তা হলেও বিচারে কোনও ক্রটী হবে না।"

নরহরি সহসা তাঁহার পদতলে পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যখন অভয় দিয়েছেন,তখন সকল কথাই বলিব। পূজার পূর্ব্বে এই অত্যাচার অনেকবার হয়েছে। আমি জানিতে পারি ষষ্ঠীর দিন। অত্যাচার হয়েছে হরিমতীর উপর, অত্যাচার করেছেন সেজকর্ত্তার ছেলে রমণদাদা।"

সকলে স্তম্ভিত। কাহারও মুখে কথা নাই। কেবল দাদাঠাকুর একবার বলিলেন, "কথাটা কেমন কেমন ঠেকছে। এতবার অত্যা-চার হ'লো, অথচ পূর্ব্বে জানান হলো না কেন ?"

নরহরি বলিল,, "তিনি অনেকবার হরিমতীর নিকট কুপ্রস্তাব করেন। পাগলের কথা বলিয়া হরিমতী প্রথম প্রথম হাসিয়া উড়াইয়া দিত। আপনারা সকলেই জানেন, হরিমতী বড়ই ঠাণ্ডা মেজাজের, গোলযোগ সে মোটেই ভাল বাসে না। তাই সে প্রথমে আমাদের জানায় নাই,—পাছে ঐ কথা নিয়ে একটা হাঙ্গামা হয়। পরে রমণদাদা বাড়াবাড়ি করিয়া তুলেন। এক দিন কাঁকফুলতলায় হরিমতীর হাত ধরেন।"

সেজকর্ত্তা পূর্ণচন্দ্র বসু অধোবদনে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর। দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন, "মেজো খুড়ো, সেজো খুড়ো, আপনারা সব শুনলেন। এখন কি করতে চান ?"

মেজ কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি কি করতে বল। এ সব ঘরের কথা, আপোষে মিটে গেলেই ভাল।"

দাদাঠাকুর যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহাই মিলিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "তা বৈ কি ? এর আবার বিচার কি ? ঘরের ছেলেরা যায় কোথা ? ছেলে বয়েস, রক্ত গরম, ওরকম ঠাট্টা তামাসা করেই থাকে, না হলে বাজারে যাবে নাকি ?"

দর্পনারায়ণ সক্রোধে বলিলেন, "দাদাঠাকুর !"

দাদাঠাকুর থতমত খাইয়া গেলেন, অপ্রতিভ হইয়া কথা সামলাইয়া লইতে গিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কি জান, নরহরিরই অন্যায়, এই তুচ্ছ কথা কর্ত্তাদের কাণে তোলা কেন ? গ্রামে বাস করতে গেলে ওরকম অত্যাচার একটু আধটু ইতর লোকের সহ্য করতে হয়। তার আবার নালিশ ফরিয়াদ কেন বাপু ?"

দর্পনারায়ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সক্রোধে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সেজ কর্ত্তা পূর্ণ বসু বাধা দিয়া নিজেই বলিয়া উঠিলেন, "কথা কইতে জাননা, কথা কও কেন, ঠাকুর ? ইতর ভদ্র কাকে বল ? ব্যবহারেই ইতর হয়, জাতে হয় না। দুঃখী হলেই তার কি ধর্ম্ম অধর্ম্ম, মান ইজ্জৎ, নাই ? ওরা আমাদের আশ্রয়ে এসে রয়েছে না ? ডাকাচ্ছি আমার সেই হতভাগা ছোঁড়াকে, এর বিচার না করে আজ জলগ্রহণ করবো না।"

তখনি রমণের তলব হইল। রমণ উপস্থিত হইলে তাহাকে ঘটনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হইল, সে কোনও জবাব না দিয়া ঘাড় হেঁট

করিয়া রহিল। পীড়াপীড়িতে সে অকপটে স্বীকার করিল, নরহরির কথাই সত্য।

তখন সেজকর্ত্তা পূর্ণচন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়েরা আমার এই হতভাগ্য পুত্রের প্রতি যে শাস্তিবিধান করিবেন, আমি তাহাই মানিতে বাধ্য।"

একজন বলিলেন, "এই সকল অপরাধের সামাজিক দণ্ড,—সকলের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করা ও পরে সমাজে এক বৎসর কাল সকলের সহিত বাক্যালাপে বঞ্চিত হওয়া। তোমার পুত্রের প্রতি সেই দণ্ড ব্যবস্থা করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য।"

পূর্ণচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, আপনারা এই কুলের কলঙ্ককে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিন। ও পাপ যেন এ গ্রামে আর কখনও কালামুখ না দেখাইতে পারে।"

সকলে নীরব। রমণের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। সে দারুণ দুঃখে ও অপমানে মৃতপ্রায়। নরহরি সকলই দেখিল। তাহার হৃদয় গলিয়া গেল; যোড়হাতে গদগদস্বরে বলিল, "ধর্ম্মাবতারেরা, ক্ষমা করুন। আপনাদের বিচারে গরীব দুঃখীরাও সুখী। রমণদাদার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। আপনারা আমার কথায় ক্ষান্ত দিন।"

দর্পনারায়ণ ধীরভাবে বলিলেন, "তা হয় না, নরহরি। শাস্তি কিছু ভোগ করতেই হবে। দোষ হলে শাস্তি আছেই।"

দাদাঠাকুর। দোষের ক্ষমাও আছে।

পূর্ণচন্দ্র। হাঁ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ষমা নাই।

তখন সকলে পূর্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া ধরিলেন, নির্ব্বাসন কালটা কমাইয়া দেওয়া হউক। স্বয়ং দর্পনারায়ণও সেই অনুরোধে যোগদান করিলেন। শেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর সাব্যস্ত হইল,

রমণ অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য মাতুলালয়ে থাকিবে, তাহার মধ্যে একবারও দেশে আসিতে অথবা পিতামাতা ভাই ভগিনীকে দেখিতে পাইবে না। সেইখানে তাহার চরিত্র সংশোধন হইবে।

কে এ রমণী ?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। গোপাল গোচারণের মাঠ হইতে ঘরে ফিরিয়াছে, এখনও গোক্ষুরোত্থিত ধূলিকণা বায়ুতাড়নায় ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। রজনীর আঁধার চারিদিক ঘিরিয়াছে। সেই আঁধারে শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিতেছে আর আঁধারও ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। শাদা শাদা ভাসা ভাসা মেঘ মেঘের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতেছে। আকাশের গায় অসংখ্য তারকা চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে সোণার কিরণ মিশাইয়া দিতেছে। ক্ষুদ্র খদ্যোতের ক্ষীণ আলোক ক্ষণেক বিকশিত, ক্ষণেক পরিম্লান হইতেছে। সান্ধ্যসমীরণে সেফালি রজনীগন্ধার মৃদুমধুর সুবাস ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঝিল্লীরবে বিশ্বব্যোম ছাইয়া গিয়াছে। বায়ু রহিয়া রহিয়া বৃক্ষের পত্রপল্লব আন্দোলিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। শান্ত পল্লীর শান্ত কৃষী-গৃহে রন্ধনের ধূম উঠিতেছে। হিন্দুর গৃহে গৃহে সন্ধ্যার মঙ্গল আরতি বন্দনা হইতেছে, পূত শঙ্খরবে দিঙমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের সন্ধ্যার আজান গান কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইতেছে। কি যেন একটা অব্যক্তমধুর শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্যভাবে দিক সকল ভরিয়া গিয়াছে।

সেই সান্ধ্যসমীরণে হঠাৎ অশ্বখুর-ধ্বনি শ্রুত হইল। কে এই সন্ধ্যালোকে অশ্বারোহণে সোনাদানার সদর পথে চলিয়াছে? ঐ যে

মূর্ত্তি অগ্রসর হইতেছে। এ কে, এ সাহেব না? হাঁ, সাহেবই বটে। সাহেবের একহস্তে অশ্ববল্গা, অপর হস্তে কশা। অশ্ব সাহেবের ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে, কদমে কদমে, পা ফেলিয়া চলিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের তরবারির ঝন্ ঝন্ শব্দে প্রকৃতির দারুণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। সাহেবের সুন্দর সুগৌর তনু বহুমূল্য রেশমী পরিচ্ছদে আবৃত; অঙ্গুলিতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়, বক্ষে মূল্যবান সোণার ঘড়ি ও চেইন, কটিদেশে বহুমূল্য প্রস্তরখচিত সোনার কোমরবন্ধ, আর কোমরবন্ধে দীর্ঘ তরবারি; জামার বোতামের স্বর্ণখণ্ডগুলির উপর উজ্জ্বল হীরক জ্বলিতেছে; কিংখাব ও মখমলে অশ্বের জীন মণ্ডিত; অশ্বের অঙ্গে মূল্যবান সাজ।

সাহেব কে বুঝিলেন? ইনিই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত পারকার সাহেব। অশ্ব নাচিতে নাচিতে মন্থরগমনে চলিয়াছে, সাহেব বলগা শ্লথ করিয়া দিয়া একমনে কি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন। সহেবের দৃষ্টি কখনও উদার অনন্ত নীল নভোমণ্ডলের দিকে, কখনও বা ক্ষেত্রপ্রান্তে শান্ত পল্লীর দিকে। দূরে গ্রামে শুভশঙ্খধ্বনি হইল, সাহেব চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তি আর হয় না। সাহেব ভাবিতেছেন, "আহা, কি সুন্দর শান্ত জীবন! কি সন্তোষ, কি তৃপ্তি! বাঙ্গালীর এই শান্ত পল্লীজীবন কি সুন্দর! দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নাই, জ্বালাময় ঘোর জীবন সংগ্রাম নাই; অল্পেই তুষ্টি, অল্পেই তৃপ্তি। রুষের জার কি করিতেছেন, ফরাশীর কত টাকা দেনা হইল, তুর্কী সুলতান কত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন—এ সকল ব্যাপার এই সরল পল্লীবাসীগণের অজ্ঞাত থাকুক, কিন্তু তাহাদের দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন-সংগ্রহের জন্য কাটাকাটি করিতে হয় না। বিলাসিতার পাপ-পঙ্কিল লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদিগকে জাল জুয়াচুরি, মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে হয় না। এই ত' স্বর্গের

শান্তি! ইহারা অর্থের কদর বুঝিতে চাহে না। সকলেরই ঘরে ঘরে ধান্যগোলা, সকলেরই ধানের গোলায় দুইচারিটী ধান্য; সকলেরই গোশালায় দুই চারিটি পয়স্বিনী গাভী; গোধন ও ধান্য ইহাদের সম্পত্তি। বিবাদ বিসম্বাদ, মামলা মোকদ্দমা ইহারা জানে না; গ্রামের পঞ্চায়েতই ইহাদের আদালত, মণ্ডলেরাই ইহাদের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট। ঐ ক্ষেত্রপ্রান্তে গ্রামের মধ্যে কৃষকের পর্ণশালা হইতে রন্ধনের ধূম উত্থিত হইতেছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর কৃষক ঘরে ফিরিয়া পুত্র পরিবারের মুখ দেখিয়া স্বর্গ-শান্তি উপভোগ করিতেছে, প্রাঙ্গণে বসিয়া বালক বালিকাদিগকে জগতে অতুল্য রামায়ণ মহাভারত হইতে কত সুন্দর উপদেশপূর্ণ গল্প শুনাইতেছে; গৃহিণী স্বহস্তে পাক করিয়া সকলকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতেছে; আহা সে শাকান্নে কত তৃপ্তি! গ্রামে সুরার স্রোত বহাইবার জন্য আমাদের দেশের মত সরাই নাই, শৌণ্ডিকালয় নাই, কৃষকেরও পশুত্বে পরিণত হইবার অবসর নাই। এই সরল পল্লীবাসীগণের ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব, ধর্ম্মই ইহকাল পরকাল। আহা! ইহাদের জন্মান্তরবাদে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস কি সুন্দর, কি শান্তিপ্রদ! জগতে ধার্ম্মিক সজ্জনের দুঃখ শোক, বিপদ আপদ কেন হয়, তাহা ইহাদের জন্মান্তর ও অদৃষ্টবাদে যেমন স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়া মনে শান্তি দেয়, এমন আর কিছুতে দেয় না। শুনিয়াছিলাম, India—a country of eternal dust and flies,—ভারত কেবল ধূলা ও মাছির দেশ; কিন্তু কৈ, আমি ত' তাহা দেখি না। আচ্ছা, country of eternal mist and rain,—কেবল কুয়াশা ও বৃষ্টির দেশ কি এদেশ থেকে ভাল? কি জানি। কে জানে, কেন এদেশ আমার বড় ভাল লাগে। মনের শান্তি এমন কোথাও মিলে না বলিয়া কি? হইতেও পারে। কিন্তু যতই হউক, সেই আমার হিমানীশীতলা তুষারধবলা জন্মভূমি! জন্মভূমি, জন্মভূমি,—

কি মাদকতা ঐ নামে! এমন মাটী কার হয়, এমন তরুলতা কার আছে, এমন পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কোথায় মিলে? ও হোঃ হোঃ! মেরি, মেরি, কোথায় কোন দেশে তুমি! ভগবান, কেন তুমি দরিদ্রকে এ অমূল্য ধন দিয়াও দিলে না! কোন দোষে, কি পাপে, মেরিকে হারালেম! সেই সরলা বালিকা আমাকে যে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিল। ও হোঃ হোঃ! এই মরুময় জীবনে আর কি কখনও শান্তি-প্রস্রবণ ফুটিবে না? না, না, ওসব চিন্তা আর করব না। ভুলে থাকব বলে এই নির্ব্বাসনে এসেছি। ভুলে থাকি, ভুলে থাকি, আমার সংস্কৃত ফার্সীর মধ্যে ডুবে থেকে সব ভুলে থাকি। কিন্তু পারি কৈ? শত চেষ্টাতেও ত' অন্তরের বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা দূর হয় না। ও হোঃ! কষ্টময় জীবন; এক একটী দিন ত' নয়, যেন এক একটী বৎসর। কলিকাতার স্বজাতি সমাজে মিশি না বলিয়া সকলে আমায় বিদ্রূপ করে, বিবাহযোগ্যা কন্যার মাতারা আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চায়, হৃদয়হীন বলে আমাকে গালি দেয়। কিন্তু কি করবো, উপায় কি? হৃদয়হীনের হৃদয় কোথায় যে, সে সেই হৃদয়ের পরিচয় দিবে?—কিও?"

হঠাৎ অশ্ব কর্ণ উত্তোলন করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, পার্শ্বে "লিও" ভয়ানক গুরুগম্ভীর চীৎকার করিয়া উঠিল। সাহেব প্রস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, অদূরে দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাহেবের চিন্তাস্রোত কোথায় ভাসিয়া গেল। সাহেব ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, মনুষ্য দুটী বলিষ্ঠ ও সশস্ত্র। দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "টুমরা কে আছে, কি চাহিটেছে, বাবা?" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাহেব পরিষ্কার বাঙ্গালা বলিতে পারিতেন, তাঁহার কথায় একটু বিদেশী ভঙ্গী ছিল মাত্র।

পূর্ব্বকথিত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন বলিল, "তোমাকেই চাই।" তাহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ।

সাহেব। হামাকে চাহিটেছে কেন ?

লোক। হুকুম।

সাহেব। হুকুম ? কাহার হুকুম আছে, বাবা। কোম্পানীর পঠ বাণ্ডো করিয়া ডাড়াইয়া আছে, সাজা পাইবে, টাহা জান ?

লোক। আমাদের সর্দ্দারের হুকুম। পথ বন্ধ করিয়াছি হুকুমে।

সাহেব। পিস্! কে টুমাদের সড্ডার ?

লোক। নাম শুনেছ, জীবন সর্দ্দার।

সাহেব। By Jove, the romance is going to prove a reality! Let me enjoy the fun a little longer. জীবোন সড্ডার ? সে ডাকু আছে। বোড়ো বাড় বাড়িয়াছে টাহার। শীঘ্রই টাহাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিটে হইবে।

লোক। সে সব আমরা জানি না। আমাদের হুকুম আমরা তামিল করিব। এখন ভাল মানুষের মত ঘোড়া হতে নাম।

সাহেব। (হাসিয়া) আচ্ছা, ও কোঠা পরে হইটেছে। কিণ্টু টোমাদের সড্ডারকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিটে হইটেছে।

লোক। সর্দ্দার ঝুলুক আর না ঝুলুক, আপাততঃ তুমি ত' ঝুল্‌বে চল।

সাহেব তখনও মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। রহস্য করিয়া বলিলেন, "সট্যই হামাকে যাইটে হইবে ?

লোক। (ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) সত্য না ত' কি মিথ্যা ?

সাহেব। না যাইলে হোবে না ? হামি যডি রূপেয়া ডিই ?

লোক। রাখ রাখ, তোমার টাকা দেখাতে হবে না। সর্দ্দার তোমার টাকা চায় না। তুমি আজ সকালে সর্দ্দারকে দেখতে

চেয়েছিলে, তাই সর্দ্দার তোমায় দেখা দেবে বলে এই বন্দোবস্ত কচ্ছে।

সাহেব। আচ্ছা এই আঙ্গটী, বোটাম, এই মোহরের থলিয়া?

লোক। দেখ, অত বক্‌তে পারি না, নাম্‌বে কিনা বল?

সাহেব। টেবে না যাইলে হোবে না? আচ্ছা যডি নাহি যাই?

লোক। তাহা হইলে জোর করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইব।

সাহেব। পিস্! জোর করিয়া লইয়া যাইবে? এঃ, কি বোলো?

লোক। "হাঁ এইরূপই ত' বলি! এখন নাম"—এই কথা বলিয়া সে অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিল।

সাহেব। টুমরা কয়জন আছে? এই ডুইজন? না, আর আছে?

লোক। "সে কথায় তোমার আবশ্যক কি? নাম বলছি"—বলিয়া সে সাহেবের হাত ধরিয়া টানিল।

সাহেব অবাক। এত সাহসী এদেশের লোক! সাহেবের হাত ধরিয়া টানে, বিশেষতঃ যখন সাহেব সশস্ত্র! সাহেব ক্ষিপ্রহস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "টুমাদের ডুই জনকে যডি এই চাবুক কসাইয়া হামি অশ্ব ছুটাইয়া ডিই, টুমরা হামার কি করিটে পার?"

লোকটা সাহেবের কথার কোনও উত্তর না দিয়া হঠাৎ মুখে বিকট হাঁকার দিল। অমনি চক্ষের নিমিষে পথিপার্শ্বের ধান্য-ক্ষেত্রের মধ্য হইতে কালান্তক যমের মত ন্যূনাধিক একশত সশস্ত্র মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইয়া পথের উপর সাহেবের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি আপন মনে বলিলেন, "By all the holy saints! it is becoming rather serious!" পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাল, টুমাদের বহুট লোক আছে জানিলাম। কিণ্টু হামার নিকটে টরবারি ঠাকিটে টুমরা কি করিটে পারিবে?"

বলিতে বলিতে সাহেব তরবারি কোষমুক্ত করিয়া অশ্ব চালনা করিয়া দিলেন। সুশিক্ষিত অশ্ব প্রভুর ইঙ্গিতে এক লম্ফে সম্মুখের পথ-রোধকারী দস্যুদিগকে অতিক্রম করিল। কিন্তু অগ্রসর হওয়া বৃথা; দস্যুদিগকে চমকিত করিয়া দুই একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই অশ্ব পথে কোনও বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল, সাহেব অশ্বপৃষ্ঠ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন, সাহেবের হস্ত হইতে তরবারিও খসিয়া পড়িল। সাহেব সামান্য আঘাত পাইলেন, চেতনা হারাইলেন না। ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতেই পাঁচ সাত জন দস্যু তাঁহাকে ধরিল। সাহেব ডাকিলেন, "লিও, লিও।" এতক্ষণ দস্যুদিগের সহিত রহস্য আলাপে মগ্ন থাকিয়া সাহেব কুকুরের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

"আর লিও", প্রথম দস্যু সাহেবের কথা শুনিয়াই হাসিয়া বলিল, "আর লিও, লিও কি আর আছে, সে হাত পা মুখ বাঁধা পড়িয়া আছে, তোমার সহিস ও বরকন্দাজদেরও ঐ অবস্থা।"

সাহেব উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "ডেখো, হামাকে যাহা খুসি কর, উহাডের কিছু বলিও না, উহারা হামার নোকর মাট্র।"

দস্যু বলিল, "আচ্ছা, সে যুক্তি ঠাওরাবো পরে, এখন চল।"

সাহেব। "ডেখো, হামাকে অট্যাচার করিটেছে, বিপড ঘটিবে।"

দস্যু একজন সহচরকে সাহেবের অশ্ব ধরিতে ইঙ্গিত করিল। পরে সে বলিল, "আমাদের ভাবনা তোমার কেন, সাহেব? আমাদের উপায় আমরা করিব।"

সাহেব। আচ্ছা, ডেখা যাইবে, এখন হামার কুকুরটীকে হামার নিকট ডেও, সহিস ও বারকণ্ডাজ ছোড়িয়ে ডেও। বেচারা কি অপরাঢ করিলো!

লোক। "তোমাকে যতক্ষণ না আমাদের আড্ডায় লইয়া যাইব,

ততক্ষণ এক প্রাণীকেও ছাড়িব না; তোমার কুকুরকে ত' নয়ই। হারামজাদ আমাদের দুই তিনটা লোককে কামড়াইয়া ঘায়েল করিয়াছে। ফাঁসিকলে শালাকে জব্দ করিতে হইয়াছে, এখনি সাবাড় করিয়া দিতেছি।" পরে সে একজনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "এই, নিয়ে আয় কুকুরটাকে।"

"লিও" আনীত হইল। এতক্ষণ ধান্যক্ষেত্রমধ্যে তাহাকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। সাহেব দেখিলেন, যথার্থই তাহার হাত পা মুখ বাঁধা, সে মৃতপ্রায়, শ্বাস ফেলিতেও তাহার কষ্ট হইতেছে। সাহেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "ডেখো, হামি টুমাকে বহুট রূপেয়া ডিবে, টুমারা লিওকে ছোড়িয়ে ডেও।"

লোকটা নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া বলিল, "এই যে ছাড়িতেছি।"

সাহেব। আচ্ছা, টুমারা রূপেয়া নাহি লইবে, ডয়া করিয়া উহাকে ছোড়িয়ে ডেও।

লোক। দয়া! হাঃ হাঃ হাঃ, ডাকাতের আবার দয়া! ডাকাতের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে কেন? ডাকাতের সঙ্গে দেখা করতে গেলে অমন কত সইতে হয়, ডাকাতের সঙ্গে দেখা, সহজ কথা?

সাহেব। আচ্ছা, ছোড়িয়ে না ডিবে, মুখের বাঁঢন খুলিয়ে ডেও। পণ্ডজাটি, উহার প্রাণ হাঁপাইটেছে!

লোক। ইস্, গোপাল আমার এলেন যে! জবাই কর শালার কুকুরকে।

সাহেব। মারিওনা, মারিওনা। বড় ভাল কুত্তা আছে। হামি প্রাণ চাহিটেছে, যেটো রূপেয়া মাঙ্গো ডিবে।

সাহেব কথা কহিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দলপতির ইঙ্গিতে একজন দস্যু তীক্ষ্ণ বর্শাফলক উদ্যত করিয়া তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় লিওকে হত্যা করিতে যাইতেছে। সাহেব তখন

ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Don't touch him, or I will shoot you like a Dog."

সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই লিওর পৃষ্ঠে এক ঘা বর্শার আঘাত পড়িল। লিও যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল, মুখ বাঁধা, তাই চীৎকার করিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে "দুড়ুম" করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। যে লোকটা কুকুরকে মারিয়াছিল, সেও অমনি পদে আহত হইয়া 'মাগো' বলিয়া ভূতলশায়ী হইল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তখনও সাহেবের হাতে পিস্তল ও তাঁহার চারিদিকে ধূমে আচ্ছন্ন। সাহেবের চারিদিকে ডাকাতে ঘিরিয়াছে, সাহেব কোন্ তর্কে পিস্তল বাহির করিয়া গুলি ছুড়িয়াছেন, তাহা কেহ দেখিতেও পায় নাই। কিছুক্ষণ সকলে নির্ব্বাক নিষ্কম্প হইয়া ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব কুকুরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। বহুজনে সাহেবকে ধরিতে গেল। সাহেব পিস্তল লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে সাহেবের হাতে সজোরে লাঠি পড়িল, পিস্তল হাত হইতে খসিয়া পড়িল। অমনি বিশ ত্রিশ জন লোক সাহেবকে আক্রমণ করিল, সাহেব ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন জন দস্যুও পড়িয়া গেল। তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অনেক লাঠি ও সড়কী উত্থিত হইয়াছে; মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবে। সাহেব দেখিলেন, তাঁহার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত; স্বদেশ জন্মভূমির কথা মনে পড়িল, প্রেমময়ী মেরির মধুর পবিত্র মুখমণ্ডল মনে পড়িল, সাহেব চক্ষু মুদিয়া ভগবানকে ডাকিলেন।

অকস্মাৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় কোথা হইতে কি হইয়া গেল; যে, যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় রহিল; উত্থিত কৃপাণকরে সেই নরঘাতক দস্যুরা চিত্রপুত্তলীবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বুঝি ভগবান মুখ তুলিয়া

চাহিলেন। সাহেব চক্ষু মুদিয়া ভগবানের নাম লইতেছেন, সহসা শুনিলেন, দস্যুদলপতি সাশ্চর্য্যে বলিতেছে, "একি মা বৈষ্ণবী, তুমি এখানে কেন?"

সাহেব উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন, দেখিলেন তাঁহারই সম্মুখে অপরূপ মূর্ত্তি! সেই কুন্দেন্দুধবল সুন্দর শরতের স্নিগ্ধ স্ফুট চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! আগুলফলম্বিত অবেণীসংবদ্ধ নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশিতে রমণীর স্কন্ধ বাহুমূল ও অংসদেশ আচ্ছন্ন, নীল নীরদের অভ্যন্তর হইতে ঈষদুন্মুক্ত চন্দ্রকলার ন্যায় অযত্নরক্ষিত কেশরাশির মধ্যে সুন্দর মুখখানি ঈষৎ প্রকাশিত, নীলোৎপল আঁখি-যুগল বিস্ময়-বিস্ফারিত—দীপ্তিতে দিব্য জ্যোতি লাঞ্ছিত, রক্তরাগ রঞ্জিত অধরোষ্ঠ কোপে ঈষদুদ্ভিন্ন, তন্মধ্যে দশনপাতি মুক্তাপাতির ন্যায় সুসজ্জিত, মৃণাল বাহুযুগল পীনোন্নত উরসে পরস্পর সংবদ্ধ; সর্ব্বাঙ্গে যৌবন-লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে, স্বর্গের সুষমা অঙ্গে অঙ্গে ক্ষরিতেছে। রমণী নিরাভরণা; তাহার সুন্দর দেহলতা শুদ্ধ গৈরিক মণ্ডিত, গলদেশে পবিত্র রুদ্রাক্ষমালা বিলম্বিত। অলৌকিক সৌন্দর্য্য! কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যে—সেই মাধুর্য্যে কত গাম্ভীর্য্য, কত দার্ঢ্য, কত স্থৈর্য্য! সেই স্থান, সেই কাল, সেই দিব্য সৌন্দর্য্য, সাহেব স্তম্ভিত হইলেন; ভাবিলেন, ভারত রমণী এত সুন্দরী!

রমণী দয়া-কোমলতা-জড়িত মধুর দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দলপতিকে অতি কোমল মধুরস্বরে বলিল, "ছি বাপ, নিরীহ বিদেশী পথিকের উপর এ অত্যাচার কেন।"

পূর্ব্বোক্ত লোক কহিল "কি করব মা, এই আমাদের হুকুম।"

রমণী। "নির্দ্দোষ সাধু পরোপকারী সাহেবের প্রাণ নিলে কি ধর্ম্মে সইবে, বাপ?" রমণীর কণ্ঠস্বর বাষ্পজড়িত হইয়া আসিল।

লোক। মা, ডাকাতি করতে গেলে অত দয়া চলে না।

রমণী। তোমাদের উপর কি হুকুম ছিল ?

লোক। সাহেবকে ধরে নিয়ে যেতে।

রমণী। বেশ, তবে তোমরা সাহেবকে প্রাণে মারছ কেন ? এও কি তোমাদের উপর হুকুম ?

লোক। (অপ্রতিভ হইয়া) না, ঠিক সে হুকুম নাই। তবে সাহেব আমাদের লোককে গুলি করেছে, তাই তাকে মারতে গিয়েছিলাম।

রমণী। তা হলে তুমি নিজের ইচ্ছামত হুকুম-ছাড়া কাজ করেছো ? যা হোক, আমার একটা কথা রাখ, সাহেবকে ছেড়ে দাও।

লোক। 'সে কি মা, ছেড়ে দিব কি ? ছেড়ে দিবার শক্তি আমার নাই।

রমণী। আছে বৈ কি ; না হলে তোমায় অনুরোধ করবো কেন, বাপ ? দাও, সাহেবকে ছেড়ে দাও।

লোক। কার হুকুমে ছাড়বো, মা !

রমণী। আমার হুকুমে।

ঐ কি এ দেবীপ্রতিমা ! মহামহিমাময়ী মূর্ত্তিমতী শক্তি ! চক্ষে কি ভাস্বর দীপ্তি, মুখে কি দৃঢ়সঙ্কল্পতার চিহ্ন ! কি এক অভিনব গৌরব-রাগে রমণীর মুখমণ্ডল রঞ্জিত। রমণীর দেহ যেন শতগুণ স্ফীত।

লোক। তার পর মা, আমার দশা ?

রমণী। ভয় কি বাপ, নিরীহের উপকার করলে পরকালে অক্ষয় পুণ্য হবে।

লোক। পরকাল কি, আমরা জানিনা। ছেড়ে দিলে বেগ সামলাবে কে মা ?

রমণী। ভূতনাথ, কার সঙ্গে কথা কহিতেছ জান ?

লোক। জানি বৈ কি মা। না হলে আমার উপর হুকুম চালায় কে মা?

রমণী। আমার কথা রাখ, সাহেবকে ছেড়ে দাও। পরে কি হবে, ভেবো না। জেনো, তোমাদের মা আছে।

ভূতনাথ। মা! মা!

কোথায় মা? চকিতে চমকিয়া ক্ষণপ্রভা মেঘান্তরালে লুকাইল, নিমিষে সেই বিদ্যুৎবরণী মোহিনী প্রতিমা ধান্যক্ষেত্রে অদৃশ্য হইয়া গেল; সকলে এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব বিস্ময়ে আত্মহারা। কে এ রমণী? মূর্ত্তিমতী করুণা ক্ষণেকের তরে হৃদয়ভরা করুণা বিলাইয়া কোথায় লুকাইল? কোথায়, কোন দেশে এ ফুল ফুটে, ফুটিয়া সৌরভে দিক আমোদিত করে?

হঠাৎ সাহেবের মোহ ভঙ্গ হইল; এই মুহুর্ত্তপূর্ব্বে কর্ণে বীণা ঝঙ্কৃত হইতেছিল, এখন সাহেব শুনিলেন, অতি কর্কশ কঠোরস্বরে দস্যুদলপতি ভূতনাথ বলিতেছে, "সাহেব, ওঠ; ঘোড়ায় চড়ে যথা ইচ্ছা যাও। মা তোমায় বাঁচালেন।"

সাহেব। কে আছে ঐ সুণ্ডরী ডয়াময়ী?

ভূতনাথ। আমাদের মা।

সাহেব। টুমাডের মা, হামারও মা।

ভূতনাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ, উনি সকলেরই মা। এমনই দয়ায় উনি সারা লোকটা বশ করেছে। এখন ওঠ, ঘোড়ায় চড়।"

সাহেব। লিও?

ভূতনাথ। কুকুরকেও ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার কুকুরের কিছুই হয়নি, তুমি মিথ্যে আমার লোক জখম করেছ।

সাহেব। হামার কুকুরকে মারিয়া ফেলিবে, হামি কিছু বলিবে

না? টুমার লোককে চোট লাগিয়াছে কি? আহা, বেচারাকে ডেখিটে পাইবে কি?

ভূতনাথ। না সাহেব।

"টেবে এই রূপেয়া টাহাকে ডান করিবে, সে ভালো চিকিট্‌সা করিবে"—সাহেব এই কথা বলিয়া ২টী মোহর তাহার হাতে দিতে

ভূতনাথ। না, সাহেব! ওটী হবে না। তোমার কাছে একটী কড়াও নিতে নিষেধ আছে।

সাহেব। টেবে টুমরা হামাকে ডেকাটি করিলে কেন?

ভূতনাথ। আগেই বলেছি, সর্দ্দারকে দেখতে চেয়েছিলে বলে, সর্দ্দার তোমায় এই নিমন্ত্রন্ন করেছিল।

সাহেব। Wonderful robber!

ভূতনাথ। এই তোমার ঘোড়া, এই তোমার বজ্জাত কুকুর, আমরা হাত পা খুলে দিয়েছি, তুমি মুখ খুলে নাও। দেখ, আঁচড়ও লাগে নি। আমার লোক আমার ইসারায় তোমায় ভয় দেখাবার জন্য মিছামিছি মাটীতে বর্শার খোঁচা মেরেছিল।

সাহেব লিওর মুখবন্ধন খুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "টেবে হামি কেন বেচারিকে শাষ্টি ডিল?"

ভূতনাথ বলিল, "ঐ তোমার সহিস ঘোড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে; বরকন্দাজেরাও বাঁধন খোলা পেয়েছে, তারা ফকিরহাটে অপেক্ষা করছে। এখন যেথা ইচ্ছা চলে যাও, আমাদের কাছে তোমার আর কোনও ভয় নেই। একটা কথা বলে যাই, জীবন সর্দ্দারকে আর কখনও দেখতে চেওনা, তার সম্পর্কেও থেকো না। যে তার অনিষ্ট করে না, যে তার সম্পর্কে থাকে না, যে গরীবের উপর অত্যাচার করে না, জীবন সর্দ্দার কখনও তার অনিষ্ট করে না।"

ডাকাত এই কথা বলিয়া সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় সঙ্কেত করিল। দেখিতে দেখিতে সে অনুচরবর্গের সহিত ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে লুকাইয়া গেল।

সাহেব সেইদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। লিও তাঁহার পদতলে শুইয়া হাঁপাইতেছে, সাহেব তাহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিতেছেন, সহিস অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃতি নীরব। জ্যোস্না ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। সাহেব ভাবিতেছেন, "কে ঐ আশ্চর্য্য রমণী? বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবী কে? ফিরিয়া আসিয়া একবার বৈষ্ণবীর সন্ধান লইব।"

সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল, লিও এবং সহিস প্রভুর অনুসরণ করিল। ফকিরহাটের বাজারে বরকন্দাজেরা মিলিত হইলে, সাহেব বারাসত অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দাদাঠাকুরের আস্তানা।

এই মাত্র এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শরতের বর্ষণ-লঘু মেঘে গর্জ্জনই সার; তাই ঝড়ের বেগই অধিক অনুভূত হইয়াছে, বৃষ্টি সামান্য; তাহাতেই কিন্তু গাছপালা ভিজিয়াছে, খানা খন্দ অল্প ভরিয়াছে। ঝড় এখনও সোঁ সোঁ হাঁকিতেছে। গোধূলির আলো আঁধারে আর্দ্র-গাত্রে গোপাল গোচরণের মাঠ হইতে ঘরে ফিরিতেছে; রাখাল মনের আনন্দে মুক্তকণ্ঠে খোলামাঠে গান ধরিয়াছে, "আমি ব্রজের গুল্ম লতা হব, ব্রজবাসীর চরণধূলা পাব, আমার এ দেহ লুটাবে ব্রজধামে (ওহে হরি)।" গাছের পাতায়, রাঙ্গচিতার বেড়ায়, এখনও টুপ টুপ বৃষ্টির জল ঝরিতেছে, দুই এক ফোঁটা জল রাঙ্গচিতার পাতার উপর মুক্তার

ন্যায় শোভা পাইতেছে, তরুশাখায় পক্ষী পক্ষবিধুনন করিয়া গায়ের জল ঝাড়িতেছে, দুই একটা গ্রাম্য কুকুর গোষ্পদে সঞ্চিত জল চকচক করিয়া পান করিতেছে, আর মনুষ্যের পদশব্দ শুনিলেই পলাইয়া যাইতেছে। সারা গ্রামময় কেমন একটা আদ্র মৃত্তিকার সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দাদাঠাকুর মাতৃস্বসার কুটীরের দাওয়ায় কম্বলাসনে বসিয়া নারিকেলের নুটী পাকাইতেছেন ও মনে মনে গুণ গুণ করিয়া গান ধরিয়াছেন। এইমাত্র তিনি অপরাহ্লের মৌতাত চড়াইয়াছেন, নেশার অল্প অল্প আমেজে তাই মাঝে মাঝে ঝিমাইতেছেন। বৃদ্ধা মাসী ঘরে চরকা কাটিতেছেন ও বিড় বিড় করিয়া বকিতেছেন। ঝড়বৃষ্টি আসিল, দাদাঠাকুরের গানের সুরও চড়িল। ঝড়ের বেগে জলের ঝাপ্টায় তিনি ও তাঁহার কম্বলাসন যে অল্পবিস্তর ভিজিয়া যাইতেছেন, মাসী যে বার বার তাঁহাকে ঘরের ভিতরে আসিতে বলিতেছেন, দাদাঠাকুরের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি নুটীই পাকাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছেন,—

শ্যামা আমার নাকি দেখতে কাল,
এলোকেশীর রূপে ভুবন আলো॥
রূপে যোগীশ্বর হল সন্ন্যাসী,
ভোলা দিগম্বর শ্মশানবাসী,
(সে যে) বব বম বলে, হাড়মাল গলে
নেচে বেড়ায় হয়ে ভাঙ্গড় পাগল॥
রাঙ্গা চরণতলে, কত সুধাক্ষরে—
আঁখি আছে যার চিন্তে সেই পারে,
(সে যে) রূপ-সিন্ধু অঙ্গে, খেলিছে তরঙ্গে
তার তত্ত্ব অন্ধ বুঝিবে কি বল॥

নুটী পাকান হইল, গান শেষ হইল, বৃষ্টিও থামিল। ঝড় কিন্তু সমানে বহিতেছে। দাদাঠাকুর ডাকিলেন, "মাসী, বলি চকমকিটা কোথায় রাখলে ?"

মাসী বাহিরে আসিয়া চকমকি গুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "হাঁরে অভয়, এমনই করে কি চিরকালটা কাটাবি ?"

দাদা। কেন বল দেখি ?

মাসী। কখনও ত' কিছু করতে হল না। বামুনের ছেলে, না শিখলি লেখাপড়া, না শিখলি পূজো আচ্ছা। বাপ পিতমোর বেহ্মোত্তরটুকুও বসে বসে বেচে খেলি। না কল্লি বিয়ে, না কল্লি সংসার, বংশে জলপিণ্ডি দেবার এক রত্তিও রইল না।

মাসী চক্ষে অঞ্চল দিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিলেন। একে ঝড়ের কোঁ কোঁ শব্দ, তাহাতে অহিফেনের মৌতাত, সব কথা দাদাঠাকুরের কাণে পৌঁছিল না। দাদাঠাকুর তখন চকমকি ঠুকিয়া নুটী ধরাইবার চেষ্টা করিতেছেন, যতবার চেষ্টা করেন, বায়ু ততবারই অন্তরায় হয়। দাদাঠাকুর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এদিকে মাসীর সুর আরও চড়িল, "দেখ্, আমার তিন কুলে কেউ নেই, তোকে নিয়ে আমি সব শোক জ্বালা ভুলে আছি। তা তুই যদি মানুষ হতিস, তাহলেও দুঃখু ঘুচ্ত।"

দাদাঠাকুর একে চটিয়াছিলেন, তাহার উপর মাসীর কথাটা এবার শুনিতে পাইয়াছিলেন, আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না; সক্রোধে বলিলেন, "বুড়ো হলে ভীমরতি হয়। উনি আমায় দেখছেন কচিখোকা! মাসী, এদিকে যে তোমার খোকার আড়াই কুড়ী পেরুলো! এখনও মানুষ করবার আশা আছে নাকি ?"

মাসী। (নাকিসুরে) ওমা বলে কিগো, সেদিনকার ছেলে, কোলে

পিঠে মানুষ বল্লুম। কেন, ভীমরতি হবে কেন, শত্রুর হোক্। আমি তোকে খোকা দেখব না ত' দেখবে কেরে অভয় ?"

দাদা। (স্বগতঃ) কথাটা বড় মিথ্যে বলে নি। ভীমরতি হবে কেন ? বুড়ীর তিনকুড়ী দশ পেরুলো, এখনও চরকা কাটে, কলসী কলসী জল তুলে আনে, রাঁধে বাড়ে, ধান সিদ্ধ করে, চোখে বেশ দেখে, কাণে বেশ শোনে। আমায় ছোঁড়ারাই বুড়ো করে তুলেছে। কেন আমার কি চুল পেকেছে, না দাঁত পড়েছে ? ছোটকর্ত্তাও ত' দুকুড়ী পেরিয়েছে, কিন্তু কেমন জোয়ান! আড়াই কুড়ীতে বুড়ো হতে গেলেম কেন ? আড়াই কুড়ীতে বুড়ো গাঁয়ের কে কবে হয়েছে ?"

মাসী। তুই যদি না দেখবি ত' কে দেখবে বল্ বাবা! আমার যা একটু খুঁদ কুঁড়ো আছে, সবই ত' তোর। ধান কটা উঠোনে পড়ে ভিজছে, কতদিন বলছি সেনের পোকে ডেকে ওকটা বেচে ফেল। আবার নতুন ধানের সময় এলো, কোথায় রাখবি বলদিকি ? এ আর তোর হয়ে উঠলো না। একটা কাজ কর।

দাদা। ও কথাটী বোলো না মাসী। কাজ আবার আমি করি না ? জলপড়া, ঝাড়ফুক, ভূতঝাড়া, ডানঝাড়া, টোটকা টুটকী— গাঁয়ে এসব করে কে ? আমি কাজ করি না ? ঐ যে গয়লা বৌ বলৃত, "গতর খেটে হলেম সারা, নাম তবু কুড়ের সেরা"—এও দেখছি তাই।

মাসী। না বাপু, তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বল্। যাই, দেবতা ধরেছে, একবার ছিধরদের বাড়ী যাই, কাঁথা কখানা থপ করে দিয়ে আসিগে।

দাদা। ও মাসী, মাসী!

মাসী। ও মা, পা না বাড়াতেই ডাকলি। হ্যারে অভয়, তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কি কোনও কালে হবে না ?

দাদা। না। সন্ধ্যাটা দিয়ে যাবে না?

মাসী। ওমা, বলে কি গো, এখনও যে বেলা রয়েছে গা।

দাদা। সাধে কি বলি ভীমরতি হয়েছে! সন্ধ্যাটা দিয়ে যাও।

মাসী সন্ধ্যা দিয়া শ্রীধরদের বাটীর দিকে গেলেন। দাদাঠাকুরও নুটী ধরাইয়া তামাকু সাজিলেন। একে আফিমের ঝিমঝিমে নেশা, তাহার উপর ফুড়ুক ফুড়ুক গুড়ুকের টান, দাদাঠাকুরের মন তখন আর দেহে নাই, কোথায় কোন কল্পনারাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে হুঁকা সমেত ঢুলিতে ঢুলিতে প্রায় পড়িয়া যাইতেছেন, আর তখনই মনটা দেহে ক্ষণেকের তরে দেখা দিতেছে ও তাঁহাকে সামাল করিয়া দিতেছে। দাদাঠাকুর কখনও রাজা উজীর মারিতেছেন, কখনও স্বয়ং রাজা হইয়া হুকুম চালাইতেছেন, শাসন করিতেছেন। কখনও মনে হইল, দীনু বষ্টমের মেয়েটা তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদা কাটা করিতেছে, তার সেই ভাসা ভাসা টানা চোখ বেয়ে জল ঝরছে, ফুলের মত মুখখানা কাতরতা জানাচ্ছে, কচি কচি হাত দুখানা ক্ষমা চাইছে। আজ রাজা অভয়চন্দ্র সেই অনামুখো কেলে দত্তোর কোতলের হুকুম দিয়েছেন। কেলে দত্তোর কেলে হাঁড়ীর মত মুখখানা কান্নার জলে ভেসে যাচ্ছে, যেন তার সারা মুখে আলকাতরা গড়াচ্ছে। কেলে দত্ত জানু পেতে যোড়হাতে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছে, "দোহাই হুজুর, কোতল করবেন না, তা হলে আর প্রাণে বাঁচবো না, আমার পরিবার রাঁড় হবে। আপনি যা চান, তাই দিব।" রাজা চোখ রাঙ্গিয়ে গোঁফে তা দিয়ে ভয়ঙ্কর ভয় দেখিয়ে বলছেন, "নচ্ছার বেটা, কোতল কি, তোকে জবাই করবো জানিস না? জবাই কি, হেঁটে কাটা ওপরে কাঁটা দিয়ে কবর দেবো। হাড়হাভাতে বেটা, কোতল করবে না, কোতল করবে না,—একবার, দুবার, দুশোবার কোতল। এই কে আছিস, বাঁধ বেটাকে।" কেলে দত্ত বিষম ভয়

পেয়ে বল্‌লে, "দোহাই ধর্ম্মাবতার, মারবেন না, মারবেন না। অর্দ্ধেক রাজত্ব আর অর্দ্ধেক রাজকন্যা দিব।" রাজা তখন মূর্ত্তিমান আগুনের মত রেগে বল্লেন, "কোথায় তোর অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা?" কেলে দত্ত জবাব দিলে, "আজ্ঞে মহারাজ, দেওয়ানী ক'রে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেছি, তার অর্দ্ধেক আমার, আর অর্দ্ধেক আপনার; আর ঐ, বুঝলেন কিনা,—ঐ তারাটীও অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক আপনার হল।" রাজা পিলে-চম্‌কান ধমক দিয়ে বল্লেন, "কি ঘুষ, দরিয়ামে বিগ্‌ দেও।"

সশব্দে হুঁকা পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চহাস্যের রোল উঠিল। দাদাঠাকুর চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার তন্দ্রা কাটিল। দাদাঠাকুর সবিস্ময়ে দেখিলেন, গ্রামের যুবকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে, কেহ কেহ ভূপতিত কলিকার আগুন কুড়াইতেছে, সকলেই দাদাঠাকুরের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। কখন কোন তর্কে তাহারা আস্তানায় প্রবেশ করিয়াছে ও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, দাদাঠাকুর বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই, ফেল ফেল নেত্রে কেবল তাকাইয়া রহিলেন।

রামনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "খুব ত' দরিয়ামে বিগ্‌ দিচ্ছিলে, ঠাকুর। বলি, দরিয়ামে বিগ্‌ দেওটা কি? ওকথা বলে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?"

দাদাঠাকুর। (সাশ্চর্য্যে) সেকি, আমি ওকথা বলে চেঁচিয়ে উঠেছি?

সকলে। হাঁ, হাঁ, তুমি।

দাদা। কই বাবা, কিছুইত মনে পড়ে না।

নিরঞ্জন। তা পড়বে কেন?

দাদা। হবে, সব কথা মনে থাকে না, ভাই।

রামনাথ। বুড়ো হয়েছো কিনা।

দাদা। কে বলেরে আমি বুড়ো? আমার দাঁত পড়েছে, না চুল পেকেছে, না লাঠি ধরে চলি? বুড়ো হয়েছে, বুড়ো হয়েছে, ছোঁড়াদের ঐ এক বুলী!

নির। না দাদা তুমি বুড়ো হতে গেলে কেন, ওরা তোমায় খেপাচ্ছে।

দাদা। রামা, তোরা আজ পড়্‌তে বসলিনি?

রাম। না, আজ মৌলভী সাহেব ছুটী দিয়েছেন। দাদাঠাকুর, আজ আমরা বোম ভোলা হব, ছুটী পেয়েছি।

দাদা। তা হবি এখন। ঐ নে তামাক বাঁশের চোঙ্গ থেকে, নুটী পাকিয়ে রেখেছি, চকমকি ঠুকে ধাঁ করে ধরিয়ে নে, নিয়ে খা। আমি থপ করে সন্ধ্যাটা সেরে নিই।

রাম। এঁ্যা, এখনও সন্ধ্যা হয় নি? আমরা ত' বহুক্ষণ করেছি। তা দাদা, তামাক সাজ্জি, কিন্তু বোমভোলার প্রসাদটা দিতে হবে।

দাদাঠাকুর কৃত্রিম কোপে বলিলেন, "কবে পাস্‌নিরে, ছুঁচো ছোঁড়ারা? নে, ঐ চালের বাতায় পাতায় মোড়া প্রসাদ আছে, পেড়ে নে, ঐ কোণে শীল নোড়া আছে, পেড়ে বাট। আমি আহ্নিকটা সারি।"

দাদাঠাকুর এই কথা বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাধব ভট্টাচার্য্যের পুত্র শূলপাণি শীল নোড়া লইয়া সিদ্ধি বাটিতে বসিল, রামনাথ তামাক সাজিতে লাগিল। নিরঞ্জন বলিল, "শীঘ্র সেরে নাও দাদাঠাকুর, তোমার দরিয়ামে বিগ দেও কি, বলতে হবে, ওটী আমি ভুলছি না।" দাদাঠাকুর ঘরের মধ্য হইতে উত্তর দিলেন, "হুঁ"। ছেলেরা তামাক টানিল, সিদ্ধি বাটিল।

দাদাঠাকুরের আহ্নিক সারা হইল, তিনি দাওয়ায় আসিয়াই

জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁরে নিরে! তোর বিয়ের সম্বন্ধের কি হলো? গাঁয়ে কবে যে ধূমধাম লাগে, তাই দিন গুণছি।"

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলিল, "ওতে ভুলছি না, দাদাঠাকুর? দরিয়ামে বিগ দেও কি, বলতেই হবে।"

দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, "আরে ও একটা মজার গল্প; ও সেই ঢাকায় থাকি যখন, তখনকার ঘটনা।"

সকলে। বটে, বটে।

দাদাঠাকুর। হাঁ, বলছি শোন। তামাকটা দে দেখি। ছোঁড়াদের কাছে কল্কে পাবার যো আছে কি? দে, একটান খাই। দেখ, ঢাকায় শিবুদাদের বাড়ীর কাছে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ ছিল। ঐ গাছ-তলায় তক্তপোষ পেতে তার উপর সতরঞ্চি বিছিয়ে হাকিম সাহেবের এজলাস বসত। হাকিম সাহেব তাকিয়া ঠেস দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে ফরসীর নলে তামাক টানতে টানতে এজলাস করতেন। লোকলস্করেরা তাঁকে বাতাস করত, মাছি তাড়াত, গা হাত পা টিপে দিত, পাছে মোকদ্দমা কত্তে গিয়ে হাকিম সাহেবের শ্রম হয়! হাকিম সাহেব বড় কড়া হাকিম। তাঁর কাছে বড় সোজা-সুজি বিচার। কোন গোল নাই, ওজন দরে বিচার বিক্রী হত।

নিরঞ্জন (সাশ্চর্য্যে) সে কি রকম?

দাদা। শোন্ না বল্‌ছি। বিচারে বস্‌লেই হাকিম সাহেবের নিদ্রা আসত, বন্ধুবান্ধবে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "গবেষণা করে দেখছি, কোন পক্ষের কথা ঠিক।" দুপক্ষের আর্জ্জী দাখিল হলে পেসকার কাণে কাণে বলতেন, কোন পক্ষ "দমে ভারি"। পেসকার দমে ভারি দলকে হাকিম সাহেবের নজরানা দেবার কথা বলে দিতেন। নজরানা দিবার সময়ে কিন্তু হাকিম সাহেব মহা গরমে বলতেন, "কি, নজর? দরিয়ামে বিগ্ দেও।"

সকলে উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল। সকলে বুঝিল, দাদাঠাকুর অহিফেনের নেশায় এতক্ষণ হাকিমি খেয়াল দেখিতেছিলেন। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসিল, "হাকিম নজর নিতেন, তবে দরিয়ায় ফেলে দেওয়াটা আবার কি ?"

দাদা। আরে সে বড় মজা। হাকিম সাহেবের তক্তপোষের দুইপার্শ্বে দুইটা বড় গামলা বোঝাই জল থাকত। "দরিয়ামে বিক্ দেও" বল্‌লেই লোকে বুঝত ঐ গামলার "দরিয়ায়" নজরানা ফেলে দিতে বলা হচ্ছে। যে যা নজরানা আনত, হাকিম সাহেবের আজ্ঞা শুনেই ঝুপঝাপ "দরিয়ায়" ফেলত।

আবার একটা উচ্চহাস্যের রোল উঠিল। কি সরল উদার প্রাণ-খোলা হাসি! বাঙ্গালীর সে হাসি আর শুনিতে পাই না কেন!

হাসি থামিলে দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁরে মাধবের পুণ্যি, তোর কি প্রসাদ বাটা শেষ হবে না ? সেই সন্ধ্যা হতে লেগেছিস্ যে।" মাধব ভট্টাচার্য্যের পুত্র শূলপাণিকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলা হইয়াছিল। শূলপাণি সিদ্ধি বাটিতে বাটিতে হাসিয়া বলিল, "খেয়াল দেখছ নাকি দাদাঠাকুর, সন্ধ্যা ত' এই হল। তবে আবার 'সন্ধ্যা হতে' কি ? এই নাও না, বাটা হয়েছে।" দাদাঠাকুরের নিকটে সিদ্ধি আনীত হইল।

সেই সময়ে মাসীও বকিতে বকিতে ঘরে ফিরিলেন। গৃহে গ্রামের যুবকবৃন্দকে দেখিয়া মাসীর বকুনি থামিল। মাসী মহা খুসি, একগাল হাসিয়া কহিলেন, "এঁ্যা, তোরা এসেছিস্, বেশ বেশ। বোস্ বাপেরা সব, গোটা দিয়ে তেলমুড়ী মেখে দি, কাঁঠালবিচি ভেজে দি, কাঁচা লঙ্কা দি, নারিকেল-নাড়ু দি, সব বসে বসে খা বাপেরা আমার, বাদলের দিন গপ্প সপ্প কর।" দাদাঠাকুর বলিলেন, "সে হবে তখন, এক কলসী জল আর দু ঘটী দাও দেখি, বাবার

প্রসাদ খাই।" "তা খা না, তা খা না, বাপেরা সব"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ঘরে গিয়া সব যোগাড় করিয়া দিলেন।

নিরঞ্জন বলিল, "বামুন মাসী, কই আমাদের মুড়ী নাড়ু কই?"

মাসী। "এই যে বাবা দিচ্ছি এনে। খানা বাবা, তোরাই ত' খাবি। আমার আর কে আছে বল—"

"সর্ব্বনাশ! সেরেছে আর কি! আবার খেই ধরলে। দাও, দাও, ছেলেদের খেতে দাও। খাওয়াবার ঘটাটা দেখেছো, নিরু? মাসী আমার খাইয়ে খাইয়েই ফতুর"—বলিয়া দাদাঠাকুর হাসিয়া উঠিলেন।

নিরঞ্জন। দাদা, এর চেয়ে মিষ্টি খাবার জগতে কি আছে বল দেখি? একে ত' জিনিষ ভাল, তার উপর বুড়ীর আদর।

বুড়ী তখন ঘরের মধ্যে ছেলেদের খাবার যোগাড়ে ব্যস্ত। আহা বুড়ীর তাহাতে কত আনন্দ! পল্লীবৃদ্ধারা খাওয়াইতে পরাইতে, টোটকা টুটকি ঔষধ দিয়া লোককে নীরোগ করিতে, ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজা-আচ্ছা সম্পন্ন করিতে, রোগীর সেবা অতিথিসেবা করিতে, লোকের বাড়ীর কাজকর্ম্ম বুক দিয়া উদ্ধার করিতে যেমন সিদ্ধহস্ত, এমন আর কে?

দাদাঠাকুর বাটা সিদ্ধির তাল হাতে লইয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "সাধে কি তোকে বলি,—মাধবের পুণ্যি? এমনি বেটেছিস যে, খিঁচ রয়েছে। আমি যখন ওষুধ বাটি, তখন খিঁচের নাম থাকে না।"

শূলপাণি। তোমার যে অভ্যাস, দাদা। শেয়ালে কামড়ান, কুকুরে কামড়ান, সাপে কাটা, ভূতে ধরা, পেঁচোয় পাওয়া, শূয়ারের গুঁতো ষাঁড়ের খোঁচা—ওষুধ তোমার কিসের নাই? রোজ বেটে বেটে হাতের কেরামতি বেড়েছে।

দাদাঠাকুর। নে নে, এই দাদাঠাকুরের কখানা হাড় আছে বলেই গাঁ শুদ্ধু তরে গেলি, আবার নাক নেড়ে কথা কস্। ঐ যে চাঁটগাঁর ঘাসী মিঞা বলত—

নিরু। থাক দাদাঠাকুর, আর ঘাসী মিঞাতে কাজ নাই। এদিকে মুড়ী এসেছে। এস, বসা যাক্।

দাদাঠাকুর। হাঁরে নিরে, তোর বের কথাটা চাপা দিলি? বলি, আমাদের বল্‌লে কি সত্যিই তোর টুকটুকে বৌটীকে কেড়ে নেবো?

মাসী নিরুর বউএর কথা শুনিতে পাইয়াই ঘরের বাহিরে আসিলেন। বুড়ীর মুখে আর হাসি ধরে না; মনের দুরন্ত আহ্লাদ তিনি আর চাপিয়া রাখিতে পারেন না; নিরু কত যেন আপনার। হাসিয়া বলিলেন, "নিরুর আমার বউ হবে, যেমন ফুটফুটে বরটী, তেমনি টুকটুকে কনেটীও হবে। সেদিনকার নারাণ গো, সে দিনকার নারাণ; নেংটা হয়ে ধুপ ধুপ করে কাঁকফুল তলার বালির গাদায় খেলে বেড়াতো, গাছে চড়ত, নৌকোয় বাচ খেলে বেড়াত, আমার বাগানে নেবু চুরি করে খেতো। সেই নারাণের ছেলের বে! ওমা যাই কম্‌নে! রাখালীর সেই কোলের ছেলেটা সেদিন যায় যায়, সেই যেবার ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে যেতে নাগল, সেই সেবারে সাঁঝের বেলা আমরা ননদে ভেজে খিড়কীর পুকুরে যাচ্ছি—"

মাসীর মুখের কথা মুখেই রহিল, হঠাৎ অতি ব্যস্তভাবে বাহিরে কে ডাকিল, "দাদাঠাকুর ঘরে আছেন কি?" সকলে চমকিত হইয়া উঠিল। দাদাঠাকুর বলিলেন, "কে গা?" বাহির হইতে জবাব আসিল, "আজ্ঞে, আমি দীননাথ।" দীননাথ ভিতরে আসিল। সকলেরই মুখে বিস্ময়চিহ্ন। দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন, "দীনু, তুমি কি মনে করে? বস, তামাক খাও।"

দীনু। আজ্ঞে না, বসবার অবকাশ নাই। বড় বিপদে পড়ে এসেছি। আপনাকে যেতে হবে।

দাদা। বিপদ! আমাকে নিয়ে যাবে! ব্যাপার কি?

দীনু। ব্যাপার বড় সোজা নহে। আমার পরিবারের বড় অসুখ। আঁতুড়ে পোয়াতি, সকাল থেকেই জ্বর আর কাঁপুনি ধরেছে। এখন বড় বাড়াবাড়ি, কেবল চেতনা যাচ্ছে, দাঁতে দাঁত লাগছে,—হাত—পা কেমন কচ্ছে, আর কাঁদছে। লোকে বলছে, অপদেবতার নজর লেগেছে। ঠাকুরমশাই, এ দায় থেকে বাঁচান" দীনু তাঁহার দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দাদাঠাকুর ত্রস্তে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "আরে, ছেলে মানুষ কোথাকার। ভয় কি, ওরকম ঢের হয়। ও সেরে যাবে এখন। চল যাই, দেখি গিয়ে।" ছেলের পালও তাঁহার সঙ্গে উঠিল। দীনু চোখের জল মুছিয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে চলিল, দাদাঠাকুর "হাঁ না" করিয়া সায় দিতে লাগিলেন। সকলে দীনুর বাটীর দিকে চলিল।

ভূতের ওঝা।

দণ্ডীরহাট গ্রামের ও সোনাদানার সরকারি পথের মাঝে ষষ্ঠীতলার মাঠ। মাঠের উত্তরে গ্রাম, দক্ষিণে পথ। গ্রামের শেষ সীমানায় ঠিক মাঠের গায়ে দীননাথের পর্ণকুটীর। কুটীরের চারিপার্শ্বেই গাছ গাছলা ডালপালা ছড়াইয়া রজনীর আঁধারে ভূতের মত দণ্ডায়মান। অল্প বেগে বায়ু বহিলেই বংশকুঞ্জ কোঁ কোঁ ক্রন্দনে গভীর নিশীথে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করে, দীর্ঘ ঝাউ সোঁ সোঁ হো হো শব্দে যন্ত্রণাময় প্রেতজীবনের মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ হাহুতাশের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস

ফেলিয়া প্রাণে উদাস-ভাব আনয়ন করে, বিশাল বিরাট তিন্তিড়ীবৃক্ষের উচ্চ শাখে নিরানন্দ পেচকের গম্ভীর "ভূত ভুতুম" ধ্বনি কি এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলের মনকে ভয়ে বিষাদে পরিপূরিত করে, মাঝে মাঝে মাচাল পক্ষীর শিশুর ন্যায় বিকট ট্যাঁ ট্যাঁ ক্রন্দন অতি বড় সাহসীকেও চমকিত করিয়া দেয়। সেই গাছপালার আঁধারে আবৃত অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন কুটীরের দক্ষিণে ধূ ধূ মাঠ, নিকটে দুই এক ঘর কাওরা ব্যতীত আর কাহারও বসতি নাই। এই গ্রামপ্রান্তস্থিত কুটীরকে নিশীথে প্রেতের লীলাভূমি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাসের একটী কারণও ছিল।

দীননাথ বাস করিবার পূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে পতনে এক গ্রামবাসীর ঐ স্থানে মৃত্যু হয়; তাহার নাম ভুবন। ভুবনেরা জাতিতে তাঁতি। ভুবন একদিন ঠিক দ্বিপ্রহরে তেঁতুল পাড়িতে গাছে উঠে। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে বহুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া ভুবন বড়ই ক্লান্ত ও তৃষাতুর হইয়া পড়ে। ভুবন খুব উচ্চ ডালে দাঁড়াইয়া "জল, জল মা, বড় তৃষ্ণা" বলিয়া মাকে ডাকে। ভুবনের মাতা ঘর হইতে জল আনিতেছে, এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, গৃহস্থ সকলেই চমকিত হইয়া বৃক্ষতলে ছুটিল! সেখানে সকলে যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইল। দেখিল, বৃক্ষতলে ভুবনের প্রাণহীন দেহ ভূপতিত! বহু উচ্চ হইতে পতনে দেহ ভয়ঙ্কর বিকৃত, সহজেই ভীতিপ্রদ। সেই অবস্থায় গ্রামের যে কেহ ভুবনকে দেখিয়াছিল, সে আর তাহার সেই কাতরতাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, উৎক্ষিপ্ত আঁখিযুগল ও লম্বীকৃত দেহ ভুলিতে পারে নাই। ভুবনের ভগ্ন-হৃদয়া জননী সেই দিনেই গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে চাহিল, অনেক করিয়া তাহাকে কিছু দিনের জন্য নিরস্ত করিয়া রাখা হইল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তথায় বাস করা দায় হইয়া উঠিল; কারণ রাত্রে সে পথে হাঁটিলেই লোকে শুনিতে পাইত,

তেঁতুল গাছের ডালে কে যেন করুণ কাতরকণ্ঠে বলিতেছে, "জল, জল মা, বড় তৃষ্ণা"! বাটীর লোকে সভয়ে দেখিত, যেন কে রাত্রে তেঁতুল-তলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর কাতরকণ্ঠে বলিতেছে, "জল, জল মা, বড় তৃষ্ণা!" এক দিন ব্যাপার চরমে চড়িল। ভুবনের মাতা রাত্রিতে রাঁধিতেছে, এমন সময় স্পষ্ট শুনিল, রান্নাঘরের বাহিরে কে যেন তীব্র যাতনাজড়িত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছে, "উঃ, মা!" সেই স্বরে হতভাগিনী জননী অপঘাতে মৃত সন্তানের কণ্ঠস্বর অনুভব করিল। অমনি সে চমকিয়া জাফরীর ভিতর দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল, দিব্য জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া তাহার মৃত সন্তান ভুবন! অতি বিকৃত দেহ তাহার, অতি কাতর—অতি যন্ত্রণাব্যঞ্জক দৃষ্টি তাহার;—সে মর্ম্মভেদী যাতনার তাড়নায় জাফরীর দুই পার্শ্বে দুই হাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেছে, "জল, জল মা, বড় তৃষ্ণা!" ভুবনের জননী আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

পর দিনই ভুবনের পিতাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে হইল। দণ্ডীরহাটেই তাহার শ্বশুরালয়। সে প্রথমে সপরিবারে শ্বশুরালয়ে উঠিয়া গেল, পরে সুবিধামত অন্যত্র ঘর বাঁধিয়া বাস করিল। স্ত্রীর তাড়নায় সে পূর্ব্বের ভিটা বিক্রয়ের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু গ্রামের কেহ সেই "ভূতের বাটী" ক্রয় করিতে সাহসী হইল না। অবশেষে দীননাথ অধিকারী ঐ বাগান ও কুটীর ক্রয় করিয়া ঐ স্থানে বাস করিল। বাস করিবার পর এযাবৎ দীননাথ অথবা তাহার পরিবারস্থ কেহ তথায় ভয় পাইয়াছিল কিনা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও দীননাথ তাহা কাহাকেও বলিত না।

দীননাথের সেই নির্জ্জন কুটীরে আজ কিন্তু মানুষের মেলা। সন্ধ্যা হইতে দলে দলে,কাতারে কাতারে,পল্লীবাসী তথায় সমবেত হইতেছে।

স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা,—সকলেই আসিতেছে, কুটীরের অঙ্গন ভরিয়া গিয়াছে। ব্যাপার কি? কেন এত লোক-সমাবেশ? সকলেরই মুখে কেমন একটা ভয়বিস্ময়জড়িত আগ্রহচিহ্ন। কিসের জন্য?

দীননাথের আজ বড়ই বিপদ। তাহার স্ত্রী আজ চার দিন হইল একটী মৃতসন্তান প্রসব করিয়াছে। সেই অবধিই সে অসুস্থ। আজ প্রাতঃকাল হইতে তাহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ; সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, ভয় পাইতেছে, মূর্চ্ছা যাইতেছে, মিছামিছি কাঁদিতেছে, কখনও বা হাসিতেছে, কখনও গান গাহিতেছে। সে স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা; কিন্তু আজ তাহার লজ্জা কোথায় পলাইয়াছে; গুরুজনের সাক্ষাতেও সে লজ্জাহীনার ন্যায় আচরণ করিতেছে। দীননাথ যতক্ষণ সম্ভব, কথা গোপনে রাখিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, প্রসবের সময় দুর্ঘটনার জন্য তাহার সহধর্ম্মিণীর এই চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে, অচিরেই সে আরোগ্য-লাভ করিবে। কিন্তু সে যাহা ভাবিল, হইল তাহার বিপরীত। যত বেলা বাড়ে, রোগও তত প্রবল হয়; শেষে অপরাহ্নে ব্যাপার চরমে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন ঝড়বৃষ্টি হয়, তখন রোগিণী বড় অস্থির হইয়া পড়িল; সে ক্রমাগত নখে ভূমি-কর্ষণ করিতে লাগিল, দাঁতে দাঁত লাগাইতে লাগিল, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিতে লাগিল, ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল, মুহুর্মুহু হাসিতে কাঁদিতে লাগিল, বহু মৃত ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল ও তাহাদের অতীত জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিল। একে সারা দিন অনাহার, তাহে প্রসবের পর দুর্ব্বলতা, আবার তাহার উপর সারাদিন সেই যোঝাযুঝি,—অবলা রমণী কতক্ষণ সহিতে পারে? সে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার শরীরে তখনও এমন বল যে, দীননাথ ও তাহার যুবতী কন্যা তারা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। শেষে এত বাড়াবাড়ি হইল যে, দীননাথ ভাবিল, হয় ত' এইরূপে

আত্মহত্যাও সংঘটিত হইতে পারে। সে তখন নিরুপায় হইয়া প্রতিবেশী কাওরাদের ডাকিল; তাহারা আসিলে দীননাথ তারাকে তাহার মায়ের নিকট বসিতে বলিয়া দৌড়িয়া ছোটকর্ত্তার বাড়ী খবর দিতে গেল। ছোটকর্ত্তা ও অন্যান্য অনেক গ্রাম্য ভদ্রব্যক্তি দীননাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা দাদাঠাকুরকে ডাকিতে বলিলেন। ক্রমে কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। অনেকে কৌতুহলান্বিত হইয়া দীননাথের বাটীতে আসিল। অঙ্গন লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল।

দাদাঠাকুর সদলবলে উপস্থিত হইলে চারিদিকেই একটা রব উঠিল, "এই যে দাদাঠাকুর, এই যে দাদাঠাকুর!" সকলে তাঁহার পথ করিয়া দিল, কেহ কেহ বলিল, "দাদাঠাকুর এসেছেন. আর ভয় নাই।" দাদাঠাকুর গ্রামভারি গম্ভীরচালে বলিলেন, "একি, এত ভিড় কেন? আঁতুড়ের সম্মুখ থেকে সকলে সরে যাও।" সকলে সরিয়া গেল। দাদাঠাকুর তখন রোগিণীকে উঠাইয়া বসাইতে বলিলেন। রোগিণী মূর্চ্ছা গিয়াছে, তাহাকে উত্তোলন করে কাহার সাধ্য!

দাওয়ার গায়ে উঠানেই খেজুরপাতার ঘর বাঁধা হইয়াছে, সেই ঘরই সূতিকা-গৃহ। বৃষ্টির জলে উঠান ভিজিয়াছে, ঝড়ে খেজুর-পাতা দুই এক খানা সরিয়া গিয়াছে; সূতিকা-গৃহ একরূপ অনাচ্ছাদিত ও আর্দ্র। রোগিণী সেই অনাবৃত আর্দ্র সূতিকাগৃহে ছিন্ন মলিন কন্থায় মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, কন্যা তারা মায়ের দেহ বেষ্টন করিয়া নতমুখে পার্শ্বে বসিয়া আছে। ঘরে একটী প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

দাদাঠাকুর ভিড় সরাইয়া দিয়া সূতিকাগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোগিণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য একখানি জলচৌকি ও কুশাসন আনীত হইল। চৌকির উপর আসন সংস্থাপিত

হইলে দাদাঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও ক্ষণেকের তরে একদৃষ্টে সূতিকাগৃহের মধ্যে তাকাইয়া রহিলেন। সে সময়ে তাঁহার দৃষ্টি রোগিণীর উপর কি তাহার কন্যার উপর ছিল,তাহা বলা বড় কঠিন ; কিন্তু তারা তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া গায়ের কাপড় টানিয়া জড়সড় হইয়া বসিল ও তাঁহার প্রতি কেমন এক প্রকার তেজোব্যঞ্জক কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দাদাঠাকুর দৃষ্টি অবনমিত করিয়া রোগিণীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্নগুলি তারাকেই করা হইল। তারা নীরবে গম্ভীরমূর্ত্তিতে বসিয়া রহিল, কোনও কথার উত্তর দিল না। দীননাথই ছলছলচক্ষে সকল কথার জবাব দিতে লাগিল। দাদাঠাকুর জবাবগুলি সব শুনিয়াছিলেন কিনা জানি না, কেন না তিনি তখন অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন, "উঃ! ছুঁড়ীর গুমর দেখ! রূপের তেজে মটমট কচ্ছেন। আবার ছোঁড়ারা বলে—মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে আছে ; তাদের মাথার সঙ্গে মিশিয়ে আছে! বাবারে, টানাটানা ডেবডেবে চোখে যে আগুন জ্বালিয়ে চেয়েছিল, ভাবলাম বুঝি পুড়িয়েই মারে। আরে মলো, মার এমন অসুখ, একটু কান্না নাই, ভাবনা নাই, কেমন গম্ভীর হয়ে বসে আছে। ছোট-লোকের ঘরে এমন ত' দেখি নি,—যেন সোনার ডালে আম ফলেছে। শুনেছি আবার লেখাপড়া জানে, রামায়ণ মহাভারত পড়ে। কোত্থেকে শিখলে? বাপ! বসে আছে দেখ, যেন রাজরাণী! রূপের ঠেকারেই গেলেন। ও রূপ কদ্দিন?"

রোগীর অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা হইল। দাদাঠাকুর বলিলেন, "কোনও চিন্তা নাই, এখনি আরাম হবে। এখন যে যে দ্রব্যগুলি বলি, সংগ্রহ কর দেখি।" দ্রব্যের তালিকা বড় বেশী নহে। যব, তিল, পুষ্প, দূর্ব্বা, সর্ষপ, গঙ্গোদক, তাম্র, তুলসী, কাঁচা দুগ্ধ, ঘৃত,

সশিষ নারিকেল, খড়ি, কড়ি, সম্মার্জ্জনী, পূর্ণকুম্ভ, শীল, নোড়া, লৌহ, আর আটখানি কাঁচা সরা।

দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল, কেবল কাঁচা সরা ক'খানা আনিবার নিমিত্ত কুমার-বাটী লোক ছুটিল। দাদাঠাকুর অঙ্গনের মধ্যে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তিন হস্ত পরিমিত ভূমি মাপিয়া খড়ি দিয়া দাগিয়া লইলেন ও সেই স্থানটা গোময় সাহায্যে পরিষ্কার করাইয়া গঙ্গোদক সিঞ্চিত করিয়া পবিত্র করিলেন; তাম্রকুণ্ডে গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র রাখিয়া পুষ্প দূর্ব্বা দিয়া নানা মন্ত্রসাহায্যে পূজা করিতে লাগিলেন; বহুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিলেন। এই সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইলে পর দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন, "তুলারাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখানে এমন কে কে আছে?" অমনি দুই তিন জন পল্লীবাসী অগ্রসর হইল। দাদাঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা দুই জনে দীননাথের অনুমতি লইয়া প্রসূতিকে সূতিকাগার হইতে বাহিরে এই গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন কর। সরা আনিয়াছে কি?"

দাদাঠাকুরের নিকট সরা আনীত হইল। দাদাঠাকুর কাঁচা দুগ্ধে প্রত্যেক সরা তিনবার ধৌত করিয়া গঙ্গাজল ছিটাইয়া কয়েকটা অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। পাঁড়িখানিও ঐরূপে ধৌত ও পবিত্র করা হইল। তাহার পর দাদাঠাকুর সেই গণ্ডীর মধ্যস্থলে যব ও তিল ছড়াইয়া চারি কোণে চারিটী সশিষ নারিকেল সংরক্ষিত করিয়া মধ্যস্থলে একখানি সরা পাতিলেন; সেই সরার উপর আর একখানি সরা উপুড় করিয়া রাখা হইল; এইরূপ পর পর আটখানি সরা সজ্জিত করিয়া তাহার উপর পাঁড়িখানি বসান হইল। দাদাঠাকুর তখন তাহার উপর গঙ্গাজল ছড়াইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

সকলে অবাক হইয়া দেখিতেছে। এদিকে দাদাঠাকুরের মনোনীত দুইজন গ্রামবাসী দীননাথের অনুমতি লইয়া প্রসূতিকে ধরিয়া বাহিরে

আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে তখন মূর্চ্ছাভঙ্গান্তে উঠিয়া বসিয়াছে এবং ক্রমাগত "না, যাবো না, না, যাব না" বলিয়া কাঁদিতেছে ও বল প্রকাশ করিতেছে। প্রসবের পর অনাহারে অনিদ্রায় তাহার দুর্ব্বল হইবারই কথা, কিন্তু গ্রামবাসী যুবক দুইটী তাহাকে তুলিতে গিয়া দেখিল, তাহার শরীরে অসুরের শক্তি! তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহিরে আনিতে তাহারা উভয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া গেল। দাদাঠাকুর এদিকে ক্রমাগত মন্ত্র পড়িতেছেন। প্রসূতি আসে না দেখিয়া তিনি এক মুঠা সর্ষপ লইয়া সূতিকাগারের দিকে ছুড়িয়া মারিলেন। অমনি প্রসূতি ছটফট করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা রে, মা রে, মারিস না রে!" দাদাঠাকুর অমনি বলিলেন, "আয়, শীঘ্র বাহিরে আয়, না হলে আবার মারিব।" প্রসূতি সুড় সুড় করিয়া বাহিরে আসিল; সে কেবল কাঁপিতেছে ও "উঁ উঁ" করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া কেহ অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

দাদাঠাকুরের কিন্তু দয়া মায়া নাই। তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, "এঃ, নেকাম রাখ, ভাণ করে কাঁদতে বস্‌লো, ও সব নেকামো দূর করে দিচ্ছি দাঁড়া।" সে আরও কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল ও দাদাঠাকুরের দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। দাদাঠাকুরের আদেশে তাহাকে সজ্জীকৃত সরার উপর স্থাপিত পীঁড়িতে বসান হইল। তখন দাদাঠাকুর তাহার চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার উপর সর্ষপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! সেই পীঁড়ির উপর উপবিষ্টা প্রসূতির দেহভারে কাঁচা সরা কোথাও কণামাত্র ভগ্ন হইল না, অধিকন্তু মন্ত্রগুণে পীঁড়ি প্রসূতিকে লইয়া বায়ুবেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; মন্ত্রও যত উচ্চারিত হয়, পীঁড়িও তত ঘোরে, সে ঘোরার আর বিরাম নাই। প্রসূতির নড়িবার চলিবার ক্ষমতা নাই, সে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত বসিয়া

ঘুরিতেছে, আর ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে। তাহার কাতর চিৎকার শুনিয়া তাহার কন্যা তারা তাহাকে ধরিতে গেল। দাদাঠাকুর বাধা দিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ওটী হচ্ছে না গো তারাসুন্দরী, ওটী হচ্ছে না। এখন মায়ের উপর দরদ না দেখিয়ে দেওয়ানজীর ওখানে সময় কাটালে হত না ?"

তারার মুখ চক্ষু লাল হইয়া উঠিল ; তাহার সেই বিশাল আয়ত নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, দেহযষ্টি থর থর কাঁপিয়া উঠিল। দাদাঠাকুর সে দৃষ্টির প্রখরতা সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু আপনা হইতেই অবনমিত হইয়া পড়িল। দর্পনারায়ণ এতক্ষণ চুপ করিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, এই কথা শুনিয়া তিনি আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দাদাঠাকুর, যাহা করিতে আসিয়াছেন, তাহাই করিয়া যান। আপনার অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যক কি ?"

যেন জলৌকার মুখে লবণ নিক্ষিপ্ত হইল। দাদাঠাকুর আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "না, না, বলিতেছিলাম কি, এখন রোগিণীর নিকট কেহ যাইতে কিম্বা রোগিণীকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। রোগিণীরই মঙ্গলের জন্য তাহার আপনার লোকদিগকে স্থানান্তরে যাইতে বলিতেছিলাম।"

আবার ঝাড় ফুঁক আরম্ভ হইল। দাদাঠাকুরের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রোগিণী পীড়ির উপর ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, আর সর্ষপ বর্ষণে "বাপ রে, মা রে, যাই রে, আর করবো না রে," বলিয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিতে লাগিল।

কিছু পরে দাদাঠাকুর তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোর যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিতেছি। কিন্তু তুই আগে বল, তুই কে, কেন ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিস ?"

রোগিণী। (কাঁদিয়া) ওগো বলছি গো, আগে ঘুরণ থামাও।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা, এই থামাইলাম, এখন বল্, তুই কে?

রোগিণী। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

দাদাঠাকুর। নষ্টামি করিতেছিস?

রোগিণী। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।

"তবে দেখবি?" দাদাঠাকুর এই কথা বলিয়া দুই চারিটা সর্ষপ লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন।

রোগিণী। না না, তোমার পায়ে পড়ি, আর মেরো না। কি বলতে হবে বল।

দাদাঠাকুর। কে তুই?

রোগিণী। আমি ভুবন।

সকলে শিহরিয়া উঠিল।

দাদাঠাকুর। একে আশ্রয় করিয়াছিস কেন?

রোগিণী। সুবিধা পাইয়াছি বলিয়া।

দাদাঠাকুর। বটে? এখন ছাড়বি কি না বল?

রোগিণী, "হুঁ হুঁ, তা না না না," বলিয়া গান ধরিল।

দাদাঠাকুর। আ ম'লো, আবার নষ্টামি। ভালয় ভালয় যাবি কিনা বল?

রোগিণী। আমি তোর ঘাড় ভাঙ্গিব।

দাদাঠাকুর। বটে, দেখি কে কার ঘাড় ভাঙ্গে!

দাদাঠাকুর অমনি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্ষপ ছুড়িয়া মারিলেন। পাঁড়ি ঘুরিতে লাগিল, রোগিণীও বিকট চিৎকার করিতে লাগিল। দাদাঠাকুরের বিরাম নাই, তাঁহার মুখে অবিরাম মন্ত্রোচ্চারিত হইতেছে; মাঝে মাঝে তিনি ভূমির উপর সম্মার্জ্জনীর আঘাত করিতেছেন। শেষে রোগিণী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে বলিল,

"ওরে বাপ রে, মলাম রে, আর করবো না রে, ছেড়ে দে রে।" তখন তাহার মুখ দিয়া ফেণ নির্গত হইতেছে, চক্ষু কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে ; রোগিণীর দশা দেখিয়া সকলেই আহা উহু করিতে লাগিল।

দাদাঠাকুর অটল অচল। তিনি কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কিরে, ঘাড় ভাঙ্গবি না ? এখন বাপরে মারে কল্লিস কেন ?"

রোগিণী। (সকাতরে) ও বাবা, তুমি আমার ধরম বাপ। আমায় কি করতে হবে বল !

দাদাঠাকুর। নেকাম নাকি ? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো জানিস ? কি করতে হবে, তোকে ক'বার বলবো ? যা এখনি একে ছেড়ে দূর হয়ে যা।

রোগিণী। বেশ আছি। দুদিন পরে গেলে হতো না ?

দাদাঠাকুর। আ ম'লো ! দেখবি তবে !

রোগিণী। না, না, যাই এই যে। জল, জল মা, বড় তৃষ্ণা !

দাদাঠাকুর। দাঁড়া, জল খাওয়াচ্ছি তোকে। নিয়ে আয়ত আর গাছ দুই মুড়ো খেংরা।

রোগিণী। ওরে বাপরে, এই যাচ্ছি, এই যাচ্ছি। মাগো, একটু সুখে থাকতে পেলাম না।

দাদা। কেন, গ্যাছের ডালে সুখ হতো না বুঝি ?

রোগিণী। না, না, উহুঃ হুঃ বড় শীত, একটু শুই।

দাদা। আ গেলো কচুপোড়া খেয়ে, বড় বেদ্‌ড়া দেখছি যে ? যাবি না তা হলে ?

রোগিণী। এই যে যাই। আর মেরো না বাবা।

দাদা। না মারবো না। এখন কি নিয়ে যাবি বল দেখি ? শীল নোড়া, ঝাঁটা, না ছেঁড়া চটি ?

রোগিণী। তবে একান্তই যেতে হবে? উঃ বড় কষ্ট! জল, জল!

দাদা। নে, বল, কি নিয়ে যাবি?

রোগিণী। নে যাব আবার কি? নে যাব তোমার মাথা।

দাদা। না, বড় ভোগালে। আবার বেদ্‌ড়ামো কচ্ছিস্?

রোগিণী। ওগো না না, যাই যাই। নিয়ে কিছু যাব না। তবে ঐ তেঁতুল গাছের ডাল ভেঙ্গে রেখে যাব।

দাদা। হাঁ, তাই যা—এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যা, নইলে বড় কষ্ট পাবি।

হঠাৎ রোগিণী অবশ হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল; পড়িয়াই সে অজ্ঞান, অচৈতন্য; তারা ছুটিয়া গিয়া কোন নিষেধ না মানিয়া জননীকে বুকে তুলিয়া লইয়া মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল।

সেই ক্ষণেই সমবেত দর্শকমণ্ডলী সভয়ে দেখিল,—ঝড় নাই, ঝাপ্টা নাই, মড় মড় করিয়া তেঁতুল গাছের বড় ডালটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে দুর্গা দুর্গা করিয়া উঠিল।

দাদাঠাকুরের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি সগর্ব্বে বলিলেন, "আর ভয় নাই, আপদের শান্তি হইয়াছে। প্রসূতির শুশ্রূষা কর, এখনি চেতনা হইবে। বড় দুর্ব্বল, গরম দুগ্ধ পান করিতে দাও। আর আপাততঃ আমায় এক ছিলাম তামাক খাওয়াও দেখি, বড় পরিশ্রম হয়েছে।"

দাদাঠাকুর এই কথা বলিয়াই জলচৌকির উপর বসিয়া হাতপাখায় হাওয়া খাইতে লাগিলেন। একজন ত্রস্তে তাঁহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল; দাদাঠাকুর মহা সন্তুষ্ট,—একগাল হাসিয়া ফেলিলেন। তারা জননীর সেবা করিতে লাগিল; অল্পেই প্রসূতির চেতনা হইল, সে চারিদিকে চাহিয়া মাথায়

ঘোমটা টানিয়া গায়ের কাপড়চোপড় সাবধান করিয়া জড়সড় হইয়া বসিল ; তাহাকে সূতিকাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল, দুধও খাইতে দেওয়া হইল।

এ দিকে তখন প্রাঙ্গণে মহা মজলিস বসিয়াছে। যখনকার যাহা ; ভূতের দৌরাত্ম্য, ভূতগ্রস্ত রোগীর যন্ত্রণা, ভূত-ঝাড়ান প্রভৃতির কথা হইতে হইতে ভূতের গল্প উঠিল। তখন যাঁহার যাহা পুঁজি ছিল, তিনি তাহা বাহির করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুকাকা শ্রীপুরের রাধানাথ মিস্ত্রীর পিসতুতো ভাইয়ের বড় সম্বন্ধীর নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তাহাদের গ্রামের নফরা যুগী সেবার অমাবস্যার রাত্রে ঢালির বাগানের পাশে বাঁশঝাড়ের নিম্নে সাড়েবাইশ হাত লম্বা একটা শ্বেত পদার্থ বাঁশের ডগা হইতে সড়াক করিয়া নামিতে দেখিয়াছিল। পুঁটে কাওরার শ্বশুরের দেশের নিমুতাঁতীর ভায়রাভাই একদিন রাত্রে নদীতীরে শ্মশানে দুই মুস্কো যোয়ানের লড়াই দেখিয়াছিল ; তাহারা এই লম্বা, এই কাল কিসকিন্ধো, এই মূলার মত দাঁত, এই ডিমের মত চোখ ; তাহাদের পা বাঁকা, পশ্চাতে ঘুরাণো, হাতদুটা পেট হইতে বাহির হইয়াছে, নাকে কৃমি ঝুলিতেছে ; সে তখন কাপড়ের নৌকায় পাহারা দিতেছিল, ভয়ে সে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। রাখালীর মা স্বকর্ণে শুনিয়াছে, তাহার রাখালীর বড় যায়ের মেজ-খুড়ীর সেজমেয়ের খুড়শাশুড়ী খিড়কীর ঘাটে ভরসন্ধ্যা বেলা মাছ ধুইতে গিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে "মাঁছ দিঁবিঁ গোঁ" বলিয়া প্রেতিনী তাড়া করিয়াছিল। বাহাদুরী লইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রসিক ঘোষ। সে বলিল, "আরে ওসব শোনা কথা। আমি ও বছর বর্ষার সময় ধলচিথার মিত্রদের বাটী হইতে পাশা খেলিয়া রাত্রি আড়াই প্রহরে ঘরে ফিরিতেছি, ঐ নিকিরি পাড়ার কাছাকাছি নালাটা পার্ হয়ে এপারে এসে ক্যাওড়া গাছের শিকড়ে পা ঘষে ধুয়ে ফেলে উঠছি, এমন সময়ে একটা কিম্ভূত কিমা-

কার জন্ত ঠিক আমার মুখের সম্মুখে 'হি হি হি হি' করিয়া আকাশ পাতাল হাঁ করিয়া হাসিয়া উঠিল।" গল্প যত জমুক আর নাই জমুক, রসিকের হিহিহিহি চিৎকারে দশ পনের জন লোক ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিল; প্রসূতির একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে বলিল, "হাঁ হাঁ, রসিকের খুব সাহস আছে বটে। ও সেবারে আঁধার রাতে বদরতলার শ্মশানে রানুকাকার মরা ছেলেটাকে পুততে গিয়েছিল। বাপ, দিনেই সেখানে যেতে ভয় করে! একে আঁধার রাত, তায় টিপটিপুনি বৃষ্টি; এদিকে এক হাতে মড়া, অপর হাতে কোদাল খোন্তা! আমরা হলে ত' দাঁতকপাটি যেতাম।"

দাদাঠাকুর এতক্ষণ তামাকু সেবনে মজগুল ছিলেন। হঠাৎ রসিকের প্রশংসাবাদে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "রাখ্ তোর রসিকের সাহস! রসিকের ত' বড় মরদ, ওর আবার সাহস! সাহস যদি বলতে হয় ত' চাটগার লক্ষ্মীনারাণ কাকার। আঃ! সে সাহসের কথা শুনলে তোরা ভিরমি যাবি। হাঁ, সাহস দেখাতে এসেছে! সেই সেবার আশ্বিনে ঝড়ের সময়, সেই—"

দাদাঠাকুরের কথা শেষ হইল না। দর্পনারায়ণ তাঁহার কথা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর থাক, দাদাঠাকুর, আপনার লক্ষ্মীনারাণ কাকার গল্প এখন থাক। আপাততঃ প্রসূতির সম্বন্ধে যাহা হয় ব্যবস্থা ক'রে চলুন ঘরে ফিরি। ওকে একটু বিশ্রাম দেওয়া ত' আবশ্যক। আর রাত্রিও দ্বিপ্রহর অতীত হল।"

দাদাঠাকুর একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু নাচার; কেহ তাঁহার গল্প শুনিতে চাহে না, গৃহে ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। বাধ্য হইয়া দাদাঠাকুরকেও উঠিতে হইল। তবে তাঁহার এক আনন্দ, সকলেই তাঁহার অদ্ভুত গুণপনার সুখ্যাতি করিতেছে। যাইবার সময়

দাদাঠাকুর দীননাথ ও তারাসুন্দরীকে প্রসূতীর সেবা সম্বন্ধে গুটী কয়েক উপদেশ দিয়া গেলেন। দীননাথের কুটীর নিস্তব্ধ হইল।

আরও এক প্রহর রাত্রি অতীত হইয়াছে। চারি দিক নিস্তব্ধ, প্রকৃতি যেন প্রাণহীন। সমগ্র জগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে। সেই বিজন বন মধ্যে অবস্থিত নির্জ্জন কুটীরের চতুষ্পার্শ্বের কানন তখন যেন "নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম।" দীননাথের বাটীর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেবল তারা বিনিদ্র হইয়া সূতিকাগৃহে মায়ের পার্শ্বে বসিয়া আছে। স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে তাহার অতুল রূপরাশি যেন আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিরাভরণা সুন্দরীর কণ্ঠে লম্বিত রুদ্রাক্ষমালা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহাতেই অনুমান হইতেছে যে, তারা নিদ্রিতা নহে, নতুবা তাহার মূর্ত্তি নিশ্চল নিষ্কম্প, যেন চিত্রার্পিত। তারা অন্যমনে প্রদীপের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও তাহার বক্ষবিলম্বিত মালা কাঁপিতেছে। কি এক অকুল ভাবনা-সাগরে সে ডুবিয়াছে, তাই সে মাঝে মাঝে রক্তকুসুমতুল্য অধরে দন্ত নিষ্পে-ষণ করিতেছে। একবার সে আপন মনে বলিয়া উঠিল "কতকাল, উঃ কতকাল! ভগবান, পাপিষ্ঠের পাপের মাত্রা পূর্ণ হয় নাই কি?" তারা আবার ভাবনা-সাগরে ডুবিল; ক্রমে যেন তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। এই ক্ষণপূর্ব্বে শৃগাল তৃতীয় প্রহরের ডাক ডাকিয়া রজ-নীর গাঢ় নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছে; ক্ষণপরে সমগ্র বনভূমি নীরব হইয়াছে। আকাশে এখনও বর্ষণলঘু খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসিয়া যাই-তেছে; কুমুদনাথের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া আসিতেছে।

অকস্মাৎ সেই ভীতিপ্রদ বিকট নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কোথা হইতে বিকট বিকৃত-কণ্ঠে রব উঠিল, "কুউ-উ-উ"! সেই রব নীরব নিশীথে

আকাশের স্তরে স্তরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তারার মোহ দূর হইল, সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে একবার জননীর পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, প্রসূতি অকাতরে ঘুমাইতেছে। একবার সে জননীর অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিল, পরে সে তাহার বক্ষে মুখামৃত প্রক্ষেপ করিয়া মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শিয়রে লৌহাস্ত্রখানি সুরক্ষিত করিয়া বাহিরে আসিয়া দ্রুতগতিতে পশ্চাতের বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বার খুলিয়াই সে দেখিল, দ্বারের অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া মনুষ্যমূর্ত্তি? অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে তাহার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ ও ধীর গম্ভীর বদনমণ্ডল ঈষৎ পরিলক্ষিত হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই তারার অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সে সাগ্রহে বলিল, "তুমি? দাঁড়াও, আমি এলাম এই"—বলিয়াই সে তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বনকুরঙ্গিনীর মত ছুটিয়া ঘরে ফিরিল। ঘরে ফিরিয়া সে প্রাঙ্গণস্থ কলসীর জলে নিঃশব্দে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রক্ষালন করিল; পরে বসন ত্যাগ করিয়া অন্য বসন গ্রহণ করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে বাগানের তিন্তিড়ীতলে উপস্থিত হইল। সেই তেঁতুলতলার চতুষ্পার্শ্বে বড় বড় ঝোপ ও কাঁটাবন; দিবালোকেই সেই স্থানে স্বভাবতঃ ঘনান্ধকার, তাহার উপর ভূতের গাছ প্রবাদ, আর রক্ষা আছে কি? রাত্রির কথা দূরে থাকুক, দিবসেও অতি সাহসী গ্রামবাসীও সে গাছের ত্রিসীমানায় যাইতে সাহস করিত না। কাজেই সেই বৃক্ষতলের তুল্য নির্জ্জন স্থান গ্রামের মধ্যে আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই বৃক্ষতলে সুন্দর বংশমঞ্চ। তারা সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিল, আগন্তুক মঞ্চে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই প্রত্যাশায় পথের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া আছে। তারাকে দেখিয়াই সে এক লম্ফে সম্মুখে উপস্থিত হইল ও দৃঢ় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া

তাহার লজ্জাবনত আননে চুম্বন করিল। কোমলাঙ্গী তারা তাহার বলিষ্ঠ বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া সঙ্কুচিতা হইয়া তাহার প্রশস্ত উরসে মুখ লুকাইল; তাহার সুন্দর দেহযষ্টি কি এক ভাবের আবেশে থর থর কাঁপিয়া উঠিল। আগন্তুক আবার তাহার মুখখানি সযতনে তুলিয়া ধরিয়া তাহার লজ্জানিমীলিত নয়নে, নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশে ও কুন্তলাবৃত কপোলে চুম্বন করিল; যেন তাহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি আর হয় না; আশা আর মিটে না। গাঢ় আলিঙ্গনে তারাকে আবদ্ধ করিয়া আগন্তুক গদগদকণ্ঠে বলিল, "বৈষ্ণবী! কি মধুর, কি সুন্দর—"

তারা চম্পককলির মত ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "চুপ, এখানে ওনাম কেন? আমি ত' তারা।"

আগন্তুক হাসিয়া কহিল, "হাঁ হাঁ, তারা, তারা। সোণার তারা আমার, রাজরাণী আমার!" তারার মুখ ঈষৎ বিষাদক্লিষ্ট হইল; সে বলিল, "রাজরাণীই যদি, তবে কাঙ্গালিনী কেন?"

আগন্তুক অতি গম্ভীরস্বরে বলিল, "এতে কি কষ্ট পাও, তারা? আর—"

তারা ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি ত' আমায় জান।"

আগন্তুক। জানি তারা! জানি বলিয়াই তোমায় এই বিষম পরীক্ষায় ফেলিয়াছি। কিন্তু তোমার স্ত্রীবুদ্ধি, সকল সময়ে পরীক্ষায় সফল হইতে পার না।

তারা সভয়ে কহিল, "কেন? কি অপরাধ করিয়াছি?"

আগন্তুক। পঞ্চমীর রাত্রে সাহেবকে পথে নিষ্কৃতি দিলে কেন?

তারার বুকের পাষাণ নামিয়া গেল; কহিল, "এই কথা? নিরীহ নির্দ্দোষ বিদেশীকে উৎপীড়ন করিলে অন্যায় হয় যে।"

আগন্তুক। না তারা, ন্যায় হউক বা অন্যায়ই হউক, তুমি সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়া আমার একটা উদ্দেশ্য বিফল করিয়াছ। যে কার্য্যের উদ্দেশ্যে তুমি রাজরাণী হইয়াও কাঙ্গালিনী, সেই কার্য্য সে দিন সাহেব ধরা পড়িলে সাধিত হইয়া যাইত। আমি সাহেবকে প্রাণে মারিব বলিয়া ধরি নাই; সাহেবের উপর কোনও অত্যাচার করিব বলিয়াও ধরি নাই। সাহেব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিল, তাহারই লস্কর দলভুক্ত আমার গুপ্তচরে সে কথা শুনিয়াছিল। সাহেবকে ধরিবার সেও এক প্রধান কারণ। তোমার কথার উপর কথা কয়, আমার লোক জনের মধ্যে এমন সাহস কাহার আছে? কাজেই ভূতনাথ আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু তোমার এই স্ত্রীবুদ্ধিতে কাজের অনেকটা ব্যাঘাত হইল।

তারার চক্ষু জলভারাক্রান্ত। সে সকাতরে কহিল, "আমায় ক্ষমা কর। আমি অধম স্ত্রীজাত।" আগন্তুক তাহাকে সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, আগন্তুক স্বয়ং জীবন সর্দ্দার। নিশীথে বিধবা যুবতী গৃহস্থকন্যার সহিত জীবনের বিশ্রব্ধপ্রেমালাপ—এ এক বিচিত্র রহস্য নহে কি?

জীবন তারার অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রেমপূরিত নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; ভাবিল, এই সরল নিষ্পাপ বালিকার অপরাধ কি যে তাহার আবার ক্ষমা! ধীরে ধীরে বলিল, "ক্ষমা, বৈষ্ণবী—না, না, তারা তোমায় ত' আমি চিরদিনই ক্ষমা করে আস্‌ছি, নূতন করে আর কি ক্ষমা করিব? যাউক, নানা কথায় তোমার জননীর সংবাদ কিছুই লওয়া হয় নাই আজ তিনি কেমন আছেন? আমি সব খবরই জানি, তবু তোমার মুখে শুনি।"

তারা সকল কথা সংক্ষেপে বলিল; শুনিয়া জীবন দাদাঠাকুরের গুণপনার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিল। জীবন পরে বলিল, "দেখ, একটী গুরুতর কথা বলিব বলিয়াই আজ এত রাত্রে দেখা করিলাম। বোধ হয় তোমার এই পরীক্ষা-জীবনের অবসান হইল। আর তোমায় আমি এ অবস্থায় রাখিতে পারি না। তোমাকে প্রকৃত বনবাসিনীই হইতে হইবে।"

তারার মুখ ফুটন্ত মল্লিকার মত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সে কি বলিতে গিয়া মুখ লুকাইল।

জীবন বলিল, "হাঁ তারা, তোমায় বনবাসিনীই হইতে হইবে। সাহেব শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছে। সংবাদ পাইয়াছি, তাহার সঙ্গে বারাসতের কালেক্টর সাহেব আমার সন্ধানে আসিতেছে। তাহার অভ্যর্থনার জন্য দে-গঙ্গার পুলিশ থানায় চারিদিক হইতে দলে দলে পুলিশ ফৌজ জমায়েৎ হইতেছে। সাহেব আসিয়া নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রে তোমার সন্ধান করিবে। কাজেই তোমায় এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু বনে কি তোমার মন টিকিবে?"

তারা। আমি ত' নিজে বুনো।

জীবন। একাকিনী নিয়ত পুরুষ-সঙ্গ ভাল লাগিবে কি?

তারা। তোমার কাছে থাকিতে পাইব।

জীবন। তা সত্য; কিন্তু আমি ত' নিয়ত থাকিব না। আমার অনুপস্থিতিতে তোমায় একাকিনী পুরুষ-সহবাসে থাকিতে হইবে।

তারা। তারা সব আমার সন্তান।

জীবন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাহার পানে তাকাইল; পরে বলিল, "সত্যই তারা তোমার সন্তান। তারা! তোমায় এখনও ঠিক চিনি নাই। কিন্তু তুমি যথার্থই বনের রাণী হইবার যোগ্যা। যাউক, ও দিকেও সন্ধান যাহা পাইয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। আর তোমায় জঘন্য

কপটতার আবরণে কামুকের মন যোগাইয়া কার্য্যসাধন করিবার আবশ্যক নাই।”

তারা জীবনের দুটী হাত দুই হাতে ধরিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণনয়নে জীবনের পানে তাকাইল। জীবন তাহার অন্তরের কথা বুঝিল, বলিল, “বুঝিয়াছি, আমার এই আজ্ঞা পালনে মনে কি দারুণ কষ্ট পাইয়াছ। তোমার সরল উদার নিষ্পাপ প্রাণ, কপটতার আবরণ তাহাতে সাজিবে কেন? কিন্তু না করিলেই বা দুষ্টের দমন হয় কই? পাপের শাস্তি হয় কই? পিশাচ কি এখনও মনে জানে, তুমি তাহার অনুগতা?”

তারা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “হাঁ”।

জীবন। যাউক, আর তোমায় সেই পিশাচের অনস্তুষ্টি সাধন করিতে হইবে না। তোমার পিতাও অনেক কথা জানিয়াছেন। আমার কার্য্যসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই। আমি চলিলাম। তোমার জননী ত' এ সকল কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই?

তারা। না; বাবা ছাড়া আমাদের কথা আর কেহ জানে না।

তারা এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল। পরে আনতমুখে জীবনের দুইটী অঙ্গুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জিজ্ঞাসিল, “কবে যাওয়া হইবে?”

জীবন। কোথায়? কে যাবে?

তারা নীরব। জীবন বুঝিল; হাসিয়া বলিল, “শীঘ্রই। তুমি প্রস্তুত থাক। এখন চলিলাম। ঐ উষার আলো গাছের মাথায় দেখা দিয়াছে।”

মুহূর্ত্তমধ্যে জীবন অদৃশ্য হইয়া গেল। তারা বহুক্ষণ অনন্যমনে একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

নিরঞ্জনের পরীক্ষা।

দেওয়ানজী দত্তজা মহাশয়ের গৃহে কেহ নাই। কেহ নাই বলিলে অবশ্য ভুল হয়, কেননা, ঘরে গৃহিণী আছেন; তবে গৃহস্বামী নাই। তিনি সোলাদানায় গিয়াছেন, তাঁহার পুত্রও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পূজার অবকাশের পর কুঠী খুলিয়াছে, লোকজনও কাজে লাগিয়াছে। সাহেব আজিও ফিরিয়া আসেন নাই, দুই একদিনের মধ্যে আসিবেন,—দেওয়ানজী এইরূপ সংবাদ পাইয়াছেন। এবার সাহেব একাকী আসিতেছেন না, স্বয়ং জেলার কালেক্টর সাহেব ও আর দুই তিনটী সাহেব বিবি সঙ্গে আসিতেছেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য, তাঁহাদের আদর আপ্যায়নের জন্য, উদ্যোগ আয়োজন করিবার নিমিত্তই দেওয়ানজী মহাশয় সোলাদানায় গিয়াছেন। নাড়ুগোপাল পুত্রটী বহু দিবস যাবৎ বাহানা লইয়াছিল, সাহেবের ময়ূরপঙ্খী চড়িয়া নদীতে বেড়াইবে। এতদিন সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এখন আবার সাহেব আসিতেছেন, যদি আর সুযোগ না ঘটে,—সেই আশঙ্কায় আজ দেওয়ানজী মহাশয় পুত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মালী তাহাকে কাঁধে বহিয়া লইয়া গিয়াছে। গৃহে পাহারা দিবার নিমিত্ত আছে মাত্র একজন ভোজপুরী পুলীশ বরকন্দাজ।

বেলা তৃতীয় প্রহর আগমনোন্মুখ। শরতের নাতিশীতোষ্ণ সূর্য্য-কিরণে জগৎ আলোকিত। পল্লীবাসীরা আহারাদি সমাপনান্তে যে যাহার ঘরে নিদ্রা যাইতেছে। কদাচিৎ কেহ বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে পথে চলিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একটা গৃহপালিত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনা যাইতেছে। বাঁধা বকুলতলা ভ্রমরের গুণ গুণ গুঞ্জনে ভরিয়া গিয়াছে।

দত্ত-গৃহিণী চপলাঠাকুরাণী ঠিক এই সময়ে শয়নকক্ষের সম্মুখস্থ

প্রশস্ত দালানে পা ছড়াইয়া চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন; সম্মুখে সুন্দর মুকুর, দন্তে চুলের দড়ী, হস্তে চুলের গোছ। হাত যত নড়িতেছে, হাতের চুড়ী ততই ঠুন ঠুন বাজিতেছে। তখনকার কালে বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মীরা ঝাপ্টা কাটিয়া চুল বাঁধিতেন, হাল ফেসানের ফিরিঙ্গী, বেণে প্রভৃতি তর বেতর চুলবাঁধা জানিতেন না। সুন্দরীর কেশের কুন্তল, ললাট ও গণ্ডের উপর পড়িয়া, মুখখানিকে মেঘে ঢাকা চাঁদের মত করিয়াছে; সেই মুখে মৃদুমন্দ মনভুলান হাসি। চুলবাঁধা হইলে পর সুন্দরী টিপটী কাটিলেন, সীমন্তে সিন্দুরবিন্দুটী উজ্জল করিয়া দিলেন, আয়ত নয়ন-তল কজ্জল-রেখাঙ্কিত করিলেন, আর সেকালের প্রথামত কুন্দ-দন্তে মিশি মাখাইয়া দিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার, বারবার মুকুরে মুখখানি দেখিলেন; দেখিয়া দেখিয়া আশা আর মিটে না; আপনার রূপে আপনি বিভোর হইলেন; তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠে দন্ত পীড়ন করিয়া মধুর হাসি হাসিলেন। সুন্দরী উঠিলেন, যথাস্থানে মুকুরাদি স্থাপন করিলেন ও মরালগমনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিন্দুক খুলিয়া দুই তিন খানি মূল্যবান বস্ত্র বাহির করিলেন; একবার এটা, একবার সেটা; বাছাই আর হয় না। বসমা, মটরা-চেলি, বুটিদার চেলি, ঢাকাই গুলবাহার—কোন্‌খানা রাখিয়া কোনখানা পরিধান করিবেন? শেষে শেষোক্তখানাই মনঃপূত হইল। সুন্দরী সেই ঢাকাই গুলবাহার সাটী ফেরতা দিয়া পরিধান করিলেন। পরে পেঁটরা খুলিয়া বেত্রাধারের মধ্য হইতে একে একে অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া কক্ষতলে সাজাইতে লাগিলেন। সে অলঙ্কারই বা কত? দেশী, ঢাকাই, কটকী। মাথার—সিঁথি, রূপার ফুল, সোণার মুকুট; কানের—ঢেঁড়ীঝুমকো, পাশাঝুমকো, চৌদানী, কানবালা, দুল, কেরাপাত, পিঁপুলপাত, মাকড়ী; নাকের—বেশর, নোলক; গলার—সাতনর, চিক, মোটাদানা,

দড়ীহার, হেলেহার; উপর হাতের—বাজু, তাবিজ, রুশনো, যশম, নীচের হাতের—বাউটী, পৈছা, জোড়ামাদুলী, লবঙ্গকলি, নারিকেল ফুল, মরদানা, যবদানা, পলাকাঁঠি, বাঁউড়ী, চুড়ী, দমদমা, শাঁখা, বালা, রুলী, লোহা; পিঠের—পিঠঝাঁপা; কোমরের—চন্দ্রহার, গোট, বিছে, কাঁকড়াবিছে; পায়ের—মল, পাঁওজের, চরণপদ্ম, চুটকী, গুঁজরী, পঞ্চম, বেঁকী, বেজ্‌মুর। তখনকার কালে রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কারেরই বহুল প্রচলন ছিল; দুই একখানা সোণারও হইত। সুন্দরী সেইগুলির মধ্যে বাছাই করিয়া কয়েকখানি অঙ্গে ধারণ করিয়া অবশিষ্ট তুলিয়া রাখিলেন। সর্ব্বশেষে পা দুখানি অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিলেন ও মেদীপাতার রসে হাত দুখানি রাঙ্গা করিলেন। বেশভূষা সমাপ্ত হইল।' তখন সুন্দরী আবার একবার মুকুরখানি খুলিয়া আপনার রূপ দেখিয়া লইলেন; নয়ন আর ফিরে না। সুন্দরী আত্মহারা হইয়া ভাবিলেন, "এ রূপেও কি ভুলিবে না? কেন ভুলিবে না? রূপে কে না মজে? মানুষ—কোন ছার! স্বয়ং মুনি ঋষিরাও অপ্সরীদের রূপ দেখে ভুলতেন।"

কিসের জন্য আজ এ বেশভূষা? কিসের জন্য আজ এ প্রাণ-মজান হাসি? গরবিনী যুবতীর আজ এ ঠাট কেন? কারে ভুলাইতে আজ হাবভাব, সাজসজ্জা? আজ গৃহকর্ত্তা ঘরে নাই, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমনেরও আশা নাই; তবে আজ এই অভিসার-সাজ কিসের জন্য?

আজ দিন পাঁচ সাত গ্রামে এক বন্যবরাহ বিষম উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছে। ছিরে বাগদী গুগলী ও শম্বুকের বোঝা লইয়া সন্ধ্যার সময় বাজোড়ের ধার হইতে ঘরে ফিরিতেছিল, হঠাৎ পশ্চাতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হইল; সে পলাইবার অবসর পাইল না; চক্ষের নিমিষে বরাহ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল; শম্বুক-গুগলীর বোঝা চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল; বরাহ তীরবেগে অন্যত্র ধাবিত হইল। বিশে কাওরার বড় ছেলে পাল্কীর আড়ায় পাল্কী আনিতে যাইতেছিল, হঠাৎ ফুলবাড়ীর নন্দরামের বাগান হইতে বরাহ বাহির হইয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া দন্তাঘাতে একটা অঙ্গ চিরিয়া দিল ও চক্ষের নিমিষে অদৃশ্য হইয়া গেল। তারক পরামাণিক বাগানে নারিকেল পাড়িতে গিয়াছিল; একটা আম গাছের তলা দিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে দেখিল, দূরে একটা বোঁচবনের ঝোপ হইতে বরাহটা বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; তারক প্রাণভয়ে আম গাছের একটা অবনত শাখায় ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া পড়িল; বরাহটা তাহার পায়ের তলদেশ দিয়া তীরবেগে ছুটিয়া গেল; সে বলে, বরাহের পৃষ্ঠদেশে তাহার পদস্পর্শ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গৃহপালিত ছাগ গাভী প্রভৃতির উপরও বরাহ প্রতিদিনই অত্যাচার করিত। বরাহকে মারিবার জন্য গ্রামের লোকেরা প্রত্যহ বিস্তর চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; তীর ধনুক, বর্শা সড়কী, লাঠি তরবারি লইয়া জঙ্গল হইতে জঙ্গলে ছুটাছুটি করিয়াও কেহই বরাহের সন্ধান পায় না; এই আছে, এই নাই, বরাহটা যেন মায়াবী যাদুকর। এদিনও প্রাতঃকাল হইতে বিস্তর তাড়াতুড়ি করা হইয়াছে, কিন্তু বরাহ ধরা বা মারা পড়ে নাই। দ্বিপ্রহরে সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছে, এমন সময় ভজহরি সেন নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল যে, সে বাঙ্গোড়ের ধারে ভদ্রবাগানের কোলে বেতবনের মধ্যে বরাহকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে বাঙ্গোড়ের ধারে শৌচাদি করিতে গিয়াছিল; তখন বাঙ্গোড়ে জনপ্রাণী নাই; নৌকায় যাহারা ছিল, তাহারাও নিদ্রা যাইতেছিল। ভজহরি বেতবনের পশ্চাতে ঝোপের মধ্যে যাইতেছে, এমন সময় দেখিল বেতবনে কাদার উপর পড়িয়া বরাহ ঘুমাইতেছে; তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাদামাখা; তাহার বড় বড় দুইটা দাঁত;

শরীরের অনেকস্থল ছিন্ন ভিন্ন, রক্তাক্ত। ভজহরির সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। বালক হইলেও সে বড় বুদ্ধিমানের কাজ করিল; কোনও গোলমাল না করিয়া সে দ্রুতপদে নিরঞ্জনের কাছে গিয়া সব কথা বলিল। নিরঞ্জন প্রাতঃকাল হইতে সকলের সহিত বরাহের পাছু পাছু ছুটাছুটি করিয়াছে; তৎপরে স্নানাহার করিয়া সবেমাত্র শয়ন করিয়াছে, এমন সময় ভজহরি বরাহের সংবাদ দিল। নিরঞ্জন অমনি উঠিয়া ভজহরির সঙ্গে বাহির হইল; বাটীর সকলে ঘুমাইতেছে, কেহ কিছু জানিল না। নিরঞ্জন যাইবার সময় কেবলমাত্র একখানি শাণিত বর্শা লইয়া চলিল।

ভজহরি জিজ্ঞাসিল, "দাদা ভাই, তীরধনুক নিলে না?"

নিরঞ্জন বলিল, "আবশ্যক নাই।"

ভজহরি বলিল, "আর কাহাকেও ডাক দিব কি?"

নিরঞ্জন উত্তর করিল, "না, বেশী গোলযোগে আবশ্যক নাই। ঐ গোলযোগেই কাজ হইতেছে না।"

সেনেদের বাটীর কাছে আসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ভজ! তুই বাড়ী যা।"

ভজহরি সাগ্রহে বলিল, "না দাদাভাই, আমি তোমার সঙ্গে যাব"।

নিরঞ্জন প্রমাদ গণিল, বলিল, "আঃ সর্ব্বনাশ! তুই যাবি কিরে? বুনো শূয়ারের গোঁ জানিস ত? তুই ছেলে মানুষ, তুই কি করবি?"

ভজহরি সকাতরে যোড়হাতে বলিল, "দোহাই, দাদামশাই! আমারে সঙ্গে নেও, আমি না গেলে তোমায় দেখিয়ে দিবে কে?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "কেন, আমি কি ভদ্রবাগানের বেতবন চিনি না? যাউক, যাবিই যখন তখন চল, কিন্তু আমি যেখানে থাকিতে বলিব, সেইখানে তোকে থাকিতে হইবে।"

ভজহরি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ"।

ভদ্রবাগানে উপস্থিত হইয়া নিরঞ্জন দেখিল, বরাহ তখনও নিদ্রা যাইতেছে। চারিদিক হইতে দেখিয়া নিরঞ্জন ঠিক করিল, বেতবনের মধ্যে বর্শার খোঁচায় বরা মারা সম্ভবপর নহে। তখন সে ভজহরিকে দত্তজার বাটী হইতে তাহার নাম করিয়া বন্দুক ও বারুদ চাহিয়া আনিতে বলিল। ভদ্রবাগানের মধ্যেই দত্ত মহাশয়ের বাটী। ভজহরি এক দৌড়ে বাটীর ভিতর গেল। তখন দত্তগৃহিণী শয়ন করিয়া আছেন ভজহরির ডাকে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দ্বার খুলিয়া দালানে আসিলেন। ভজহরি তাঁহাকে বন্দুকের কথা বলিল। নিরঞ্জনের নাম শুনিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি ভজহরিকে বন্দুক দিতে সম্মত হইলেন না; নিরঞ্জনকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। ভজহরি আবার ছুটিয়া গিয়া নিরঞ্জনকে সব কথা বলিল।

নিরঞ্জন একটু বিরক্ত হইল; কিন্তু উপায়ও নাই; কাজেই ভজহরিকে সেইখানে গাছের আড়ালে দাঁড়াইতে বলিয়া সে দত্ত-মহাশয়ের গৃহে গেল। তাহাকে দেখিয়া দেওয়ান-গৃহিণী এক-গাল হাসিয়া বলিলেন, "ইঃ! তবু ভাল কেন গরীবের ঘরে আস্‌তে কি অপমান বোধ হয়?"

নিরঞ্জন। কেন কাকীমা, এই ত' এলাম। কই, দত্তকাকার সেই দোনলা বন্দুকটা দিন দেখি চট্‌ করে।

চপলা। বন্দুক দিচ্ছি। তা এত তাড়াতাড়ি কিসের? এখানে একটু বসলে কি জাত যাবে?

নিরঞ্জন বিলম্বে অধীর হইয়া উঠিল, বলিল, "দোহাই কাকীমা, বন্দুকটা শীঘ্র দিন, না হলে শূয়ারটা পালিয়ে যাবে। শিকার করে এসে আপনি যতক্ষণ বল্‌বেন, আপনার সঙ্গে বসে গল্প কর্‌বো।"

চপলা। "সত্যি বল্‌ছো, সত্যি বল্‌ছো, এখনি ফিরে আস্‌বে?

তোমায় কতদিন ডেকে পাঠিয়েছি, কত কথা বলতে আছে। একবারও কি আসতে নাই ?”—উক্তি কাতরতা ও অভিমান জড়িত।

নিরঞ্জন। কাজের ঝঞ্ঝাটে আস্‌তে পারি নাই, কাকীমা।

চপলা। শুনেছি শূয়ারটা বড় দুরন্ত। মারতে গিয়ে বিপদ আপদ হবে না ত’ ?

নিরঞ্জন। রাম বল! গাছে চড়ে গুলি কর্‌বো, সে আমার কি করবে ? দিন, দিন, চট্‌ করে দিন।

চপলা ঘরের ভিতর হইতে বন্দুক বারুদ প্রভৃতি আনিয়া দিলেন; নিরঞ্জনের হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, “আমার মাথা খাও, আস্‌বে বলে যাও।”

নিরঞ্জন। আঃ! বলছিত’ আসবো। বন্দুক রাখতে আসতে হবে না ?

নিরঞ্জন এই কথা বলিয়া বন্দুকহস্তে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। সে তখন অন্যমনে ছিল। শিকারের ভাবনায় তখন তাহার মন মজগুল। তাহা না হইলে সে দেখিতে পাইত, তাহার “কাকীমার” মুখে চোখে তখন কি অপূর্ব্ব ভাবলহরী ক্রীড়া করিতেছে, তাহার “কাকীমার” প্রাণের মধ্যে কি ঝড় বহিতেছে।

নিরঞ্জন খিড়কীর বাগানের ভিতর দিয়া বাঙ্গোড়ের ধারে বেতবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ভজহরি গাছের আড়ালে যেমন দাঁড়াইয়া শিকার পাহারা দিতেছিল তেমনই দিতেছে, শিকারও পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতেছে। নিরঞ্জন একটা হেলা আমগাছ মনোনীত করিয়া লইল। গাছটা বেতবনের অতি নিকটে। ভজহরিকে সেই গাছে চড়িতে বলিয়া সেও সেই গাছে উঠিল। বন্দুকের বারুদ গাদা হইলে পর সে প্রস্তুত হইয়া বসিল ও ভজহরিকে দৃঢ়মুষ্টিতে বর্শা ধরিয়া স্থির হইয়া বসিতে বলিল। দুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল;

বরাহ গলদেশে বিষম আহত হইয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও ভীষণ শব্দে ভীমবেগে বৃক্ষতলের দিকে ছুটিল। হঠাৎ সেই সময় ভজহরি ভয়েই হউক বা যে কারণেই হউক বৃক্ষশাখা হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। নিরঞ্জন দেখিল, সর্ব্বনাশ! বারুদ-গাদার আর সময় নাই। সে তখন অনন্যোপায় হইয়া বরাহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুকটা ছুড়িয়া মারিল। অব্যর্থ সন্ধান; চক্ষে ও নাসিকায় বিষম ব্যথা পাইয়া বরাহ ভূতলশায়ী হইল; তখন বরাহ ভজহরি হইতে মাত্র দুই হস্ত দূরে অবস্থিত! নিরঞ্জন লম্ফ দিয়া ভূমিতলে অবতীর্ণ হইল ও ক্ষিপ্রহস্তে বর্শাখানি তুলিয়া লইয়া এক আঘাতে বরাহের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এতগুলি ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল।

ভজহরি ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছিল; সে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতে না উঠিতেই বরাহ হত হইল। ভজহরি তখনও থরথর কাঁপিতেছে। নিরঞ্জন সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিল, "ভয় কি, ভয় কি? ঐ দেখ্ শূয়ার মারা পড়িয়াছে। এইবার যা, কাওরা-পাড়ায় খবর দিগে যা, তারা নিয়ে যাবে। আমি বন্দুকটা রেখে যাচ্ছি।" নিরঞ্জন এই কথা বলিয়া বাঙ্গোড়ের জলে বন্দুক ও বর্শা সাফ করিতে গেল; ভজহরি প্রকৃতিস্থ হইয়া একবার সেই হত বরাহের প্রকাণ্ড দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কাওরাপাড়ার দিকে ছুটিল।

নিরঞ্জন অস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করিয়া ভদ্রবাগানের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় শুনিল, বিস্তর লোক হল্লা করিয়া বাগানের পশ্চিমে বাঙ্গোড়ের পথ দিয়া সেইদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। নিরঞ্জন স্পষ্ট শুনিল, কেহ বলিতেছে, "এত বড়? ওরে বাপরে!" কেহ বলিতেছে, "নিরু একা মাল্লে?" কেহ বলিতেছে, "হবে না কেন, বাপের বেটা ত'!" কেহ বলিতেছে, "মুই তেখুনি কয়েলাম, সুম্মুন্দিরি যদি ঘাল কত্তি পারে, ত' মোদের ছোটকর্ত্তার ছাওয়াল।" নিরঞ্জন ভাবে

বুঝিল, ইতর ভদ্র অনেক লোকই আসিতেছে; ভজহরি এরই মধ্যে কাওরাপাড়ায় খবর দিয়া লোক আনিল দেখিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে আরও শুনিল, ভজহরিকে সে কি করিয়া প্রাণে বাঁচাইয়াছে, ভজহরি তাহারই পরিচয় দিতেছে; সকলে তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার নানা প্রশংসাবাদ করিতেছে। নিরঞ্জন আর অগ্রসর হইল না; সেই খানেই এক ঝোপের অন্তরালে অবস্থান করিল। লোকেরা সেই হত বরাহটাকে দেখিয়া মহা আনন্দ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "ওঃ সাড়ে আট হাত হবে"; কেহ বলিল, "না, সাত্ হাতের বেশী হবে না"; অপর একজন বলিল, "তা হউক, কিন্তু খাড়াই আড়াই হাতের উপর যে"; আর একটী লোক বলিয়া উঠিল, "বাপ, দাঁত দেখ; প্রায় হাতখানেক হবে"; কেহ বলিল, "সেবার শীতে করেদের বাগানে ঠিক এত বড়ই একটা বুনো শূয়ার মারা পড়েছিল।" এইরূপ নানা কথাই হইল; শিকার সম্বন্ধে গল্পও দুটী একটী যে না হইল, এমন নহে। নিরঞ্জনকে কেহ কেহ খুঁজিল; কিন্তু দেখিতে পাইল না। তাহার পর কাওরারা বাঁশের ঝোলা করিয়া বরাহকে বহিয়া লইয়া চলিল। যতক্ষণ একটী প্রাণীও সেখানে রহিল, ততক্ষণ নিরঞ্জন লুকাইয়া রহিল। সকলে চলিয়া গেলে পর নিরঞ্জন ধীরে ধীরে দেওয়ানজী মহাশয়ের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

এদিকে নিরঞ্জন বন্দুক লইয়া শিকারে গেলে পর দেওয়ান-গৃহিণী কি ভাবিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে বেশভূষা করিলেন; বেশভূষা সমাপ্ত হইলে বার বার দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ করিলেন; পরে ঘরের দ্রব্যাদি একটু সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আজ যেন তাঁহার কি হইয়াছে। এটা রাখিতে ওটা পড়িয়া যায়; ওটা ধরিতে যান, সেটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। বিরক্ত হইয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "দূর ছাই, পোড়া হাত আজ কেঁপে কেঁপেই মলেন! যাক্‌গে, আজ

আর গোছ করে কাজ নাই।” চপলাসুন্দরীর গোছ করা হইল না। তিনি খিড়কীর দ্বারটী খুলিয়া সতৃষ্ণনয়নে বাগানের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একটু শয়ন করিলেন; আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাগানের দ্বারের দিকে গেলেন; পুনরায় ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন; ক্ষণপরে আবার উঠিলেন—আজ যেন তাঁহার শয্যাকণ্টকী হইয়াছে, আজ যেন তাঁহার কিছুতেই শান্তি নাই, কিছুতেই তৃপ্তি নাই। আবার তিনি খিড়কীর বাগানের দ্বারদেশে গিয়া যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন।

অকস্মাৎ সেই সময়ে দুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। চপলা চমকিয়া উঠিয়া বাগানের দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া আবার কি ভাবিয়া ঘরে ফিরিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ ঘর বাহির করিয়া দালানে আসিয়া বসিলেন। দালানে বসিয়া চপলা ভাবিতে লাগিলেন, “ঐ বন্দুকের আওয়াজ হইল, বরা নিশ্চয় মারা পড়িয়াছে। যদি মারা না পড়ে, তাহা হইলে কি হইবে? নিরেন, নিরু, নিরু আমার—বলিতে বলিতে ভাবের আবেশে চপলার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল। চপলা আবার ভাবিলেন, “না, তা কি হয়? বরা নিশ্চয়ই মারা পড়িয়াছে। শুনেছি সে বয়সে ছোট হলেও সন্ধান করিতে দেশে সবচেয়ে ভাল। তার অব্যর্থ সন্ধানে বরা কি মারা পড়িবে না? নিশ্চই পড়িবে। আর—আর যদি বরা মারা না পড়ে, যদি বরা তাকে আক্রমণ করে—সে ছেলে মানুষ, একা,—ওমা! তবে কি হবে? না যাই, কাহাকে ডাকি, যাই বাগানের দিকে ছুটে যাই।”

চপলা দ্রুতপদে ছুটিলেন,—আবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন; আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—“না না, গিয়ে কাজ নাই। আমি স্ত্রীলোক, আমি গিয়ে কি করিব? যদি দুরন্ত জানোয়ার আমাকে মেরে ফেলে! না না, যেতে পারবো না, আমি মরতে পারবো না। কেন মরতে

যাব ? কার জন্য মরতে যাব ? সে আমার কে ? জানি না, সে আমার কে ! সে আমার সর্ব্বস্ব, সে আমার ইহকাল পরকাল, সে আমার জীবনের জীবন, সে জল—আমি সফরী, তাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকবার আমার সাধ্য কি ? জানি না, কি চক্ষে প্রথম তাকে দেখেছিলাম ! সেই দেখেছি, আর মরেছি। তার চখে কি যাদু আছে ! তার সদাই হাসি হাসি মুখখানিতে কি কুহক মাখান আছে ! যে দেখেছে, সেই মজেছে। আমার মত এমনি কত নারীই ঐ হাসিতে নিশ্চয় মজেছে, কুলমান বিসর্জ্জন দিয়েছে। কুলমান ? হোঃ হোঃ হোঃ কুলমান ! আমার আবার কুলমান ! শুনলেও হাসি পায়। তার জন্য সব বিসর্জ্জন দিতে বসেছি, আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। ডুবেছি যখন, ভাল করেই ডুবি, চোখ কান বুজেই ডুবি, তারপর অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। সে কি ভালবাসবে না, সে কি আমার হবে না ? কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। সে নবীন যুবক, আমি যুবতী, আমাকে তার অদেয় কি আছে ? আমি উপযাচিকা হয়ে চাহিলে সে আমায় কি না দিয়ে থাকিতে পারবে ? কেউ কখন পারেনি, সেও ত' মানুষ। আমার কি নাই ? আমার রূপ আছে, আমার যৌবন আছে, আমার ধন আছে, আমার অগাধ অপরিমেয় প্রেম আছে। আমার প্রাণ মন জীবন যৌবন পায়ে ডালি দিলেও কি সে আমার পানে ফিরে তাকাবে না ? অবশ্যই তাকাবে। যদি না তাকায়, যদি সে আমার দিকে ফিরে না চায়, তা হলে কি হবে ? এ আবার কি জ্বালা ! এ জ্বালায় জ্বলে মরি কেন ? হায় হায়, এ পোড়া নারীজন্ম কেন হয় ! একটু শুই।"

চপলা শয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতেই বা নিস্তার কই ? সেই সর্ব্বনাশিনী চিন্তা আবার তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—"আচ্ছা, সে ত' যখনি আসে, হেসে হেসে কত আপনার

জনের মত কথা কয়। এত ছেলে আসে, কেউ ত' তার মত এমন আবদার করে না। কত লোক আসে, কেউ ত' এমন করে মন ভুলিয়ে যায় না, কেউ ত' তার মত আমাদের দিকে টেনে কথা বলে না। মনে মনে মিল না হলে কি এমন করে মন ভুলাতে পারে, না এমন করে আমাদের দিকে টেনে দেশের সকল লোকের অসন্তোষের কারণ হতে পারে? নিশ্চয়ই সে আমায় ভালবাসে। কত সময়ে দেখেছি, তার চোখ সেই কথা বলছে, তার ভাব ভঙ্গী, চালচলন,—সব সেই কথা ব্যক্ত করছে। কত সময়ে মনে হয়েছে, সে যেন কি বলি বলি করেও মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করে নি। বোধ হয়, পাপের ভয়ে এগিয়ে এসেও পিছিয়ে গেছে। পাপ? এঁ্যা পাপ কি? আমি কি পাপের কাজ করতে যাচ্ছি? জানিনা পাপ পুণ্য কি। বিশ্বাস-ঘাতিনী হব? সে ত' বহুদিন হয়েছি; বিশ্বাসঘাতকের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হব, এতে আবার পাপ কি? পাপ পুণ্য জানিনা, জানি কেবল তাকে, জানি তার সেই হাসিমাখা মুখখানিকে, জানি তার সেই পাগল-করা চোখকে। এই যে সামনেই যেন দেখছি, সেই মনচোরা দাঁড়িয়ে আছে; ঐ যে তার কাঁচা সোনার গা; ঐ যে তার ঢেউখেলান চুলের গোছা কাঁধের উপরে লতিয়ে পড়েছে; ঐ যে তার টুকটুকে ঠোঁট দুখানির মধ্য দিয়ে মুক্তোর মত সাজান দাঁত; ঐ যে তার টানা টানা চোখের দৃষ্টিতে আমায় পুড়িয়ে মাচ্ছে; ঐ যে সে আমায় তার সেই মন-মজান মিষ্টি গলায় ডাকছে।”

চপলা যথার্থই শুনিলেন কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, “কাকীমা!” চপলা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “না না, আমি কি পাগল হলেম নাকি?” সত্যই তিনি শুনিলেন, কে যেন আবার বলিল, “কাকীমা, এই নিন দত্ত-কাকার বন্দুক। ওঃ! ওতে যে উপকার হয়েছে!”

সত্যই এবার চিন্তার ঘোর কাটিল। তিনি চাহিলেন, দেখিলেন সত্যই সম্মুখে সেই রমণীমোহন নিরঞ্জন! তাহার স্বাভাবিক সুগৌর কান্তি দ্বিপ্রহরের আতপতাপে আরও আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; পরিশ্রমে সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবিন্দু ঝরিতেছে; সেই নবনীত-কোমল সদা প্রফুল্লবদন; সেই প্রশান্ত ললাট; সেই আয়ত নয়ন; সেই সরল উদার দৃষ্টি; সেই কুঞ্চিত কেশরাশি; সেই বিশাল উরস; সেই সুন্দর সুডৌল বাহু; সেই উন্নত বলিষ্ঠ তেজঃপুঞ্জ কলেবর! চপলা জ্ঞানহারা হইয়া সেই রূপ সুধা পান করিলেন, শুনিলেন নিরঞ্জন বলিতেছে, "কাকীমা, এই আপনার বন্দুক রহিল, আমি চল্লেম।"

চপলা ছুটিয়া গিয়া নিরঞ্জনের হাত দুটি ধরিয়া কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিলেন; বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অভিমানভরে বলিলেন, "নিষ্ঠুর! এসেই যদি যাবে, তবে আসবে বলেছিলে কেন?"

নিরঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, কাকীমা, আসতে বলেছিলেন এসেছি ত'; এখন বন্দুকটা রেখে দিন, আমি যাই। আমি খুব ভাল করে সাফ করে এনেছি। যদি দত্ত-কাকা রাগ করেন, না হয় নিয়ে যাই, আরও ভাল করে সাফ করে এনে দিব।"

চপলা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "না না, আর সাফ করতে হবে না, আমি সে কথা বলছি না। এই খানে একটু বস, তোমার সঙ্গে কত কথা আছে। দেখি, দেখি, মুখখানি ঘামে ভেসে যাচ্ছে যে!" চপলা এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনকে বসাইয়া সাদরে অঞ্চলে তাহার ঘাম মুছাইয়া দিলেন ও পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন আরও বিস্মিত হইল; তাহার যেন কেমন একটা অশান্তি বোধ হইতে লাগিল; কই এমন-ধারা কোনও দিন ত' হয় না। সে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

চপলা বলিলেন, "দেখ, অমন করে যাই যাই করো না। গরীব

বলেই বুঝি এত অবহেলা করতে হয়? বসে এখানে একটু বিশ্রাম করলেই বুঝি অপমান হয়?"

নিরঞ্জন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না কাকীমা, এই বসছি। আপনি অমন করে বলবেন না, আমার বড় কষ্ট হয়।"

চপলা হাসিয়া বলিলেন, "নিরেন! আমার কথায় কি তোমার কষ্ট হয়? আমার ত' মনে হয়, আমার কথা তুমি কাণেই তোল না।"

নিরঞ্জন। কেন কাকীমা, আপনি ওকথা বলছেন কেন?

চপলা। তা না হলে আমি এত ডেকে পাঠাই, তুমি ত' আস না। তা এখন ত' ওরূপ হবেই। বিয়ের সম্বন্ধ আসছে, টুকটুকে বরের টুকটুকে কনে হবে। এখন কি আর বুড়ো হাবড়া ভালবাসার লোকেদের মনে থাকে।"

নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আজ যাই কাকীমা, আর এক দিন আসবো। আজ শিকার নিয়ে নিশ্চয়ই খুব হুলস্থুল পড়েছে। একবার দেখে আসি।"

চপলা নিরঞ্জনের হস্তধারণ করিলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ক্ষণেক নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কোথা যাবে? যেতে ত' দিব না। যখন এসেছ, তখন সব শুনতে হবে। দেখ, গ্রামে কেউ আমাদের দেখতে পারে না, আমরা একঘরে হয়ে আছি। কেবল তুমিই আমাদের ভালবাস, আমাদের আপনার জনের মত দেখ। তোমার স্বভাবই জগতের সকলকে আপনার মত দেখা। তাই তোমার কাছে, তোমার পিতার কাছে, আমাদের দুঃখের কথা জানাই। তাতে কি তোমার রাগ হয়?"

নিরঞ্জন। না, রাগ হবে কেন? কখনও কি রাগের ভাব দেখেছেন?

চপলা। তবে উঠ্তে চাইছ কেন? দুটো সুখ দুঃখের কথা

বলবো মাত্র, আর কিছু না। দেখ, আমরা অসহায় বিদেশী। তোমা-দেরই কৃপায় এখানে বাস করতে পেয়েছি। তোমরা আমাদের রাখলেও রাখতে পার, মারলেও মারতে পার। দেখ, সাহেবের কাছে কাজ করে ভগবানের কৃপায় আমাদের দু-পয়সা সংস্থান হয়েছে। এতে গ্রামের লোকের চোখ টাটিয়েছে, লোকের ভাল তারা দেখতে পারে না।

নিরঞ্জন। ছিঃ, কাকীমা, ওকথা বলতে নাই। এত নীচ, এত স্বার্থপর, কেউ হতে পারে না।

চপলা। (হাসিয়া) নিরেন, তোমার মনটি যেমন সরল, তুমি তেমনই সকলকে সরল দেখ। কিন্তু তোমার বয়স কি? সংসারে দেখবার শুনবার তোমার এখনও ঢের বাকি। শুনেছ কি, আজ কয় দিন ধরে আমাদের নিয়ে গ্রামে কি ঘোঁটপাচাল হচ্ছে ?

নিরঞ্জন। হাঁ শুনেছি। কিন্তু সে কেবল দাদাঠাকুরের খেলা। তাঁর একটা খেয়াল হয়েছে, তাই তিনি খেপ্পা হয়ে উঠেছেন। আন্তরিক তাঁর কিছুই নয়।

চপলা। না না, তুমি জান না। আমাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করবার কথা হচ্ছে।

নিরঞ্জন। হ্যাঃ, ও একটা কথার কথা। আপনাদের যদি কোনও দোষ না থাকে, তা হলে কেউ আপনাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। ভগবানের রাজত্বে অবিচার কেন হবে? যদি বিনা দোষে অত্যাচারের সূচনা দেখি, তা হলে আমি গ্রামের সকলের হাতে পায়ে ধরব। আর আমার ঠাকুরও কি চুপ করে থাকবেন ?

চপলা। নিরেন, ঐ সুখেই আমরা আজও এখানে আছি, না হলে এ বাসা ভেঙ্গে উঠে যেতেম। তোমার ঠাকুর যে ন্যায়বিচারক, তোমরা যে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তা জানি বলেই এখনও নিশ্চিন্ত আছি।

তুমি যে আমায় ভালবাস, এই চিন্তাতেই আমার সুখ। নিরু (এখানে চপলার গলা কাঁপিয়া উঠিল), তোমার গুণের কথা আমি এক মুখে কি বলিব ? তোমায় যে আমি কি চক্ষে দেখেছি জানি না। তোমার রূপে, তোমার গুণে সকলে মুগ্ধ, আমি দুর্ব্বলা রমণী, আমি আর—

নিরঞ্জন। (ব্যস্ত হইয়া) আজ যাই, কাকীমা, সন্ধ্যা হয়ে এল—

চপলা। কি গুণ করেছ, নিরু, আমি আর আমাতে নাই। আমায় রাখ বা মার, আমি তোমারই।

নিরঞ্জন কি বলিতে যাইতেছিল, চপলা বাধা দিয়া তাহার হাত দুটী দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া নিজেই নিজের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতেছে, নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্ব শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে; তিনি তখন জ্ঞানহারা উন্মাদিনীর মত হইয়া উঠিয়াছেন। নিরঞ্জন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইল, শুনিল তিনি বলিতেছেন, "আমি তোমারই। তুমিও আমার নিরু। প্রাণে প্রাণে টান না হলে ভালবাসা হয় না। তুমি আমায় ভাল না বাসলে তোমার দিকে আমার মন টানবে কেন? তোমায় আমার প্রাণ চাইবে কেন? তোমার সঙ্গে রাত দিন চোখে চোখে, বুকে বুকে, প্রাণে প্রাণে, মিশে থাকতে ইচ্ছা হবে কেন ? নিরেন, তুমি কি দেখনি, লতা বড় গাছে জড়ায়; লতার স্বভাবই তাই। নিরু, কি করেছ আমায় ? তোমায় যে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না, একদণ্ড চোখের আড়াল করতে মন সরে না। তুমি কি আমার হবে না ?"

চপলার মুখে যেন ঝড় বহিয়া গেল। নিরঞ্জন কথা কহিবার অবকাশ পাইল না। সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কথা শেষ হইলে বলিল, "আপনি কি বলছেন, কাকীমা ? আপনি কি পাগল হয়েছেন ?"

চপলা। হাঁ নিরু, আমি পাগল হয়েছি; আমি সত্য সত্যই

পাগল হয়েছি। কেন পাগল হয়েছি তা তুমিই জান, তুমিই আমায় পাগল করেছ। জানি না তোমার চোখে কি আছে, জানি না তোমার হাসিতে কি আছে, জানি না তোমার কথায় কি মাথা আছে। নিরু, আমি ত' বেশ ছিলাম, কেন আমায় মজালে?

নিরঞ্জন। কাকীমা, কাকীমা, আপনি কি বল্‌ছেন? আপনি যে আমার মা, আমি আপনার সন্তান! বলুন, সন্তানকে পরীক্ষা কর্‌ছেন!

চপলা। কিসের মা, কোন সম্পর্কে মা, আমি কি তোমায় গর্ভে ধরেছি? কেন তবে ওকথা তুলে মনে কষ্ট দেও? তুমি নবীন যুবক, আমি প্রেমিকা যুবতী, এস তোমায় আমায় জগৎ ভুলে প্রেম পারাবারে ডুবে থাকি। তুমি কি চাও? জগতে প্রেমিকা রমণীর নিকট দুষ্প্রাপ্য কি আছে? সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, চিন্তায় শান্তি,—এমন আর কে আছে? প্রাণ ঢেলে প্রাণে প্রাণে ভাল বাসে, পায়ে একটী কাঁটা ফুটলে বুক দিয়ে কাটা তুলে দেয়, রণে বনে সম্পদে বিপদে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থেকে দুঃখে সুখ, অন্ধকারে আলোক আনে, এমন আর কে আছে? নিরু, আমি তোমায় এমনই ভালবাসি, এমনই তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি। একি! তুমি কাঁপছ, কাণে হাত দিচ্ছ, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, আমায় পিশাচী কামুকা বলে মনে কচ্ছ? তা কর, আমায় ঘৃণা কর, অবহেলা কর, লাথি মেরে দূরে ফেলে দাও। কর, কর, তাই কর। তা হলেই আমার উপযুক্ত হয়। করবেই ত', না করলে কলি মিথ্যা হবে যে। যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাকে লাথি মেরে না তাড়ালে সাজবে কেন? নিষ্ঠুর, তোমার জন্য যে আমি সব ত্যাগ কর্‌ছি! ওঃ ওঃ ওঃ!

নিরঞ্জন হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া পলাইল। চপলা দ্বারের নিকট আবার তাহাকে ধরিলেন, কাতরে বলিলেন, "যেও না, যেও না।

যাও যদি, আমার বুকের রক্ত দেখে যাও। আমি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে বসেছি।”

নিরঞ্জন কোনও উত্তর দিল না; কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে ও ভাব-ভঙ্গীতে হতভাগিনী পাপিনী মরমে মরিয়া গেল, চোখ তুলিয়া আর নিরঞ্জনের দিকে চাহিতে পারিল না।

যখন চপলা চক্ষু মেলিলেন, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল; তিনি দ্বার অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিলেন, “নিষ্ঠুর! যদি এই করবে, তবে কেন হেসে হেসে মজিয়েছিলে, কেন বৃথা আশা দিয়াছিলে? ও হোঃ হোঃ, খুব হয়েছে, খুব শিক্ষা পেয়েছি। না না, যাই, যাই, একটু ঔষধ খাই গিয়ে; শরীরটা কেমন কচ্ছে।”

চপলা এই কথা বলিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় শুনিলেন, দ্বারদেশে কে ডাকিতেছে, “মা ঠাকরোণ, এই কেতাবপত্রগুলো রেখে দিন, কর্ত্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।” চপলার শরীর শিহরিয়া উঠিল। “এ কে, এ সেই দীননাথ অধিকারী না? সর্ব্বনাশ! যাকে ভয়, সে-ই ঠিক এই সময়ে এখানে উপস্থিত! সব কথা শোনে নাই ত’? আশ্চর্য্য নাই। ও লোকটার মনে কি আছে, তা কেউ জানে না। ও সব করতে পারে,”—চপলা এইরূপই ভাবিতে লাগিলেন। দীননাথ দালানে কেতাবপত্র রাখিয়া দিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, “কর্ত্তা এগুলো সিন্দুকে তুলে রাখতে বলে দিয়েছেন। আমি এই এসেছি মা ঠাকরোণ। সন্ধ্যে হয়ে এল, বৈজনাথ সিং দেউড়ীতে পড়ে এখনও ঘুমুচ্ছে। খুব পাহারা দিচ্ছে। কেবল ডাল রুটীর যম। যাই, তুলে দিয়ে যাই।” দীননাথ চলিয়া গেল।

চপলা বহুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

তাঁহার মনে হইল, দীননাথ শেষ কথাগুলি বলিবার সময় একটু মুচকি হাসিয়াছিল। চপলা ভাবিলেন, "সে নিশ্চয়ই সব শুনিয়াছে। তাহা হইলে কি হইবে? ও লোকটার উপর আমার প্রথম হইতেই সন্দেহ। কর্ত্তা বলেন ও ভাল লোক, ওঁর প্রাণ রক্ষা করেছে। হবে। কিন্তু ও কি উদ্দেশ্যে ফিরে। একদিন আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ও কর্ত্তার সিন্দুক খুলে পুরাতন কাগজপত্র হাতড়াচ্ছে। মরুক গিয়ে, কর্ত্তাই যখন সন্দেহ করেন না, তখন আমি ভেবে মরি কেন। কিন্তু আজ কি ও সব কথা শুনেছে? বল্‌লে এই এসেছে। কিন্তু বলেই মুচকি হাস্‌লে কেন? নিশ্চয়ই শুনেছে। না না, তা হলে ত সর্ব্বনাশ। যাই, ঔষধ খাই গিয়ে।"

চপলা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই "লাল ঔষধের" বোতলটী বাহির করিলেন ও একটু একটু করিয়া গেলাসে ঢালিয়া খাইতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, বেশ ফুরফুরে বাতাস ছাড়িয়াছে। চারিদিকে কাঁশর ঝাঁঝর শাঁখ বাজিতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটু একটু করিয়া খাইতে খাইতে চপলা অনেকটা খাইয়া ফেলিলেন। ক্রমে তাঁহার বেশ একটু নেশা হইল। তখন তিনি নানা কল্পনা করিতে লাগিলেন। কখন মনে করিলেন, তিনি নিরঞ্জনকে বুকে লইয়া পরীর রাজ্যে উড়িয়া যাইতেছেন; কখনও ভাবিলেন, দীননাথ কর্ত্তার কাছে সব কথা বলিয়া দিতেছে, কর্ত্তা বন্দুক লইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিতেছেন; তিনি অমনি ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মেরো না, মেরো না, আমি নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। নিরঞ্জনই আমায় একাকী পেয়ে আমার উপর অত্যাচার করতে এসেছিল, ওকে দণ্ড দাও।"

তখন ঐ শেষ কথাটাই চপলা মনে মনে বহুক্ষণ তোলাপাড়া করিলেন; শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দোষ

সাজিয়া নিরঞ্জনের উপর সব দোষ চাপাইবেন। কর্ত্তার নিকট নিরঞ্জনের নামে অপবাদ রটাইবেন, তাহা হইলেই দাম্ভিক নিরঞ্জনের দর্প চূর্ণ হইবে। কি স্পর্দ্ধা তাহার? প্রেমিকা রমণী উপযাচিকা হয়ে সর্ব্বস্ব দিতে চাহিল, ঘৃণায় সে তাহা উপেক্ষা করিল! কিন্তু প্রেমিকা রমণী লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হলে, পিশাচী রাক্ষসী হতে পারে,—তা জানে না? নিরঞ্জন! খুব সাবধান! রাক্ষসীর বিষ-দংশন হতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে ত'?

পঞ্চায়েতের বিচার।

"যে ধর্ম্মবলে বলীয়ান, যে ভগবানে বিশ্বাসী, যে সৎপথে অবস্থান করে, জগতে কেউ তার কোনও অনিষ্ট করতে পারে না। তবে যদি বল, সারাজীবন ধর্ম্মপথে থেকেও কেহ কেহ কষ্ট পায়, প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়, সে কতকটা তার প্রাক্তন কর্ম্মফল, আর কতকটা পরীক্ষা।"

"তা মানি। কিন্তু যখন দেখি পাপী বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আমোদে ভোগে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, তখন মন বড় সন্দেহাকুল হয়। মনে হয়, ভগবানের রাজত্বে কখনও কখনও সুবিচার হয় না।"

"পাগল! ভগবানের রাজত্বে অবিচার কখনও হতে পারে কি? সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ ভোগ, কাকে বল? টাকার মাচায় বসে ভাল খেলে ভাল পরলেই কি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চরম হল? ভোগে কি শান্তি হয়? না, ত্যাগে সংযমে নিয়মে হয়? দেখ মানুষ কত জন্ম আসে যায়, প্রতি জন্মে কত খায় কত পরে, কত ভোগে থাকে; জন্ম জন্ম ভোগে থেকে তার সেই পুরাতন লালসারই সার্থকতা সাধিত হয়, কিন্তু আর কিছু হয় কি? বরং বাসনার পঙ্কিল নরকে

ডুবে থেকে সে মানব-জীবনের সার উদ্দেশ্য ভুলে যায়। যারা দুঃখে কষ্টে থেকে সংযম নিয়মের কঠোর শাসন মেনে বাসনার ক্ষয় করে, সংসার-সংগ্রামের ঘোর পরীক্ষায় পড়ে সেই দয়ার সাগর পতিতপাবন ভগবানকে ডাকার মত ডাকে, তারাই শান্তি পায়, তারাই মুক্তি পায়। কাঙ্গাল আতুরের ঠাকুর তিনি, কাঙ্গালকেই যে তিনি আগে কোল দেন।"

"অত বুঝি না, দাদা। চক্ষের সমক্ষে দেখছি, পাপী অত্যাচারী পাপের কোনও শাস্তি ভোগ কচ্ছে না, বেশ নির্ব্বিবাদে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। আর যে ধার্ম্মিক সুজন, সে দুঃখের সাগরে ভাসছে, লাঞ্ছনা অবমাননা অঙ্গের আভরণ করছে, ঘোর বিপদে পড়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। ভগবানের একি বিধান, দাদা?"

"ঐ টুকুই ত' ভগবানের লীলারহস্য। আমাদের পুণ্যময় শান্তি-ময় শাস্ত্র পুরাণে কি উপদেশ দেয় বল দেখি? আমাদের সেই দেবোপম ঋষিরা ভোগ-লালসা বিসর্জ্জন করে কঠোর সংযম অভ্যাস করে ইহ জীবনেই শান্তি ও মুক্তি পেতেন; রাজার ছেলে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হরিশ্চন্দ্র, রাম, নল, যুধিষ্ঠির, কি কঠোর কষ্ট ভোগ করেছিলেন বল দেখি? পুণ্যময়ী সাবিত্রী, দময়ন্তী, সীতা, দ্রৌপদী, রাজার মেয়ে হয়েও জীবন-সংগ্রামের ঘাতপ্রতিঘাতে কি নির্য্যাতনই না উপভোগ করেছিলেন? তা না করলে কি তাঁরা শান্তি পেতেন? শান্তি কোথায়, শান্তি দৈহিক ভোগে নয়, মনে। নিশ্চয় জেনো, পাপী দৈহিক ভোগ বিলাসের চূড়ান্ত করলেও মনে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। পাপাচারে, ভোগে বিলাসে, যখন তার বিতৃষ্ণা জন্মে, তখনই তার অনুতাপ আসে, আর তখনই তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সূত্রপাত হয়; সে প্রায়শ্চিত্ত বড় ভয়ানক, দৈহিক দুঃখ কষ্ট, বিপদ আপদ, তার তুলনায় স্বর্গসুখ। তার পর পরকাল।"

দর্পনারায়ণ বসুর পুষ্করিণী-তীরে তুলসী-পীঠে বসিয়া কথা হইতেছে, চূড়ামণি মহাশয় ও দাদাঠাকুর বক্তা; শ্রোতা অনেক, কেন না, আজ গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে। গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ ও অন্যান্য হিন্দু এবং মুসলমান মণ্ডলেরা তথায় সমবেত হইয়াছেন। আজ দেওয়ান কালী দত্ত মহাশয়ের বিচার হইবে। প্রাতঃকাল, এখনও সকলে উপস্থিত হন নাই; কাজেই কথাবার্ত্তা চলিতেছে। দাদাঠাকুরই দেওয়ানজীর কথাপ্রসঙ্গে কথা তুলিলেন যে, জগতে পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয় না, পাপী অত্যাচারী মনের সুখে কাল কাটাইয়া দেয়। চূড়ামণি মহাশয় তাহার উত্তরে গুটী কয়েক কথা বলিলেন; উপরে উভয়ের সেই কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে।

দাদাঠাকুর চূড়ামণি মহাশয়ের শেষ কথাটী শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঐ খানটায়ই গলদ, দাদা। ঐ পাপাচারীর যে শেষে ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মে, তার প্রমাণ কি? অন্ততঃ প্রকাশ্যে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, অন্তরে তার কি হয়, তা অপরে কিরূপে জানিবে?"

চূড়ামণি। বিতৃষ্ণা হয় না? নিশ্চয়ই হয়, আজন্ম কালই হয়ে আসছে। শাস্ত্র কখনও অভ্রান্ত হতে পারে না। হিন্দুর ইহাই শিক্ষা। শিশুকালে পিতামহীর মুখে গল্পচ্ছলে এই শাস্ত্রকথা শুনি, বাল্যে ও যৌবনে পিতামাতা ও গুরুর নিকট এই শিক্ষা পাই, প্রৌঢ়াবস্থায় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে, রামায়ণ কথকতা ইত্যাদি শ্রবণে এই শিক্ষা দৃঢ়মূল হয়।

এই সময় নাজীর মণ্ডল সদলবলে উপস্থিত হইল। সে আসিয়াই সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল।

দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন, "কি নাজীরদা, আজ তিন দিন ধরে যে গাঁ-ছাড়া। কুটুম বাড়ীতেই ছিলে, না আর কোথাও গিয়েছিলে?"

নাজীর। এজ্ঞে না, মুইতো আর কোহানে যাই নি, ঐ গুগুনির মোড়লপার বাড়ীই গিয়েলাম। পথে যাতি বড় কষ্ট হয়েলো। দুপুর নদ্দুরি যাতি নাগলাম, তপ্ত বালিতি পা পুড়ি যাতি নেগেলো। তা চাপা-পুকুরির ছোপে মিঞার সাতি সেক্ষেৎ হয়েলো, মিঞার ছাওয়াল তখন ঐ চৌধুরী পুকুরি নেতিছে। মুই কলাম,—মিঞার পো, ক্যান ধারা আছো। সে বল্লে,—ভালো আছি ; আর যদি কিছু কয়ে থাকে। দুপুর নদ্দুরি ছাতি ফেটি যেতিছে, সুম্মুন্দির পো বল্লে না যে, গুওটা দুমুড়ো খেয়ে যা।

সকলে নাজীরের কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সরল বৃদ্ধ সে হাসির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহার কথায় যে গোলমাল হইয়াছে, নাজীর তাহা বুঝিল না ; কাজেই সকলে হাসিতেছে দেখিয়া সে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইল। দর্পনারায়ণ তাহার সে ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "আঃ, মিঞার পো ত' বড় ভুল করেছে ; দুপুর রৌদ্রে অতিথ-সেবা করতে স্মরণ হলো না ?"

নাজীর তাঁহার মুখের কথাটী কাড়িয়া লইয়া বলিল, "এজ্ঞে, কত্তামশাই, মুই ঐ কোথাই কইতিছিলাম, তা তানারা হেসে ওঠ্‌লেন।"

চূড়ামণি মহাশয় হাঁকিয়া বলিলেন, "যাউক, সকলে উপস্থিত হয়েছে কি ? আর বিলম্ব কেন ? বেলা হয়ে উঠলো। তোমাদের কাজ আরম্ভ করে দাও না, ছোটকর্ত্তা। আমি একবার ঘুরে আসি।"

দর্প। সে কি, আপনি যাবেন কি ?

চূড়া। আমায় ওতে জড়াও কেন, বাপু ? আমি কবে ওসবে থাকি ?

দর্প। তা জানি। কিন্তু দয়া করে যখন এবার এসেছেন, তখন

আপনাকে আমাদের উপরোধে থাকতে হবে। বিদেশীর বিচার হচ্ছে, আপনাকে দেখ্‌তে হবে ন্যায় বিচার হচ্ছে কি না।

চূড়া। বেশ! তোমরা এত জন মোড়ল রয়েছ, তোমরা যা পরামর্শ করে মীমাংসা করবে, তাতে অবিচার হবে কেন? বসতে বলছ বসি, কিন্তু আমি বাপু কিছুতে নাই। শেষে আমার যা বক্তব্য, তা বলবো।

সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। দর্পনারায়ণ বলিলেন, "মেজকাকা, সকলে প্রস্তুত, এইবার আপনি দেওয়ানজীকে সংবাদ দিন।" নিমচাঁদ ঘোষ জানাইলেন যে, তাঁহাকে ডাকিতে লোক গিয়াছে, কেন তিনি এখনও আসিতেছেন না, কেহ বলিতে পারে না।

দর্প। সে কি রকম? লোক গিয়াছে, অথচ আসিতেছেন না কেন? কাহাকে পাঠান হইয়াছে?

মেজকর্ত্তা। কাল সংবাদ দিয়া প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছিল। আজ নরহরিকে পাঠান হইয়াছে।

দর্প। কতক্ষণ পাঠান হইয়াছে?

মেজ। তোমরা যখন বাগোড় হইতে ব্যায়াম করিয়া ফিরিতেছ।

দর্প। সে কি, সে যে বহুক্ষণ!

দাদা। দেখ, দেখ, বেটার একবার স্পর্দ্ধাটা দেখ!

এই সময়ে নরহরি ফিরিয়া আসিল। সে একাকী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তরে জানাইল, "তিনি কিছুতেই সাড়া দেন না। অনেক ডাকাডাকির পর ক্রুদ্ধ হইয়া ধমক দিয়া বলিলেন, 'আমি ওদের ফুলবাড়ীর রেয়েত না কি যে হুকুম করলে অমনি কাক কোকিল না ডাকতেই ঘুম ছেড়ে মাঠে লাঙ্গল দিতে যাব? যা বল্‌গে যা, যাব না।' আমি তাই শুনে ফিরে আসছিলেম, এমন সময় দেওয়ান-গিন্নী চুপি চুপি কি বল্লেন। তাই শুনে কর্ত্তা আরও রেগে

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন, 'কেন যাব? ওঃ! মোড়লেরা ডেকেছে! ডেকেছে ত' ডেকেছে, তার আবার ভয়টা কিসের! আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না। এঃ! লোক পাঠিয়ে ডাকে আমায়! কেন, মোড়লেরা নিজে আসতে পারে না?' "

পঞ্চায়েৎ সভায় একটা ভয়ানক উত্তেজনা-স্রোত বহিয়া গেল। "এত বড় স্পর্দ্ধা", "বেটার দিন ঘুনিয়ে এসেছে," "দেওয়ানগিরি করে মাথা টলেছে," "উঃ, বড় দেওয়ান আমার রে," "ঘুঘু দেখেছেন এখনও ফাঁদ দেখেন নি,"—ইত্যাদি মহা ডামাডোল হইয়া গেল। আছিরদ্দি মণ্ডল লাফাইয়া উঠিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "কর্ত্তা-মশাই, একবার হুকুমডো দেও দিনি, শালার স্থমুন্দীর পোর চাবালডা আসমানে উড়িয়ে দি!"

দর্পনারায়ণের মুখমণ্ডল গম্ভীর; বাত্যার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন ধীর স্থির হয়, ঠিক তেমনই। আছিরদ্দির কথা শুনিয়া দর্পনারায়ণ ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিলেন, "থাম আছিরদ্দি। ও সব কি বলছো? গালমন্দ করছ কেন? জান, এখনও যখন তাঁর বিচার হয় নাই, তখন তিনি নির্দ্দোষ?"

আছিরদ্দি এতটুকু হইয়া গেল; ডামাডোল একবারে বন্ধ হইয়া গেল। দর্পনারায়ণ কেবলমাত্র মেজকর্ত্তার দিকে তাকাইয়া গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "মেজকাকা, সব শুনলেন আপনারা। এখন কি কর্ত্তব্য ঠিক করুন।"

নিম ঘোষ বলিলেন, "আমরা আর কি বলবো, তুমিই যা হয় একটা ঠিক কর না।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সভামধ্যে একটা অস্ফুট গুণ গুণ রব উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ধীর-গম্ভীর-পাদবিক্ষেপে দেওয়ানজী পঞ্চায়েৎ সভাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

সভামণ্ডপ একবারে নীরব হইল। দেওয়ান কালিচরণ দত্ত জলদ-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে ডাকা হইয়াছে কেন? আমার নিকট আপনাদের কি প্রয়োজন?"

সকলের দৃষ্টি দর্পনারায়ণের দিকে। সকলেই শুনিতে উৎসুক হইয়াছেন, দর্পনারায়ণ কি বলেন। দর্পনারায়ণ মেজকর্ত্তার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মেজকাকা, কি বলিবার আছে বলুন।"

নিমচাঁদ উত্তর দিলেন, "আমি আর কি বলিব। তোমায় অনুমতি দিতেছি, তুমিই বল না।"

দর্পনারায়ণ তখন দেওয়ানজীকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার নামে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। আমাদের গ্রামের ইতরভদ্র সকলেই আপনার পক্ষের কথা শুনিতে চাহেন। নিশ্চয় জানিবেন, সুবিচার ছাড়া অবিচার হবে না।"

দেওয়ানজীর মুখ আরক্তিম হইল। তিনি কি বলিতে যাইয়া থামিয়া গেলেন। তথাপি তাঁহার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল, "বিচার করিবে কে? আপনাদের অধিকার? আমি যদি বিচার গ্রাহ্য না করি?"

সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত। এরূপ উক্তি কখনও শুনা যায় নাই! দর্পনারায়ণ অতি ধীরভাবে বলিলেন, "গ্রামে যতদিন আছেন, ততদিন আপনি পঞ্চায়েতের বিচার মানিতে বাধ্য। আপনি, আমি, এখানে যিনি যিনি উপস্থিত আছেন,—গ্রামের সকল লোককেই পঞ্চায়েতের বিচার মানিয়া চলিতে হইবে। না মানিলে গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইবে।"

দেওয়ান। কোম্পানীর মুল্লুকে পঞ্চায়েতের বিচার মানিব কেন?

দর্প। মানিতেই হইবে, না মানিলে উপায় নাই। যাউক, অনেকটা সময় বৃথা গেল। আপনাকে সরলভাবে প্রশ্ন করা যাইতেছে, আপনি আমাদের কথার জবাব দিবেন কি না?

দেওয়ান ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তাহাই স্বীকার করিলাম, প্রশ্ন করুন।"

দর্প। বেশ। আপনি জানেন বিধবা কুলস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় হিন্দুসমাজে দণ্ডার্হ?

দেওয়ান। হাঁ, জানি।

দর্প। আপনি সেই অপরাধে অভিযুক্ত। আপনারই অধীন দীননাথ অধিকারীর বিধবা কন্যাকে আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছেন, গ্রামের লোকে আপনার নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এখন আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন।

দেওয়ান। মিথ্যা কথা। যে একথা বলে, সে মিথ্যাবাদী।

দাদাঠাকুর চোখ্ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "সাবধান পাষণ্ড! মিথ্যা কথায় পাপ গোপন করিবি? গ্রামের তাবৎ লোকেই সাক্ষ্য দিবে, তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে।"

দর্পনারায়ণ দাদাঠাকুরকে চুপ করিতে বলিলেন। দেওয়ান কহিলেন, "দেখুন, মহাশয়! আমি এখানে একাকী, অসহায়। আপনারা ডাকিয়া আনিয়া যাহা ইচ্ছা অপমান করিতে পারেন; কিন্তু ফল তাহার কি হইবে পরে জানিবেন। যাউক, একটা কথা বলি,—মানিলাম আমি দীননাথের কন্যার ধর্ম্মনাশ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে কি হইল? সে যদি স্বেচ্ছায় আমার অঙ্কগতা হয়, তাহা হইলে আমার অপরাধ কি?"

দর্প। তাহা হইলেও অপরাধ গুরুতর। সে অপরাধের ক্ষমা নাই। স্বেচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছায় হউক, গ্রামের বুকের উপর এ সকল ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। হইলে তাহার শাস্তি আছে।

দেওয়ান। আমি বলিতেছি, আমি নির্দ্দোষ। অধিকারীর কন্যার সহিত আমার অবৈধ প্রণয় নাই।

দর্প। আপনারা কে কি জানেন বলুন।

তখন একে একে অনেকেই সাক্ষ্য দিল। কেহ বলিল, "আমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে দীনুর ঘরে দেওয়ানকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি।" কেহ বলিল, "আমি রাত্রে বহুক্ষণ দেওয়ানকে দীনুর ঘরে থাকিতে দেখিয়াছি, আমার সঙ্গে হারাণ দাদা ছিল।" কেহ বা বলিল, "আমি দীনুর কন্যার সহিত দেওয়ানজীকে রাত্রে নির্জ্জনে কথা কহিতে দেখিয়াছি।" এইরূপ নানা জনে নানা কথা বলিল।

দেওয়ানজী সকলের কথা শেষ হইতে দিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ইহারা যাহা বলিতেছে, সমস্তই সত্য। কিন্তু তথাপি আমি নির্দ্দোষ।"

সকলে অবাক। কি আশ্চর্য্য! লোকটা কি? লোকে বলিতেছে, সে দীনুর বিধবা কন্যার সহিত রাত্রিকালে বিশ্রম্ভালাপ করে; সেও তাহা স্বীকার করিতেছে, অথচ অম্লানবদনে বলিতেছে, সে নির্দ্দোষ!

দেওয়ান সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া আবার বলিলেন, "আপনারা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু সকল কথা শুনিলে আপনাদের সন্দেহ নিশ্চয় দূর হইবে। দেখুন, দূর হইতে মৃগ মরুর মাঝে জল দেখে তৃষ্ণা নিবারণার্থে জলের দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু শেষে জল তার তপ্ত বালিতে পরিণত হয়; ভ্রমে মানুষ রজ্জুকেও সর্প দেখে।"

দাদাঠাকুর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাখ্ বাপু তোর পণ্ডিতি, হাড় জ্বালিয়ে তুল্‌লে। সাধে কি বলে, কায়েতি বুদ্ধি! ঐ যে লক্ষ্মীনারাণ কা বলতেন——"

"এখন আপনার লক্ষ্মীনারায়ণ কা থাক্, কাজের কথা আগে শেষ হতে দিন—" দর্পনারায়ণ এই কথা বলিয়া দেওয়ানকে জিজ্ঞাসিলেন,

"হাঁ, আপনি বলছেন আপনার সকল কথা শুন্‌লে আমাদের সন্দেহ দূর হবে। বেশ, বলুন কি বলিবেন।"

দর্পনারায়ণের কথা শেষ হইলে সভাস্থল ক্ষণেকের তরে নীরব হইল। তখন দেওয়ানজী যেন অনেক চিন্তার পর বলিতে লাগিলেন, "আমি স্পষ্ট করিয়া সকল কথাই আপনাদের নিকট খুলিয়া বলিতেছি। বলিবার একটা উদ্দেশ্যও আছে। আপনারা পঞ্চায়েতের বিচার করিতে বসিয়াছেন। আপনাদের নিকট সূক্ষ্ম অপক্ষপাত বিচারেরই আশা করা যায়। আপনারা যখন বিচারক, তখন বিচারের সময় আপনাদের আপনার পর ভিন্ন বিবেচিত হইবে না, এইরূপই ভরসা করি। আপনাদের অতি নিকট আত্মীয় কোনও ব্যক্তির নামে আমারও একটা অভিযোগ আছে। সেই জন্যই আমি এই স্থানে আসিয়াছি। আমার বিচারের জন্য আপনারা আমায় আহ্বান করিয়াছেন ; না আসিলে আপনারা বিরক্ত হইয়া আমার অভিযোগের কথা কাণেই তুলিবেন না, এই ভয়েই আমি ঘাড় পাতিয়া বিচার মানিয়া লইতে আসিয়াছি।"

দর্প। কি অভিযোগ বলুন। গ্রামের মণ্ডলেরা নিশ্চিতই তাহার সুবিচার করিবেন।

দাদাঠাকুর এই সময় বলিয়া উঠিলেন, "ও সব ছেঁদো কথায় ভুলো না। মূল কথা চাপা দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ও সব চলিতেছে না।"

দেওয়ানজী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চলুক না চলুক, তাহাতে মহাশয়ের অত মাথাব্যথা কেন? ভাল জ্বালাই বটে। ঐ জন্য আসিতে চাহি নাই, কেবল তাহার অনুরোধেই আসিতে হইয়াছে।"

নিমচাঁদ ঘোষ বলিলেন, "কেন, মহাশয়! অত ক্রুদ্ধ হইবার কারণ কি? দাদাঠাকুর আপনাকে অপ্রিয় কথাটা কি বলিলেন?"

দেওয়ানজী। কি না বলিয়াছেন? ছেঁদো কথা, ছেঁদো কথা! আমি কি মিথ্যা বলিতেছি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি সব কথা খুলিয়া বলিব। আমার কথায় কি বিশ্বাস হয় না? আমি ত' স্বীকার করিতেছি, আমি দীনুর কন্যার সহিত রাত্রিকালে আলাপ করিয়াছি। কিন্তু শপথ করিয়া বলিতেছি, কখনও তাহার সহিত প্রেমালাপ করি নাই। আমার সে ইচ্ছা থাকিলেও আমি কখনও সে বিষয়ে সাহসী হই নাই, কারণ দীনুর কন্যা সে ধাতুতে গঠিত নয়। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে সাহস হয় না। অদ্ভুৎ প্রকৃতি তাহার, আশ্চর্য্য আচরণ তাহার, তাহার তুলনা জগতে আছে কি না জানি না। আমি তাহার সহিত প্রেমালাপ করিব, এত সাহস আমার নাই।"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "তবে বুঝি এই এক বৎসর কাল নিশীথে নির্জ্জনে যুবতী বালবিধবার সহিত মহাশয়ের ধর্ম্মকথার আলোচনা হইত?"

দেওয়ানজী কেবলমাত্র কঠোর দৃষ্টিতে একবার দাদাঠাকুরের দিকে চাহিলেন। দর্পনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দাদাঠাকুর, আপনি এরূপে কার্য্যে ব্যাঘাত দিলে আমাদিগকে আপাততঃ কার্য্য স্থগিত রাখিতে হয়।"

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বাবা, আমি এই চুপ কল্লেম। তোমরা নির্ব্বিবাদে কার্য্য চালাও।

দর্পনারায়ণ দেওয়ানজীকে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। দেওয়ানজী বলিতে লাগিলেন, "আমি সমস্তই খুলিয়া বলিতেছি। যথার্থই দীনুর কন্যার মত রমণী আমি দেখি নাই। এদিকে মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া আছে, কিন্তু কি এক অসহনীয় তেজো-গর্ব্বে সে সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, কাহার সাধ্য সে অগ্নির নিকট অগ্রসর

হয়। বহুদিন পূর্ব্বে দীনু একবার মহাশঙ্কটে আমার প্রাণ রক্ষা করে। সেই অবধি দীনুর গৃহে আমার যাতায়াত আছে। সেই সূত্রে দীনুর কন্যার সহিত আমার পরিচয়। সে আমায় কাকা বলিয়া সম্বোধন করিত, বালিকার মত আমার নিকট কত আবদার করিত, আমার অন্তরের কথা তাহার নিকট গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় গোপন রাখিতে পারি নাই। যাহাই হউক, সত্য কথা বলিতেছি, সে আমার প্রতি সরল উদার ব্যবহার করিলেও, আমার মন কিন্তু কলুষিত ছিল। তাই তাহাকে আমি নির্জ্জনে কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিতাম। চেষ্টাই করিতাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও কৃতকার্য্য হই নাই। এই আমার মোট কথা। ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে।" .

মেজকর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার সাক্ষী কে ?"

দেওয়ানজী। আমার সাক্ষী আমি। আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, আমি নাচার।

মিত্র-মহাশয় বলিলেন, "তাহা বলিলে চলিবে না। প্রমাণ কি ?"

দেওয়ানজী। কে প্রমাণ দিবে ? আমি কিম্বা তারা। আমার সাক্ষ্য আপনারা লইয়াছেন, এখন তারার সাক্ষ্য বাকি। তদ্ভিন্ন আমাদের উভয়ের মধ্যে কি ভাব, সে সম্বন্ধে জগতে আর কে সাক্ষ্য দিবে ?

চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট অসন্তোষের ধ্বনি উত্থিত হইল। দেওয়ানজী তখনও দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমার সাক্ষ্য আমি, আর সাক্ষী কেহ নাই।"

অকস্মাৎ জলদগম্ভীরনাদে ধ্বনিত হইল, "আর সাক্ষী আমি।"

সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, স্বয়ং চূড়ামণি মহাশয় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "আর সাক্ষী আমি।" তাঁহার

শালতরুনিভ দীর্ঘ সুন্দর সুগৌর তনু বালসূর্য্যের উজ্জ্বল মধুর কিরণে নিকষিত সুবর্ণের ন্যায় শোভা পাইতেছে; গলদেশে লম্বিত শ্বেত যজ্ঞোপবীত সেই শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে।

সকলে বিস্ময়ান্বিত। অবাক হইয়া সকলে চূড়ামণি মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চূড়ামণি মহাশয় অবিকম্পিতকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে আবার বলিলেন, "হঁা, আমি সাক্ষী। আমি বলিতেছি, এই ব্যক্তি যাহা বলিতেছে সব সত্য। দীননাথের কন্যা নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ।"

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ান্বিত দর্পনারায়ণ। তিনি ভাবিতেছেন, দীননাথের কন্যা কেমন, দেওয়ানের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ— এ সব কথা এত লোক থাকিতে নিরীহ চূড়ামণি মহাশয় জানিলেন কোথায়? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসিলেন, "ক্ষমা করিবেন, ঠাকুর মহাশয়। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমাদিগকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, কেন না মিথ্যার সহিত আপনার সংশ্রব নাই। তবে বিচারের প্রথামত আমরা এ বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করিতে বাধ্য। আপনি তাহার উত্তর দিতে সম্মত আছেন?"

চূড়া। অবশ্য। তবে যাহা গোপনীয় অথচ প্রয়োজনীয় নহে, এমন কথার উত্তর এখন দিব না।

দর্প। বেশ। আপনি বলুন, দীনুর কন্যা নিষ্পাপ,—আপনি কিরূপে জানিলেন।

চূড়া। তাহার আচরণে ব্যবহারে। গ্রামের কোনও ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত গৃহস্থকন্যার অনুচিত কোনও কার্য্য তাহাকে করিতে দেখে নাই; বরং আপামর সাধারণ তাহার লজ্জাশীলতা, দয়া, কোমলতা ও রমণীসুলভ অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণের প্রশংসা করে। সকলেই বলে, সে মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া আছে। আর কি প্রমাণ চাও?

দর্প। মানিলাম, আপনি যাহা বলিতেছেন, সব সত্য। কিন্তু বিধবা যুবতী গৃহস্থকন্যার ঘরে রাত্রে পরপুরুষের উপস্থিতি ও বিশ্রম্ভালাপ এবং নির্জ্জনে উভয়ের একত্র বিহার—এ সকল কথার কি উত্তর?

চূড়া। কার্য্য থাকিলেই তাহার কারণ আছে। উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই ওই বিশ্রাম্ভালাপ ও নিশীথে বিহার।

দর্প। সে কিরূপ?

চূড়া। কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনে দীননাথ এ গ্রামে বাস করিয়াছে। সে উদ্দেশ্য কি, এখন বলিবার আবশ্যক নাই। দীননাথের প্রধান সহায় তাহার কন্যা। সে সতী সাধ্বী। সে বিধবা নহে, সধবা; তাহার স্বামী অতি নিকটেই আছে। উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই, সে তাহাকে লইয়া যাইবে। পরপুরুষের সহিত বিশ্রম্ভালাপ ও বিহার ঐ উদ্দেশ্য সাধনের সোপান।

সভাস্থ সকলে নীরব। চূড়ামণি মহাশয় কি প্রলাপ বকিতেছেন? এ কি প্রহেলিকা? দেওয়ানজীও চমকিত হইলেন। তাঁহার সন্দিগ্ধ মন সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "চূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়? তাহা হইলে কি হইবে? আমার অন্তরের কথা তাহাকে ত' সব বলিয়াছি। না, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহার সহিত আমার অতীত জীবনের সম্পর্ক কি? সে অন্য উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়াছে।"

দর্প। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার প্রমাণ কি?

চূড়া। এমন প্রমাণ পাইয়াছি, যাহা চাক্ষুষ অপেক্ষাও বিশ্বাস্য।

দর্প। কি বলুন।

চূড়া। এখন তাহা বলিব না; বলিবার আবশ্যকও নাই। আমার কথায় বিশ্বাস কর।

দর্পনারায়ণ সভাস্থ সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন। একে একে সকলেই বলিলেন, চূড়ামণি মহাশয় যখন বলিতেছেন, তখন আর তাহার উপর কথা নাই; দীনুর কন্যা নিষ্পাপ, দেওয়ানও নির্দোষ। কেবল দাদাঠাকুর গাত্রদাহে ছটফট করিতে লাগিলেন।

দর্পনারায়ণ প্রশান্তদৃষ্টিতে দেওয়ানজীর দিকে চাহিলেন; বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নির্দোষ; আপনাকে আমরা অকারণ কষ্ট দিলাম, আপনারও কর্ম্মফল, আমাদেরও কর্ম্মফল। এখন আপনি যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন।"

দেওয়ানজী সাগ্রহে উত্তর দিলেন, "কষ্ট যতই হউক, আমি তাহাতে কাতর নহি। তবে আমার একটা অভিযোগ আছে; আপনারা যদি আমার অভিযোগের সুবিচার করেন, তাহা হইলেই আমার কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান থাকিবে না।"

দর্পনারায়ণ। কি অভিযোগ বলুন, এখনি তাহার বিচার হইয়া যাইবে। মণ্ডলেরা সকলে উপস্থিত আছেন; ইহাই উপযুক্ত সময়, এখনই মীমাংসা হইয়া যাইবে।

দেওয়ান। যদি আপনাদের অতি নিকট আত্মীয়ের নামে কোনও গুরুতর অভিযোগ থাকে, যদি আপনাদের অতি প্রিয়পাত্রের নামে কুৎসিত—

দর্প। থাক, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আত্মীয় কুটুম্ব কি, প্রিয়পাত্র কি, যদি আপনি আমার নামে কিম্বা সভাস্থ অন্য কোনও মণ্ডলের নামেও অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা হইলেও মণ্ডলদিগের নিকট বিচারের কোনও ত্রুটী হইবে না।

দেওয়ানজী সন্তুষ্ট হইলেন; হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "বেশ, পঞ্চায়েতে যদি এরূপ সুবিচার হয়, তাহা হইলে সমাজে আর দুষ্ট লোক থাকে না। হাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে; যদি কোন পশুপ্রকৃতি ব্যক্তিকে না

জানিতে পারিয়া কোনও সরলা কুলকামিনী পুত্র বা ভ্রাতার মত বিশ্বাস করিয়া অন্তঃপুরে অবাধে আসিতে দেয় ও তাহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করে, আর যদি সেই পাষণ্ড সেই অকৃত্রিম স্নেহের পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিদান দেয়, তাহা হইলে তাহার কি শাস্তি হয়?"

দর্প। তাহার অপরাধ গুরুতর, দণ্ডও গুরুতর।

দেওয়ান। সরল শিশুজ্ঞানে যাহাকে আদর করি, সে যদি কালকূটেভরা বিষধরের ন্যায় কালফণা উন্নত করিয়া দংশন করিতে আসে, তাহাকে প্রাণে বধ করা কি আমার কর্ত্তব্য নহে?

দর্প। আপনি এত উত্তেজিত হইতেছেন কেন? ঘটনাটা কি হইয়াছে বলুন, তবে ত বিচার হইবে।

দেওয়ান। মহাশয়, সে কথা স্মরণ করিলেই আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না; আমার সর্ব্বশরীরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়।

দর্প। কি বলুন।

দেওয়ান। একটী কোমলপ্রাণা রমণী একটী বালককে পুত্রবৎ স্নেহ করিত; সেও তাহার নিকট পুত্রের মত আবদার বাহানা করিত; সে যে তাহার প্রতি কু-ভাব অন্তরে পোষণ করিত, তাহা সেই সরল-হৃদয়া রমণী জানিত না। শেষে সেই অকৃতজ্ঞ বালক পশুপ্রবৃত্তির বশে জননী-সমা সেই রমণীর নিকট একদিন কু-প্রস্তাব করিল, রমণীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, সারা জগতের উপরই তাহার অবিশ্বাস জন্মিল।

সকলে বলিয়া উঠিলেন, "কে সে? আপনি কি গল্প বলিতেছেন, না প্রকৃত ঘটনা?"

দেওয়ান। না, গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা। বলিয়াছি ত' আমি অভিযোগ করিতেছি।

দর্পনারায়ণ। বলুন সে নির্য্যাতিতা রমণীই বা কে, আর সেই পাষণ্ড নরপশুই বা কে?

দেওয়ান। রমণী ?. রমণী—আমার সহধর্ম্মিণী! আর পুরুষ—আ—প—না—র পু—ত্র নিরঞ্জন!

সভাস্থ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। দর্পনারায়ণ কেমন একরূপ শূন্যদৃষ্টিতে দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। "নিরঞ্জন, নিরঞ্জন ?" "আমাদের নিরু ?" "দুগ্ধপোষ্য বালক সে," "সে ওসব কিছু জানে না," "তার মত ছেলে কোথায় হয়," "সে পাপ কথা কখনও মনে স্থান দেয় না," "পরের উপকারে, পরের বিপদে আপদে যে বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে, ও সব কথার তার ভাবিবারই অবসর নাই; সে আবার ও কাজ করবে," "গ্রামের সকল লোকে ওকে ভালবাসে," "এমনই সুন্দর এমনই মিষ্ট স্বভাব তার, গ্রামের ঝি বউ সকলে তাকে পেটের ছেলের মত দেখে, সকলে আদর যত্ন করে, সকলেই তাকে ডেকে কথা কয়, কই কেউত' কখনও তাকে উঁচু নজরে চাইতে দেখে নি", "হ্যাঁ, নিরঞ্জন না আরও কিছু", "বলতে ভুল হয়েছে, আর কাকেও মনে করে বলেছে"—ইত্যাদি কথার উপর কথা পড়িল, আন্দোলনের একটা তুমুল ঝড় বহিয়া গেল। দাদাঠাকুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া দেওয়ানকে মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর ইত্যাদি নানা সুন্দর উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঐ ত,' ঐ জন্যই পূর্ব্বে আমি অভিযোগ উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি নাই। আপনার লোক কিনা, সাপের লেজে অমনি পা পড়েছে। যাক, মহাশয়, আপনাদের পঞ্চায়েতের বিচার ঢের দেখিলাম, এখন ভালয় ভালয় ঘরে ফিরিলেই বাচি। খুব হয়েছে, আর না।" দেওয়ানজী এই কথা বলিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন।

দর্পনারায়ণ বাধা দিয়া অবিচলিত, অবিকম্পিত, ধীর, স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাইতেছেন, বসুন। যখন অভিযোগ উপস্থিত

করিয়াছেন, তখন তাহার বিচারও দেখিয়া যান। অভিযোগ গুরুতর, দণ্ডও তাহার অতি ভীষণ। আমার পুত্র বলিয়া বিচারের কোনও ক্রুটী হইবে না।"

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক। দেওয়ানজীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দাদাঠাকুর ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিচার কি? এর আবার বিচার, এর আবার তর্ক, এর আবার মীমাংসা! কোথাকার একটা হাঘরে হাড়হাবাতে অজানা অচেনা লোক একটা কথা বানিয়ে বল্‌লে, অমনই ঘরের সোনার চাঁদ ছেলেকে বনবাসে পাঠাতে হবে! ছেলে ব'লে ছেলে! হাঃ তোর ভাল হক্! ঐ যে শিবুদা বলত—"

দর্পনারায়ণ অতি কঠোরস্বরে বলিলেন, "দাদাঠাকুর, আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার অনধিকার-চর্চ্চায় পঞ্চায়েত অসন্তুষ্ট জানিবেন। আমার মতে আপাততঃ এস্থান ত্যাগ করাই আপনার কর্ত্তব্য। আপনারা কি বলেন?"

সেজকর্ত্তা দাদাঠাকুরকে একটু শাসাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুর, একটু চুপ করে থাকই না। কথাটা সব শেষ হতেই দাওনা। বল ত' গা, দত্তজা, কি তোমার বলিবার আছে।"

দেওয়ানজী। আজ কয়েক দিন পূর্ব্বে নিরঞ্জন আমার অনুপস্থিতিতে আমার গৃহে গিয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট বরাহ শিকার করিবার নিমিত্ত বন্দুক চায়। আমার পত্নী তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত, সেইজন্য চাহিবামাত্র বন্দুক দিল। শিকার করিয়া বন্দুক ফিরাইয়া দিতে আসিয়া নিরঞ্জন আমার পত্নীর নিকট অতি অভদ্র-জনোচিত শিষ্টাচার-বিগর্হিত অকথ্য কু-প্রস্তাব করে, এমন কি পশু-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সেই অসহায়া সরলা রমণীর উপর—

কথা শেষ হইল না। অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "রাম! রাম!

মত রাত্রে তাদের খিড়কীর বাগানে পুকুরপাড়ে ওৎ পেতে বসে রইলো। এদিকে যণ্ডা যণ্ডা চুহুরিরাও মোটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঝোপে ঝাপে তার জন্য অপেক্ষা করে রইলো। যেই বেটা এসে সঙ্কেত-স্থানে বসেছে, অমনি সেই যণ্ডার দল একবারে তাকে গলা টিপে মাটীতে চিৎ করে ফেললে, তার সঙ্গের দুটা বরকন্দাজ চুহুরিদের লাঠির বহর দেখে চম্পট দিলে। তখন চুহুরিরা তাকে মারধর না করে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই শীতকালের রাত্রে পানাপুকুরে চুবিয়ে রাখলে। বেটা যখন হাঁপিয়ে উঠে মাথা তোলে, তখনই অমনি তার মাথায় লাঠির বাড়ি পড়ে, আর সকলে হো হো হেসে ওঠে। এই রকমে তারা তাকে কিছুক্ষণ রেখে যখন সে হিমাঙ্গ হয়ে এলো, তখন তুলে সদর পথে ফেলে দিয়ে এলো। গ্রামের লোকে প্রাতঃকালে তার সেই পানামাখা মুখ দেখে দুঃখ করবে কি, হেসেই বাঁচে না।"

সকলে হো হো হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "আর তার মাগীটে! বেটী কি বজ্জাত! বাবা, ওর বাহার দিয়ে দরজার ধারে দাঁড়ান দেখেই বুঝেছিলেম যে ও কি জিনিষ।" দ্বিতীয়, "ও কথা বলো না, মিথ্যা কথায় পাপ হয়, ও আবার কবে বাহার দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো?" প্রথম, "দাঁড়ায় নাই? তোর চোখ থাকলে ত' দেখবি। আমি কত দিন দেখেছি।, শুধু তাই, এদিকে আবার শুনেছি কত্তাগিন্নীতে বিলাতী মধু খায়।" দ্বিতীয়, "এ্যাঁ, বল কি?" প্রথম, "হাঁ, বলি যা তা সত্য। ওদের মালীর কাছে শুনেছি।" তৃতীয়, "তা হক, সরাবই খাক আর যাই করুক, মাগীর চোখ দুটো কিন্তু বেশ, খাসা ভাসা ভাসা।" চতুর্থ, "কিন্তু ভাই বড় বেরসিক। গেলি গেলি, তা লোক কি আর খুঁজে পেলিনি। নিয়ে আবার মানুষ"। সকলে হাসিয়া উঠিল।

নরহরি তামাক সাজিতেছিল ; সে বলিয়া উঠিল, "আহাহা, দাদারা সব, ও সব কথা বল্‌তে নাই। হাজার হক্‌ গেরোস্তর বউ—ছেলের মা।"

নরহরির কথা শেষ হইল না, উচ্চহাস্য রোলে তাহার শেষ কথাগুলি ডুবিয়া গেল, সে অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল।

একজন হাসিয়া বলিল, নরু বেচারার ছেলে পুলে হয় নাই বলে, ও ছেলের মায়েদের একবারে স্বর্গের দেবতা দেখে। ভগবান ওকে সব সুখ দিয়েছেন, কেবল ঐ সুখটী থেকে বঞ্চিত করেছেন।"

সকলে 'আহা আহা' করিল। সকলের সহানুভূতি পাইয়া নরহরির মনটা ভিজিয়া গেল। সে একটু কাতরস্বরে বলিল, "মা বলেন, বড় বোয়ের ছেলে পুলে আর হবে না ; ও বাঁজা।"

দাদাঠাকুর পাশাখেলায় মজগুল ছিলেন। কতক কতক কথা তিনি শুনিয়াছিলেন ; শেষ কথাটাও তাঁহার কাণে গেল। অমনি একটু মুচকি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সেনজা, তুমি কেন একটা বাচ্ছাশুদ্ধ ধাড়ী বিবাহ করে ফেল না, তাহলে তোমার আহার ঔষধ দুই হবে।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কি ?"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "এই, তা হলে সেনজার বংশরক্ষাও হবে, আর ছেলের-মা-রূপ দেবতাও ঘরে আসবে।"

আবার উচ্চহাস্যের রোল উঠিল। দাদাঠাকুর এইবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না, তামাসা নয় ; সেনজা, বড় বোয়ের অপরাধ কি ? তার মত লক্ষ্মী বউ পেয়েছ, এই তোমার ভাগ্য। সারা গাঁয়ের লোকে শতমুখে তার সুখ্যাতি করে। তার কি ছেলে হবার বয়স

গিয়েছে ? আগে সাব্যস্ত হক, সে বাঁজা কি তুমি বাঁজা, তারপর তাকে দোষ দিও।"

একজন হাসিয়া বলিল, "সেনজা বাঁজা, সে কি রকম, হাঃ হাঃ হাঃ।"

দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, "চমকালি যে ? পুরুষ বাঁজা বুঝি হয় না। তোরা সেদিনের ছেলে, তোরা জানিস কি ? মেয়ের চেয়ে পুরুষ বাঁজাই বেশী।"

আর একজন বলিল, "তা যাই হক্, এখন সেনজার বংশটা যাতে রক্ষা হয় তাই হলেই হল।"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "ওরে, বংশ ত' ডিমের, বংশরক্ষার ভাবনাটা কিরে ?"

সকলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "ডিমের বংশ কি রকম ?"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "ডিমের বংশ কি, জানিস না ? তা তোরা জানবি কোথা হতে। আজ চারি পাঁচ পুরুষ আগে ঢাকাসহরে এই ডিমেই বংশরক্ষা হয়েছিল।"

সকলে সবিস্ময়ে দাদাঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। দাদাঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "হরকালী ঘোষ ঢাকার নিকট পীতমপুরের দশ আনী জমিদার। তাঁর নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। তাঁহার সতেরটী বিবাহ ছিল। সেই সব ভার্য্যার গর্ভে তাহার সর্ব্বসমেত ছত্রিশটী সন্তান হইয়াছিল। তাঁহার যখন ষাট বৎসর বয়স, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় শুনিলেন, এক বর বাদ্যাদি করিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে। হরকালী জিজ্ঞাসিলেন, "কে যায়।" পার্শ্বস্থ লোক বলিল, "বর যাইতেছে।" হরকালী হুকুম দিলেন, বর ধর। বর ধরা হইল ; জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা হইল, পাত্র কায়স্থসন্তান, পার্শ্বস্থ গ্রামে মিত্রদের ঘরে বিবাহ

করিতে যাইতেছে। বিবাহের নাম শুনিয়াই সেই পলিতকেশ গলিত অঙ্গ বৃদ্ধের মনে বিবাহ বাসনা জাগিয়া উঠিল। তখনই তিনি সেই পাত্রের টোপর ও চেলী খুলিয়া লইয়া নিজে বর সাজিয়া শুভযাত্রা করিলেন। তাঁহার লাঠিবাজির ভয়ে মিত্রেরা সেই রাত্রেই তাঁহাকে কন্যা অর্পণ করিল। কন্যা অতি বুদ্ধিমতী ; চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সে নিজের বুদ্ধিবলে সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল ; বৃদ্ধের নিজের আর অস্তিত্ব রহিল না। পঞ্চদশী মধুময়ী ভার্য্যার কথায় তাঁহার জীবন মরণ নির্ভর করিত। সকলেই জানিত বৃদ্ধের আর সন্তানাদি হইবে না ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই পঞ্চদশী ভার্য্যার গর্ভে বৃদ্ধের অবশেষে এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সকলে অবাক ; দুষ্ট লোকে নানা কাণাঘুষা করিতে লাগিল ; কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ঔষধ মাদুলীর ফল ফলিয়াছে। দুষ্ট লোকের কথাই কিন্তু বেশী রাষ্ট্র হইল, দেশময় একটা টিটি পড়িয়া গেল ; শেষে গুজগুজুনি ফুসফুসুনির জ্বালায় কাণ পাতা দায় হইয়া উঠিল। কথাটা বৃদ্ধের কাণে উঠিল, বৃদ্ধ মনে দারুণ ব্যথা পাইলেন। তাঁহার ভয়ে প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিত না বটে, কিন্তু আড়ালে যে কথাবার্ত্তা চলিত প্রায় সবই তিনি কোনও না কোনও উপায়ে শুনিতে পাইতেন। ক্রমে কথা এত বাড়িল যে, তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। জমিদারের বৈঠকখানায় একদিন কথাচ্ছলে ঐ কথা ঘুণাক্ষরে উঠিবামাত্র বৃদ্ধ জমিদার চটিয়া আগুন, তাড়া করিয়া সকলকে মারিতে গেলেন ; সকলে পলাইল, কেবল নিবারণ ভট্টাচার্য্য ও মুকুন্দ হুঁই নামক দুইটী তাঁহারই তুল্য স্থবির লোক বসিয়া বসিয়া ভৎসনা খাইলেন। বৃদ্ধ হরকালী বিষম উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া অন্দরের প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন। সেখানে এক পার্শ্বে দুইটী বড় বড় কাষ্ঠপাত্র ছিল। হরকালী তাঁহাদিগকে সেই কাষ্ঠাধারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আদেশ করিয়া সক্রোধে বলিলেন,

'পাজী বেটারা, নচ্ছার বেটারা, কাণা বেটারা, আমায় পাগল করে তুলেছে। বলে কি না—সন্তান হল কি ক'রে? ওরে হারামজাদা বেটারা, সন্তান হয় কি কোরে? জোর থাকলেই হয়। বেটারা আমার মরদ যোয়ান! আমার প্রস্রাবে অমন কত যোয়ান বেরিয়ে যায়। দেখ ত' ভটচাজ একবার ঐ দুটো পাত্রের দিকে তাকিয়ে। ভটচাজ বলিলেন, 'ও ত' দেখতেই পাচ্ছি, ওদুটো কেঠো; হংসডিম্বের খোলায় বোঝাই। তা ওতে কি হ'ল?' হরকালী বলিলেন 'কি হ'ল?' হ'ল আমার গুষ্টির মাথা! শেষ বিয়ে করে অবধি কবিরাজী মত নিয়ে- প্রত্যহ ঐ এক একটী ডিমের কুসুম ভক্ষণ করা হত, বুঝেছেন মহাশয়েরা? ছেলে কি অমনি হয়েছে? বেটারা বলে বুড়ো! আরে একশ' বছর না পেরুলে আবার বুড়ো হয় কোথায় রে বেটারা? পীড়ায় আমায় কিছু কাবু করেছিল বই ত' নয়। তা ডিমের জোর কি? যে বেটারা কুচ্ছ করে বেড়ায়, মনে করলে সে আবাগের বেটাদের বংশরক্ষা করে দিতে পারি, তা জানিস?' "

দাদাঠাকুরের এই অভিনব গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া আকুল। একজন হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হলে, দাদাঠাকুর, আমাদের সেনজাও ত' সহজে বংশরক্ষা করতে পারে। ডিমের অভাব নাই, মুচিপাড়ায় মুসলমানপাড়ায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। কি বল সেনজা, রাজী আছ?"

নরহরি বিমর্ষবদনে উত্তর দিল, "আমি আর কি বলিব? তোমরা যা হুকুম করো, তাই তামিল করবো।"

দাদাঠাকুর নরহরির বিষণ্ণবদন দেখিয়া মনে ব্যথা পাইলেন। তিনিই যে ইহার কারণ, তাহা বুঝিয়া নরহরিকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "আরে, না না; কি পাগলের মত তোমরা বল। হচ্ছে একটা গল্পের কথা। এতে নরহরির কথা এল কেন?

বড়বৌএর কি বয়েস গেল? সে কচি ছেলে, এখনই কি সন্তান হবার সময় গেছে? সেন-জা, ওসব কথা ভেবো না। তুমিও যেমন, বিধাতা যখন দেবেন তখন এমনি দিতে আরম্ভ করবেন যে আর না আর না করতে হবে।”

দাদাঠাকুরের কথাও শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে তিনকড়ি তাম্বুলী উপস্থিত; সে দর্পনারায়ণ বসুর পুরাতন ভৃত্য। সে আসিয়াই অতি ব্যস্তভাবে বলিল, “দাদাঠাকুর আছ এখানে?”

সকলে বলিল, “কেন কেন? কি হয়েছে? এত ব্যস্ত কেন?”

তিনকড়ি। আপুনি শীঘ্র এস, গিন্নীমা ডাকছে, দাদাভাইএর বড় অসুখ, কবিরাজ মশয় এসেছে, চুড়োমণি ঠাকুরমশয় এসেছে, মেজকর্ত্তা নকর্ত্তা সব্বাই এসেছে। আপনারে চট ডেকেছে।

দাদাঠাকুর। এঁ্যা, সে কিরে? নিরুর অসুখ? এই যে সন্ধ্যার আগে দেখে এলেম ভাল। ছোটকর্ত্তা আবার বাড়ী নাই। চল, চল।

তিনকড়ি। আজ্ঞে হাঁ।

রসিক ঘোষ জিজ্ঞাসিলেন, “আজ্ঞে হাঁ কি রে?”

তিনকড়ি। আজ্ঞে, সন্ধ্যার আগে ভাল ছিল। সন্ধ্যার পরে মাথা কামড়াচ্ছেন বলে শুয়ে পড়ল। দেহ তপ্ত হয়ে উঠলো, বেভুল বকতে লাগলো, চক্ষু করমচা হয়ে উঠলো। গিন্নীমার ডর পেলে। কবরেজ ডাকতে পাঠালে। এখন একযাই মাথা ঢেলে ঢেলে তুলতেছে। উমোচরণ পরামাণিকেরে ডাকিয়ে মাথা কামিয়ে দিলে. জলপটী দিলে। ঠাকুরগো, কি হবে”—বলিয়া বৃদ্ধ ভৃত্য ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সকলেরই চোখে জল দেখা দিল।

দাদাঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “ভয় কি? ও কিছু নয়, জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে এখন। জলপড়া দেব, নারায়ণের তুলসী দেব. ভয় কি?”

তিনকড়ি। আজ্ঞে, ঘরে এই বিপদ, তার উপরে আর এক বিপদ জুটেছেন। ডাকাতের লেখন এসেছেন।

সকলে সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসিলেন, "সে কি রে?"

তিনকড়ি। আজ্ঞে, জীবনে ডাকাত কর্ত্তার নামে লেখন পাঠিয়েছেন। কাল রাত্তিরে কর্ত্তার বাড়ী ডাকাত পড়বেন, আপনারা সব সাবধান হবে।

সকলে। এঁ্যা, বলিস কি? বলিস কি?

দাদাঠাকুর। তাইত, এ যে বিষম ব্যাপার! কর্ত্তা গ্রামে নাই, কি হবে!

দুর্গাদাস বসু কুস্তিবীর পালোয়ান, বলিষ্ঠ ও সাহসী যুবক। সে লম্ফ দিয়া বাহু আস্ফোটন করিয়া কহিল, "হবে আবার কি? আসুক সেই জীবনে, একবার দেখে নেব তাকে! ওঃ! অমন ঢের জীবনে দেখেছি!" অপর একজন কহিল, "কার সাধ্য এ গাঁয়ে ডাকাতি করে! এমন ডাকাত আজও জন্মায় নি।" শূলপাণি বলিল, "ভাই সব, আমরা গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান, ভাই ভাই এক হয়ে লাঠি ধরে দাঁড়াব। আসুক ডাকাত। নাইবা থাকলেন ছোট কর্ত্তা।"

দাদাঠাকুর উদ্বিগ্নচিত্তে এসব কথা শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে কহিলেন, "সে পরে হবে। আপাততঃ চল নিরুকে দেখে আসি।"

সকলেই নিরঞ্জনকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনকড়ি ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, কবরেজ মশয় আজ একবারে ভিড় করতে নিষেধ করেছে। কেবল গিন্নীমা দাদাঠাকুরকে যেতে বলেছে।"

নরহরি বিষণ্ণচিত্তে বলিল, "তিনুদা, আমারও নিষেধ?"

তিনকড়ি বলিল, "হাঁ, দাদা। তোমরা কাল সকালে যাবেন।"

সকলে দাদাঠাকুরের সঙ্গে দর্পনারায়ণের গৃহে গেলেন; দাদাঠাকুর অন্তঃপুরে গেলেন, সকলে বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনকড়ি অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আনিল, অবস্থা পূর্ব্ববৎ। সকলে দারুণ দুর্ভাবনা অন্তরে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

নরহরি যখন ঘরে ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সারাগ্রাম নিস্তব্ধ। পথে আসিবার কালে নরহরি নানা কথা মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। নিরঞ্জনের পীড়া, ডাকাতি, নিজের সংসার,—কত কথাই সে ভাবিল। একেই সে সংসারের দুঃখ কষ্টের ঝড় ঝাপ্টা সহ্য করিতে পারিত না, তাহাতে এতগুলা দুর্ভাবনার কথা মনে উদয় হইল, তাহার মাথা কেমন করিতে লাগিল, সংসারের সকল দ্রব্যেই যেন কেমন তাহার একটা বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। সে ভাবিল, "দাদাভাইএর কেন এমন অসুখ হইল? আহা রূপে গুণে এমন ছেলে কি হয়? বেশ থাকি, অসুখ বিসুখ কেন হয়? মানুষ কি অসুখ ছাড়া থাকতে পারে না? দুঃখ ভোগ না করলে কি জীবন কাটান যায় না? আচ্ছা, দাদাভাইএর অসুখ যদি শক্ত হয়, যদি কবিরাজের ঔষধ না খাটে, যদি—যদি—ওরে বাপরে! না না ও সব ভেবে কাজ নাই। মা দুর্গা মুখ তুলে চাইবেন, দাদাভাই ভাল হয়ে উঠবে, আমাদের গিন্নীমার মুখে হাসি দেখবো, সাত দিন ধরে হরিলুঠ দেব, হরি সঙ্কীর্ত্তন করবো। গিন্নীমার মনে ঠাকুর কখনও কষ্ট দেবেন না। গাঁ শুদ্ধ লোকের মা যিনি, তাঁর মনে কি ঠাকুর কষ্ট দিতে পারেন? আমার মন বলছে, কখনও দেবেন না। আচ্ছা জীবনে ডাকাতের এ বুদ্ধি হলো কেন? কি অপরাধ করেছেন ছোটকর্ত্তা? যিনি, লোকের আপদে বিপদে বুক দিয়ে পড়েন, যাঁর মুখ চেয়ে কত লোকে কত বিপদ থেকে উদ্ধার পায়, যিনি গাঁয়ের লোকের মা বাপ, খাওয়াতে পরাতে আদর যত্ন করতে যাঁর ঘরের

অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা, যাঁরা ভুলেও কখনও কাহার অনিষ্ট করেন না, তাঁদের ঘরে ডাকাতি? বেটার নরকেও স্থান হবে না। তা ডাকাতের আবার নরক কি? ওরা কি ভালমন্দ লোক বাছে? যখন যার ঘরে সুবিধা বোঝে, তারই ঘরে চিলের মত ছোঁ মেরে পড়ে। তা হোক, আমরা গাঁয়ের লোক থাকতে ডাকাতে শীঘ্র কিছু করতে পারছে না। গায়ে এক ফোঁটা রক্ত যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ছোট-কত্তার বাড়ী ডাকাতে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু ডাকাতের হাতে যদি প্রাণ যায়, তা হলে কি হবে? যায় যাক, তা হ'লে এই সংসারের ভাবনার হাত এড়াতে পারবো। আচ্ছা, আমি মরে গেলে কেউ কি কাঁদবে? হাঁ কাদবে বৈ কি? মায়ের আমার কেঁদে কেঁদে প্রাণটা বেরিয়ে য়াবে; আর ভাই বোন কটাও কাঁদবে। আর—আর—মালতী কাঁদবে কি? বয়ে যাচ্ছে তার। আগে সেধে কথা কইলেও কথার জবাব দেয় না, কেবল বিয়ের কনের মত ঘোমটা টেনে দিয়ে জুজুবুড়ীর মত জড়সড় হয়ে হুঁ হাঁ করে সেরে দেয়, পাশ কাটিয়ে কেবল পালাবার চেষ্টা করে, দেখায় যে বড় লজ্জা; আঃ তোর লজ্জার কাঁথায় আগুন দি! লজ্জা না আরও কিছু! ও কেবল রূপের দেমাক। ওরে আমার খুকুরে! বাঁজা মেয়ে মানুষের আবার দেমাক কিসের রে! ওর জ্বালায় দেশে মুখ দেখান ভার হয়েছে। আমায় আজ সকলে কি তামাসাই না কল্লে! না, মাকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে, আমাকেও মাল্লে। ওর আর মুখ দর্শন করবো না।"

ক্রমে নরহরির ক্রোধ সপ্তমে চড়িল; দুর্ভাবনা-সঞ্জাত এই ক্রোধের বোঝা সরলা অবলা পত্নীর উপরেই পড়িল। ক্রোধ পত্নীর উপর প্রায়ই যে হইত না এমন নহে, তবে আজ মাত্রাটা কিছু বেশী। প্রায়ই দেখা যায়, পৃথিবীতে যাহারা বাহিরে নিরীহ নির্ব্বিবাদী, অন্তঃপুরই তাহাদের

ক্রোধ প্রকাশের প্রকৃষ্ট স্থান; যাহারা শারীরিক বা মানসিক দুর্ব্বলতার অধীন, তাহারা প্রায়ই পত্নীর উপরেই বীরত্ব ফলায়। নরহরির প্রকৃতি এইরূপই ছিল; কাজেই সে যখন বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া অন্তঃপুরে শয়ন করিতে গেল, তখন মালতীর উপর তাহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

নরহরি শয়ন ঘরে গিয়া দেখিল, ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, কিন্তু মালতী তথায় নাই। একে মনসা, তায় ধূনার গন্ধ পড়িল; নরহরির মনাগুন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধ হইলে বিজ্ঞ মানুষেরও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ক্রোধের বশে নরহরির মনে নিষ্পাপ মালতীর নির্ম্মল চরিত্রের উপরও সন্দেহ হইল। সে একবার শয্যার উপর উপবেশন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; একবার শূন্যমনে কক্ষস্থিত সুসজ্জিত সুমার্জ্জিত তৈজসপত্রাদির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঘরের বাহির হইল ও চোরের ন্যায় অতি সন্তর্পণে এঘর ওঘর উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। জননীর ঘরের ভিতর অবলোকন করিয়া দেখিল, জননী ও দুই ভগ্নী নিদ্রা যাইতেছে, মালতী জননীর পদসেবা করিতেছে। নরহরির চমক ভাঙ্গিল; আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিয়া ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য! কেমন ভোলা মন, কিছু স্মরণ থাকে না। মালতী প্রত্যহই এইরূপ করে, তবে কেন সন্দেহ হইল? কিন্তু ওসব তার লোক-দেখানো। মাকে যদি আন্তরিক ভালবাসিত, যত্ন করিত, তা হ'লে মার চোখে রোজ জল পড়িত না। শোকে তাপে মা আমার একে পাগলের মত হয়েছেন, তার উপর তাঁকে একদিনও শান্তিতে থাকতে দিলে না। হাড়হাভাতে ছোট লোকের ঘরের মেয়ে কিনা? আবার কথায় কথায় চোখে পানি আসে! কিছু বলিবার যো নাই। ওরে আমার ভাবরা-চোখী রে! হারামজাদী কি

কম পাজী, কথার জবাব দেয় না, লজ্জার ভাণ করে মুখ পুড়িয়ে বসে থাকে। মা যে বলেন, ও বেটী যাদু জানে, তা ঠিক ; তা না হ'লে রেমো আর পুঁটীকে ভেড়াভেড়ী করে রেখেছে ? বেটী নিশ্চয় যাদু জানে, কোন দিন আমায় খাবে। না, ওরে আর এখানে রাখবো না, বাপের বাড়ী দূর করে দেবো, দেখে আসুক কত ধানে কত চাল। আ মলো, আমি চাই বেশ মিলে মিশে থাক্, কোনও ভাবনা চিন্তে থাকবে না। তা না রাতদিন কিচিকিচি, কাণ ঝালা-পালা করে দিলে, আমার ঘর ছেড়ে বনে পালাতে ইচ্ছা করে—"

নরহরির চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। নরহরি দেখিল, মালতী আসিয়াছে। রাত্রিতে বাটীর সকলে ঘুমাইলে তখনকার কালের অল্প-বয়স্কা গৃহস্থবধূরা অতি সন্তর্পণে স্বামী সকাশে যাইতেন ; দিবসে স্বামী-স্ত্রীতে নির্জ্জনে সাক্ষাৎলাভ তখনকার দিনে অসম্ভব ছিল। মালতীও সকলকে ঘুম পাড়াইয়া অতি সন্তর্পণে শয়ন করিতে গিয়াছে। নরহরি চটিয়া আগুন হইয়া আছে। সে প্রথমে কথাই কহিল না, কেবল মনে মনে গজরাইতে লাগিল ; ভাবিল—দেখি আগে কথা কহে কিনা। মালতী ঘরে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল, বাঁশের আলনার উপর কাপড়চোপড়গুলি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ঠিক করিয়া রাখিল ; জলচৌকির উপর সুসজ্জিত বাসনগুলি সযত্নে ঝাড়িল ; শেষে দীপনির্ব্বাণ করিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া শয্যার উপর স্বামীর পদতলে বসিল,—পাছে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয়! মালতীর দৃঢ়বিশ্বাস, স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন। সে ধীরে ধীরে সযত্নে স্বামীর পা দুখানি ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কোমল হস্তাবমর্ষণ করিয়া পদসেবা করিতে লাগিল ; একবার পা দুখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতি সন্তর্পণে চুম্বন করিল ও অমনি তখনই ক্রোড়ে লইয়া সেবায় মন দিল ; যেন কত অপরাধ করিয়াছে, যেন চোরের ন্যায় চুরি

করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে! হিন্দু গৃহস্থ বধূর এই নীরব নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম পবিত্র প্রেমের তুলনা জগতে আছে কি?

নরহরি এতক্ষণ নিদ্রিতের ন্যায় ভাণ করিয়া ছিল। সে মালতীর ব্যবহার বিপরীতভাবেই গ্রহণ করিতেছিল; সে ভাবিতেছিল—মালতী জানে সে জাগিয়া আছে, অথচ দেখাইতেছে, যেন সে জানে না, তাই তাহাকে দেখাইয়া সে ঐরূপ করিতেছে। দুর্ব্বল মন এইরূপ সন্দিগ্ধই হইয়া থাকে। নরহরি যতই ঐসব কথা চিন্তা করিতেছিল, ততই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। একেই পূর্ব্ব হইতে সে মালতীর ঘাড়ে যত ক্রোধের বোঝা চাপাইতেছিল, তাহার উপর এখন অগ্নিতে ইন্ধন-সংযোগ হইল, শেষে আগুন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

নরহরি অতি কর্কশকণ্ঠে বলিল,--"এতক্ষণ কোথায় ছিলি?"

ঘর অন্ধকার হইলেও মালতী শয্যাত্যাগ করিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল ও গায়ের কাপড় টানিয়া দিল।

নরহরি পুনরপি সক্রোধে জিজ্ঞাসিল,—"কোন চুলোয় ছিলি বল্ না?"

মালতী সভয়ে কহিল, "মা ঘুমান নাই, সেখানে ছিলাম।"

নরহরি। ওরে আমার সীতে সতীরে! মার ঘুম হল না ত' ওর বয়ে গেল! ওসব বুজরুকি দেখাস বাপের বাড়ী গিয়ে, এখানে চলবে না। মা যে বলেন মিথ্যে নয়, ওর পা থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সব মিথ্যে, মিথ্যের ধুকড়ী!

মালতী। (অধোবদনে নিরুত্তর)।

নরহরি। চুপ করে রইলি যে? এই, এইবার নেকাম আরম্ভ হল, চুপ করে লজ্জা দেখাবেন। আলো নিবালি কেন? আলো জ্বাল।

মালতী প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া এক পার্শ্বে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সেই ভাব দেখিয়া ক্রুদ্ধ নরহরির আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। সে বেগে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল ও সক্রোধে কহিল, "দেখ্, নেকীপণা রাখ। ভাল চাস্ ত' ঘোমটা খুলে দাঁড়িয়ে কথার জবাব দে, না হলে আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

মালতী তখনও অধোবদনে নিরুত্তর রহিল। নরহরি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কথার জবাব দিবি নি হারামজাদী—"

মালতী ছুটিয়া গিয়া তাহার পদতলে মুখ লুকাইয়া দুই হাতে পা দুটী ধরিয়া সকাতরে বলিল, "ওগো তোমার দুটী পায় পড়ি, চেঁচিও না, মা উঠে পড়বেন, সকলে উঠবে—"

ক্রোধে নরহরির মনুষত্ব তখন পশুত্বে পরিণত হইয়াছে। সে সবলে মালতীর নিকট হইতে পদ আকর্ষণ করিয়া লইল। ইচ্ছা করিয়া সে যে পদাঘাত করিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অনিচ্ছায় সেই পদাকর্ষণ পদাঘাতের অপেক্ষা মালতীর মুখে ও বুকে অধিক বাজিল; মালতী তাহার ফলে দূরে বাসনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল; ঝন ঝন করিয়া সাজান বাসন ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেল; নীরব নিশীথে বাসনের সেই শব্দ বজ্রপতনের মত অনুমিত হইল। গৃহের সকলেই জাগিল; সকলেরই মনে হইল, নরহরির ঘরে কি এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে; রাম, ভজ ও হরিমতী দ্রুতপদে নরহরির ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া "দাদা দাদা" বলিয়া ডাকিল।

নরহরি কোমলপ্রকৃতি ছিল; অন্য সময় হইলে সে একটা অজ্ঞাত অপরিচিত লোককেও মালতীর মত অবস্থায় পড়িতে দেখিলে

সযত্নে তাহার সেবা করিত; কিন্তু আজ সে ক্রোধে অভিমানে পশু অপেক্ষাও অধম হইয়াছে; তাহার উপর দ্বারে ভাই ভগিনী উপস্থিত; মালতীর কি দারুণ ব্যথা বাজিয়াছে, সে ফিরিয়াও দেখিল না। একবার প্রাণটা একটু কাঁদিয়াছিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অভিমান তাহাকে চাপিয়া ধরিল। নরহরি ভ্রাতা ভগিনীর সাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া দাওয়ায় আসিল ও শ্লেষের স্বরে বলিল, "যাও, তোমাদের আদুরে সোহাগের বউ কেমন নেকরা কচ্ছে দেখ গিয়ে, আমি তামাক খেয়ে আসি।"

নরহরি এই কথা বলিয়া বাহিরে গেল। হরিমতী দ্রুতপদে ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রদীপের আলোকে যাহা দেখিল, তাহাতে শিহরিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিল, "ওমা, কি সর্ব্বনাশ গো! ও মেজদা, শীঘ্র এস, ওগো দাদাকে ডাক।"

"কি, কি রে, বেঁচে আছে ত' রে,"—বলিয়া রামহরি উন্মত্তের মত ঘরে প্রবেশ করিল; ভজহরিও তাহার অনুগমন করিল। ঘরে গিয়া যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল, তাহাতে রামহরি বসিয়া পড়িল। সে দেখিল, ঘরে রক্তগঙ্গা, সারা মেঝের উপর রক্তের ঢেউ খেলিতেছে, তৈজসপত্রাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, সেগুলিও রক্তমাখা, আর হরিমতী মালতীর রক্তাক্ত অচেতন দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিয়া অঞ্চলে রক্ত মুছাইতেছে এবং "ও বৌ, বৌ" বলিয়া ডাকিতেছে। রামহরি সকলই বুঝিল।

হরিমতী বলিল, "মেজদা, গোবরগণেশের মত বসে রইলে কেন? শীঘ্র ঐ কলসী হতে জল নিয়ে এসে বৌএর চোখে মুখে দাও; বোধ হয় কপাল কাটিয়া গিয়াছে।"

রামহরি বলিষ্ঠ, সাহসী ও নির্ভীক; কিন্তু রক্তস্রোত দেখিয়া তাহার সাহস উড়িয়া গিয়াছে, সে তাড়াতাড়ি জল আনিয়া দিয়া হরিমতীকে

বলিল, "পুঁটী, তোরা যা হয় কর, আমার আর হাত পা আসছে না, আমি দাদাঠাকুরকে খবর দিই গিয়ে।"

হরিমতী ইঙ্গিতে যাইতে নিষেধ করিয়া মালতীর মুখখানি তুলিয়া ধরিল, ভজহরি চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। জলে রক্ত ধৌত হইয়া গেলে হরিমতী সভয়ে দেখিল, ক্ষতস্থান অতি গভীর, তাহা হইতে অবিশ্রাম রক্ত বাহির হইতেছে।

এদিকে নরহরি হরিমতীর চীৎকারে ভয় পাইয়া দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করিল। দাওয়ার উপর উঠিয়াই সে বুঝিল, মালতীর চৈতন্য হইয়াছে, মালতী অতি ক্ষীণস্বরে বলিতেছে, "মা"। নরহরি থমকিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, হরিমতী বলিতেছে, "বৌ, লক্ষ্মীটী আমার, কি চাই বউ, জল দেব, দুধ দেব ?" মালতী রামহরিকে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিতে গেল, কিন্তু দুর্ব্বল হস্ত উঠিল না। রামহরির দুই চক্ষে দরদর ধারা বহিতেছিল, সে মুখ ফিরাইয়া লইল। মালতীর ক্ষতের রক্তস্রাব একটুকু কমিয়াছে, সে উঠিয়া বসিয়া হরিমতীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়াছে। হরিমতী ভজহরিকে রেড়ীর তৈলে নেকড়া ভিজাইয়া আনিতে বলিল ও রামহরিকে গেঁদা গাছের কচিপাতা আনিতে বলিল। তাহারা দ্রুতপদে সেই আদেশ পালন করিতে গেল। নরহরি অন্ধকারে খুঁটীর আড়ালে লুকাইয়া সকলই দেখিল।

হরিমতী অতি কোমল মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিল, "বৌ, কি হয়েছিল, সত্যি বলবি ? দাদা ফেলে দিয়েছে, কেমন না ?" মালতী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "না না, অমন কথা কেন বলছ ? আমায় ফেলে দেবে কেন, আমি পোড়ারমুখী অন্ধকারে হুচট খেয়ে পড়ে গেছি।" হরিমতী হাসিল, বলিল, "বৌ আমার কাছে মিথ্যা কথা ? ঘর অন্ধকার কোথায় ছিলো বোন ?" মালতী অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল; কিছু পরে বলিল, "না, বোন, সত্যি বলছি আমি পড়ে গেছি। মা

উঠেছেন কি? শচীও বোধ হয় উঠেছে। ওমা, কি চলানটাই চলালেম।”

সেই সময়ে রেড়ীর তৈলে ভিজা নেকড়া ও গাঁদাপাতা আনীত হইল। হরিমতী ক্ষত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া সেই পাতা ছেঁচিয়া পুরিয়া দিল ও ক্ষত পূর্ণ হইলে তৈলসিক্ত নেকড়া তাহার উপর বাঁধিয়া দিল।

নরহরি অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সব শুনিল। তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। এই কি সেই স্ত্রী, যে ভাণ করিয়া পদসেবা করিতে আসে? মার খাইয়াও যে মার চুরি করে, এই কি সেই মালতী? নরহরি আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বাহিরে গেল। সেখানে অন্যমনা হইয়া তামাক সাজিতেছে, এমন সময় শুনিল, তাহার পার্শ্বে বসিয়া কে কি জিজ্ঞাসা করিতেছে। সে চমকিত হইয়া দেখিল, পার্শ্বে রামহরি; জিজ্ঞাসা করিল, “কেরে রামা, কি চাস্?”

রামহরির মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, চক্ষু আরক্ত; সে বলিল, “আমি কাল হতে বসন্তপুরে গিয়ে হারাণকাকার ওখানে বাস করতে চাই। কি বল?”

নরহরি বুঝিল। এ দিকে যাহাই হউক, সে ভ্রাতা ভগিনীদিগকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত। রামহরির কথায় যেন তাহার বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে ছলছলনেত্রে কাতরস্বরে বলিল, “রাম, আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবি কেন, আমি তোদের যে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি।”

রামহরির মন একটু গলিল, সে বলিল, “না দাদা, তোমার মত ভাই কারও হয় না। যতদিন বাঁচবো তা মনে থাকবে। সেই জন্যই যেতে চাচ্ছি, এমন দাদার পাছে কখনও অসম্মান করি।”

নরহরি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, “কেন, তা করলিই বা। তুই আমায়

ধরে মাল্লেও কখনও কথা কব না। তোরা কি আমার ভাই, তোরা যে আমার বুকের পাঁজরা!"

রামহরি বলিল, "না দাদা, তা হ'লেও থাকা হবে না। কি জানি, আমি গোঁয়ার মুখ্‌খু; রাগ চণ্ডাল, রাগের বশে কি করে বসি। আজ বৌএর উপর যে ব্যবহার করেছো, আজ বড় রাগ সামলে গেছি। দাদা! ঘরের লক্ষ্মী চিনতে পার নি, তাই পাঁয়ে করে ঠেল্‌ছো। বুঝছি এই রকমই হবে, আমার কি সাধ্য বারণ করি। কিন্তু সামনে বসে চখে দেখ্‌তে পারবো না। কোন দিন শেষে কি করে বসবো? তাই যেতে চাচ্ছি, তোমার মত কি?"

নরহরি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে বলিল, "ভাই, তুমি বড় হয়েছ, তোমায় আর বুঝাব কি? তবে এই কথা বলি, সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য ভায়ে ভায়ে মন কসাকসি কেন কর?"

রামহরি। মন কসাকসির ভয়েই আগে হতে তফাতে থাকছি। কাছে থাকলে বরং অন্যরূপ হত। কালে যখন তোমার বা মায়ের মতি গতি ফিরবে, যখন বৌ যে কি তা বুঝতে পারবে, তখন ঘরে ফিরে এলে আবার ভায়ে ভায়ে যেমন ছিলাম তেমনই হব। কিন্তু এখন মন কসাকসি হলে আর উপায় নাই।

নরহরি। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বড় বৌকে আমি যতটা বুঝি, তার চেয়ে কি তোমরা বোঝ বেশী? আমার কথা ছেড়ে দাও, ঘরে এসে পর্য্যন্ত মার মনে যে একদণ্ড শান্তি দিলে না, সে বৌ কি কখন ভাল হয়? কি জানি ভাই, যা ভাল বোঝ কর। শেষে আমায় যেন লোকে না দোষে।

রামহরি। কেন দাদা, লোকে দুষবে কেন? আমি ধানের ব্যবসায়ের জন্য দিনকতক খুড়োর বাড়ী বাস করতে যাচ্ছি, তাতে দোষ কি হল? যাক, কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে, বেশী কথা ভাল বাসি

না। আমি কাল যাবই, তুমি বাধা দিও না। তবে আমার একটা অনুরোধ,—বউকে একটু ভাল চক্ষে দেখতে অভ্যাস করো, ঘরের লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হবেন।

নরহরি। যা যা, তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না।

নরহরি এই কথা বলিয়া, যে ঘরে তাহার মাতা এত গোলযোগ শুনিয়াও ঘরের বাহির না হইয়া ছোট কন্যাটীকে লইয়া নিশ্চিন্তে শুইয়া ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। রামহরি সেইখানে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

জীবনের বিচার।

স্বরূপনগরের মণ্ডলদের ঘরে ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই ডাকাতির কথা যত্র তত্র আলোচিত হইতেছে। সকলেই বলিতেছে এমন ডাকাতি কখনও হয় নাই। মণ্ডলেরা তেজারতী মহাজনীর কারবার করিত। তাহারা অতিরিক্ত সুদখোর। তাহাদের সুদের জ্বালায় দুঃখী গৃহস্থ ও কৃষক দেশ ঘর ছাড়িয়া পলাইত। তাহাদের উৎপীড়নে অনেকের বাস্তুভিটা গিয়াছে, অনেকের সংসারে হাহাকার পড়িয়াছে। তেজারতী মহাজনীতে তাহারা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। লোকে বলিত, তাহাদের টাকায় ছাতা ধরিয়াছে। এ কথার একটা তাৎপর্য্যও ছিল; তাহারা যেমন প্রভূত ধনার্জ্জন করিত, তেমনি অর্থ বুকের রক্ত মনে করিয়া জমাইয়া রাখিত; অশনে বসনে, পালে পার্ব্বণে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে তাহারা কার্পণ্য প্রকাশ করিত; অর্থের সদ্ব্যবহার তাহারা জানিতই

না, অধিকন্তু অর্থের ভোগেও তাহারা বঞ্চিত ছিল। দান, অতিথি-সেবা, দেবদ্বিজসেবা, বিপন্ন আতুরের সেবা, কূপতড়াগবৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সদনুষ্ঠানের পথ দিয়াও তাহারা যাইত না; ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, ভাল শুইবে, ভাল বসিবে,— ইহাও তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। জগতে চিনিয়াছিল তাহারা কেবল অর্থ, আসিয়াছিল জগতে তাহারা উপার্জ্জন করিতে অর্থ, জন্মিয়াছিল তাহারা পাহারা দিতে অর্থ অর্থ তাহাদের সেবা করিত না, সেবা করিত তাহারাই অর্থের।

বহুদিন হইতে এই মণ্ডলদের উপর জীবন সর্দ্দারের নজর ছিল। পূর্ব্বেই [illegible] হইয়াছে যে, জীবন সর্দ্দার অত্যাচারী অহঙ্কারীর যম ছিল। ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে জীবন সংবাদ পাইল, মণ্ডলেরা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই ব্রাহ্মণ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মণ্ডলদিগের নিকট সর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হত-ভাগ্য ব্রাহ্মণ জানিতেন না যে, সেই কার্য্যে তিনি আপনার পদে আপনিই কুঠার হানিয়াছেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেন না; মণ্ডলেরা সে সময়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিল না; সুদের উপর সুদ বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হাত পাতিয়া ঋণের আসল টাকাটা সংগ্রহ করিলেন ও হৃষ্টচিত্তে মণ্ডলদিগের বাটী ঋণ পরিশোধ করিতে গেলেন। সেখানে মহাজনদিগের সম্ভাষণ শুনিয়াই তাঁহার চক্ষুঃস্থির হইল; তিনি বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া আপাততঃ আসল টাকাটা লইতে অনুরোধ করিলেন। পাষাণও গলে, কিন্তু কৃপণের হৃদয় গলে না।

মণ্ডলদিগের কর্ত্তা হো হো হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এখনই সুদে আসলে টাকা দিলেই বা নিচ্ছে কে হে? জমিজমা বাস্তটুকু দেখে বলেই তোমার মত উঞ্ছ লোককে কর্জ্জ দেওয়া হয়েছিল।"

ব্রাহ্মণের মুখ শুকাইল, তিনি কাতরে বলিলেন, "কি বলিতেছেন মহাশয়, গরীব ব্রাহ্মণকে নিয়ে তামাসা কচ্ছেন কি ?"

মণ্ডল বলিল, "তামাসা ? দেখতেই পাবে। বিটলে বামুন! মনে নাই তোর ভিটের পূবের জমিটুকু হলুদের চাষের জন্য কিনতে চেয়েছিলাম, ওটা আমার হলুদ-ভূঁইএর এক লপ্তা ? তুই তাই শুনে আমার গোমস্তাকে মারতে এসেছিলি ?"

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি মারতে যাব কেন ? জমী ত' আমার ছিল না। তখন আমার পিতৃদেব বর্ত্তমান।"

মণ্ডল কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "ঐ হল ; তুই কি আর তোর বাপই কি, ও দুইই সমান, এপিঠ আর ওপিঠ।"

ব্রাহ্মণ ঋণের দায়ে কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। অর্থমদমত্ত এই ইতর কৃপণ তাঁহার সঙ্গে যেরূপ সম্ভাষণ করিতেছিল, তাহাতে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু তিনি দরিদ্র অধমর্ণ, আর মণ্ডল ধনী উত্তমর্ণ ; সকলই তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হইতেছিল। শেষে মণ্ডল যখন তাঁহার স্বর্গগত জনককে উদ্দেশ করিয়া কুকথা বলিল, তখন ব্রাহ্মণের ভস্মাচ্ছাদিত ক্রোধবহ্নি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু জবাফুলের ন্যায় আরক্ত হইল। ব্রাহ্মণ ঋণের কথা, বাস্তু-বন্ধকের কথা, সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া রোষকষায়িতলোচনে বলিলেন, "খবরদার পাষণ্ড, আমার সাক্ষাতে আমার পিতৃনিন্দা করিস না।"

মণ্ডল ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল ; কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তোমার পিতা বা পিতামহের সহিত আমার সম্পর্ক কি ? আমার সম্পর্ক টাকার সঙ্গে। টাকা লইয়াছ তুমি, তোমার কাজের সময় টাকা দিলাম, তাহাতে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ত' দেখাইলেই

না, পরন্তু মেয়াদের সময় অতীত হইয়া গেল বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলাম মাত্র, তাহাতে আমায় চোখ রাঙ্গাইয়া কথা কহিতেছ। কলির ধর্ম্মই এই।"

ব্রাহ্মণের রাগ জল হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ আপনাকেই অপরাধী মনে করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয় টাকার ভাবনায় আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, কি বলিতে কি বলিয়াছি, অপরাধ লইবেন না। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, ভগবান আপনাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, গরীব ব্রাহ্মণের সামান্য দুপয়সায় মহাশয়ের কিছুই আসিয়া যাইবে না। দয়া করিয়া এই আসল টাকাটা লউন, পরে ক্রমে ক্রমে সুদের দেনা শোধ করিব। দোহাই আপনার, আপনাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব।"

মণ্ডল এই সুযোগই অন্বেষণ করিতেছিল। সে অমনি বলিয়া উঠিল, "বা রে বা! উনি আমায় বৈদ্যনাথের এঁড়ের মত খুর তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, আর তাহা হইলেই আমি বর্ত্তাইয়া যাই আর কি! ওসব নেকাম চল্‌বে না। সুদে আসলে সব টাকা মায় কড়া ক্রান্তি সব আজই চুকিয়ে দিতে পার ত' বাস্তু জমা জমী থাকে, না হলে আমি ছাড়ছি না। মেয়াদ বহুদিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার টাকা এতদিন মিছে বসে রইল, কিছু ফল দিলে না। আমার টাকা কখনও বাঁজা থাকে না। আমি দয়া করিয়া এতদিন সময় দিয়াছি, আর দিব না।"

দুষ্ট মণ্ডল অন্তরে জানিত, ব্রাহ্মণ আজ কিছুতেই সুদের টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে না, তাই এতটা দয়া দেখাইতেছিল। ব্রাহ্মণ বিস্তর কাঁদাকাটা করিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। শেষে পাষণ্ড মণ্ডল বেলদার দিয়া তাঁহাকে কাণে পাক দিয়া অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইল। ব্রাহ্মণ বিষন্নবদনে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তৎপর দিনই মণ্ডল সরকারি লোক জন লইয়া ব্রাহ্মণের বাস্তু ও জমীজমা দখল করিতে গেল। তখনকার কালে এইরূপ আইনের কার্য্য বড় তড়িঘড়ি হইত। পূর্ব্ব হইতেই মণ্ডল সব ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ব্রাহ্মণের পত্নী আসন্ন-প্রসবা। আইনের লোকেরা মণ্ডলের নিকট টাকা খাইয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণের সে কথায় কর্ণপাত করিল না। ব্রাহ্মণ-পত্নীর করুণ ক্রন্দনে জলস্থল ভরিয়া গেল; কিন্তু পাষণ্ডদের অন্তরে দাগ বসিল না। শেষে ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া হস্তে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া মণ্ডলের পদতলে পড়িয়া অন্ততঃ দুই চারি দিনের সময় ভিক্ষা করিলেন। মণ্ডল অচল অটল; সে বরং অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতে লাগিল;—"যাহাদের এক বেলা এক মুটো ভাত জোটে না, তাহাদের আবার ছেলে বিয়োন কেন? সখটুকু খুব, মরদ ত ভারি, ইত্যাদি।" শেষে মণ্ডল ব্রাহ্মণের চৌদ্দপুরুষান্ত করিল।

ব্রাহ্মণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কাহারও বাধা না মানিয়া বন্য বরাহের মত মণ্ডলকে আক্রমণ করিয়া তাহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। কিন্তু অমনি মণ্ডলের দলবল তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহাকে নির্দ্দয় করিয়া প্রহার করিল; ব্রাহ্মণ প্রহারের চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণী ভয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। সেই অবস্থায় মণ্ডলের আদেশে তাঁহাদিগকে টানিয়া হিঁচড়িয়া গৃহের বাহিরে আনা হইল। ব্রাহ্মণের দুটী সন্তানকেও ঐরূপে গৃহ হইতে তাড়িত করা হইল; মণ্ডল তখন হৃষ্টচিত্তে গৃহদ্বারে চাবি দিয়া সদলবলে চলিয়া গেল।

গ্রামের লোকে দূর হইতে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল; তাহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী; দুই একজন ব্রাহ্মণ কায়স্থও যে না ছিলেন এমন নহে, কিন্তু সকলেই

অবস্থাহীন; কাজেই মণ্ডলের দলবলের নিকটে অগ্রসর হইতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। মণ্ডল চলিয়া গেলে সকলে গাছতলায় আসিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও দুইটী শিশুসন্তান সেই স্থানে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে; তখনও উভয়ে অচৈতন্য। গ্রামের লোকের শুশ্রূষায় ক্ষণপরেই তাঁহারা চৈতন্য লাভ করিলেন। কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত; ব্রাহ্মণীর প্রসববেদনা হইল। গ্রামের লোক সরিয়া যাইতে না যাইতে সেই অনাবৃত গাছতলায় পথের ধূলার উপর ব্রাহ্মণী এক সন্তান প্রসব করিলেন! গ্রামের লোকে তাঁহাদের সেবার ক্রটী করিল না। সেই গাছতলায় সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইল। তিন দিন সেই স্থানে থাকিয়া ব্রাহ্মণ প্রসূতী ও সন্তানদিগকে লইয়া কোনও আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যথাসময়ে জীবনের কর্ণে এই সমস্ত কথা পঁহুছিল। ক্রোধে জীবনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সেই দিনই মণ্ডলদিগের নিকট জীবনের চিঠি গেল, "দুই দিন পরে তোমার বাটীতে ডাকাতি হইবে, প্রস্তুত থাক।" মণ্ডলের প্রাণ উড়িয়া গেল। সে তখনই থানাদারের নিকট গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া পড়িল। মণ্ডল আপনার অতুল ধনরত্ন রক্ষার নিমিত্ত থানাদারকে অনেক টাকা নজর দিল ও আরও দিবে বলিয়া গেল। থানাদার দারোগা সাহেবকে বলিয়া কহিয়া জনকয়েক সশস্ত্র বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিল; তাহারা মণ্ডলদিগের বাটী পাহারা দিতে লাগিল। জীবন সমস্ত সংবাদই পাইয়াছিল; সেও সেইজন্য প্রস্তুত হইল।

সেই দিন রাত্রে গ্রামবাসীরা কুটীর-দ্বারের ফাঁক দিয়া সভয়ে দেখিল, পঙ্গপালের মত ডাকাতের দল বাদ্য ও রোশনাই করিয়া মণ্ডলদিগের গৃহাভিমুখে যাইতেছে, স্বয়ং জীবন সর্দ্দার সেই দলের নেতা। বরকন্দাজেরা এই ভীষণ ডাকাতির আক্রমণের মুখে

টিকিতে পারিল না, ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল। তাহার পর মণ্ডলদিগের শাসন ও ধনরত্নলুণ্ঠন আরম্ভ হইল। ওঃ সে এক বীভৎস ব্যাপার! মণ্ডলদিগের কর্ত্তার—যে ব্রাহ্মণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল—শাস্তির চূড়ান্ত হইল; তাহার নাক কাণ কাটা গেল, হাত পা খোঁড়া হইল, শুধু প্রাণটী রহিল মাত্র। মণ্ডলদিগের স্ত্রী-পুরুষগণকে কৌপীন পরাইয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া জীবন সদলবলে জঙ্গলে ফিরিল। স্বরূপনগরের ডাকাতির কথা দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল।

যে দিন স্বরূপনগরে ডাকাতি হয়, তৎপর দিন অপরাহ্ণে ঘুঘুড়ির বটজঙ্গলে জীবনের দরবার। প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ডাকাতের দল জীবনকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। জীবন পূর্ব্ব দিনের লুঠ-লব্ধ ধন যথাক্রমে দলের লোকদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেছে ও মাঝে মাঝে দুই একটা প্রশ্ন করিতেছে।

জীবন প্রথমেই জিজ্ঞাসিল, "বারাসতে গিয়াছিল কে?"

সৃষ্টিধর কর্ম্মকার অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমিই গিয়াছিলাম।"

জীবন। সেখানে কি দেখিয়া আসিলে বল।

সৃষ্টিধর। পারকার সাহেব কালেক্টার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনেক কথা কয়েছে। তারা তোমাকে ধরবার মতলব আঁটছে। আজ কদিন হল তারা সদলবলে সোলাদানায় পৌঁছেছে।

জীবন। বেশ। তাদের দলে কতজন লোক আছে?

সৃষ্টিধর। সাহেব বিবি সাত জন; পুলীশ ফৌজ একশ' জন।

জীবন। ফৌজের কর্ত্তা কে?

সৃষ্টিধর। বারাসতের কাপ্তেন মেবার্ট সাহেব।

জীবন। আচ্ছা তুমি বস। দেগঙ্গায় কে ছিল?

মাখন কপালী বলিল,—আমিই ছিলাম।

জীবন। সেখানে কি উদ্যোগ দেখিলে বল।

মাখন। সে খানে দুশ' পুলীশ ফৌজ জমায়েৎ হয়েছে। তাদের কর্ত্তা বারাসতের কাপ্তেন নিউমান; তাদের সঙ্গে দুইটা কামান আছে।

জীবন। হুঁ। ইহাদের পথ দেখাইবার লোক আছে?

মাখন। আছে। বসিরহাটের দারোগা রহমৎখাঁর উপর এই ভার।

জীবন। বেশ। তুমি বস। সোলাদানার লোক হাজির আছে?

নফর ডোম জবাব দিল, "আছি।"

জীবন। কি খবর?

নফর। খবর ভাল। সাহেব বিবিরা ফৌজ সঙ্গে এসে পৌঁছেছে। পাঁচজন সাহেব, দুই জন বিবি। তারা খুব নাচ গান, খাওয়া দাওয়া, বাচখেলা করছে। ফৌজেরা চুপচাপ বসে আছে।

জীবন। যাক, এখনও তাহলে সময় আছে। সাহেব কে কে জান?

নফর। তিন জনকে জানি, সর্দ্দার। পারকার সাহেব, কালেক্টর সাহেব আর পুলীশ সাহেব। আর দুজন তাদের বন্ধু, বেড়াতে এসেছে। বিবিরা সেই দুজন সাহেবের এক জনের বোন।

জীবন। দণ্ডীরহাটের খবর কি?

সোণা মণ্ডল। সে দিন দেওয়ানজীর পঞ্চায়েতে বিচার হয়েছে। তার নামে নালিশ হয় যে, সে বুড়ো কর্ত্তার মেয়েকে খারাপ করেছে। চূড়োমণি ঠাকুর সাক্ষি্য দেওয়াতে সে বেঁচে যায়। সে তারপর ছোট কত্তার ছেলের নামে মিছে নালিশ করেছিল। আমাদের বুড়ো কর্ত্তা তার সব বুজরুকি ধরে দিয়েছে।

জীবন। তার পর?

সোণা। ছোটকত্তা কোম্পানীর কাজে দিন কয়েকের জন্য বিদেশে গেছে। ছোটকত্তার ছেলের ভারি শক্ত রোগ হয়েছে।

জীবন। সে-কি ? এ সব ত' শুনি নাই। আমার দাদার অসুখ ?

এই সময়ে দূরে সাঙ্কেতিক "কু—উ—উ" শব্দ হইল। জীবন বলিল, "এ সময়ে কে আসে ? ভূতো, ঘাঁটির লোকের মুখে খবর নে, কে এল। দরকার বুঝলে এখানে নিয়ে আস্‌বি, না হয় ফিরিয়ে দিবি।" ভূতনাথ চলিয়া গেল।

জীবন তখনও বণ্টনকার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বণ্টন করিতে করিতেই বলিল, "আজ রাত্রে ভাল করিয়া মায়ের পূজা দিতে হইবে। কালিদাস আচার্য্য ঠাকুরকে এখনই খবর দেওয়া চাই।"

তখনই হুকুম তামিল হইল। জীবন এইবার উঠিয়া বিশ্রাম লইবে এইরূপ মনে করিতেছে, এমন সময় ভূতনাথ অপর এক ব্যক্তিকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে আর কেহ নহে, দণ্ডীরহাটের দীননাথ অধিকারী। তাহাকে দেখিয়াই জীবন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, "একি ? এমন সময়ে তুমি এখানে ?"

দীননাথ। বিশেষ প্রয়োজন। ঠাকুর মহাশয় আমায় পাঠাইয়াছেন।

জীবন বিস্মিত হইয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয় পাঠাইয়াছেন ? কি প্রয়োজন ?"

"এই পত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে"—এই কথা বলিয়াই দীননাথ মাথায় বাঁধা উড়ানীর মধ্য হইতে পত্র বাহির করিয়া দিল।

জীবন পত্র পাঠ করিতে লাগিল, সকলের দৃষ্টি তাহার মুখের দিকে রহিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, জীবনের মুখে বিস্ময় ও ক্রোধের ভাব যুগপৎ প্রস্ফুট হইতেছে। পত্রপাঠ শেষ হইলে জীবন দীননাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "একি ? আমি ত' ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

দীননাথ। এই পত্র কাল কর্ত্তামহাশয়ের বাটীতে পৌঁছিয়াছে। কর্ত্তামহাশয় বাটীতে নাই। আবার দাদাভাইএর ভারি অসুখ। পত্র

পাইয়াই চূড়ামণি ঠাকুরের সন্দেহ হয়। তাই আমাকে সেই পত্র লইয়া এখানে আসিতে বলেন। আমি জানিতাম, তোমরা কাল ডাকাতি করিতে গিয়াছ, প্রাতে নিদ্রা যাইবে। তাই এ বেলা আসিলাম।

জীবন আর একবার পত্র পাঠ করিল। পড়িতে পড়িতে তাহার শিরা সমূহ স্ফীত হইয়া উঠিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। জলদগম্ভীরস্বরে জীবন জিজ্ঞাসিল, “এ পত্র লিখেছে কে?”

সভাস্থল নিস্তব্ধ; একটী সূচিপতনের শব্দও তাহাতে শুনা যায়। জীবনের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্বয়ং ভূতনাথও ভীত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

জীবন আবার বলিল, “কার মরবার্ সাধ হয়েছে? আমার নাম দিয়ে ডাকাতি চিঠি দেয়? ভূতো, শীঘ্র খুঁজে বার কর কে লিখেছে, না হলে তোকে শূলে চড়াব।”

ভূত। সর্দ্দার, দলের মধ্যে কার এত বড় বুকের পাটা? ভাল, চিঠি শোনাও দেখি।

জীবন পত্র পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল:—

শ্রীশ্রী ৺কালীমাতা।

দণ্ডীরহাটের দর্পনারায়ণ বসু এতদ্বারা জানিবা যে অদ্য হইতে তিন দিনের মধ্যে তোমার বাটীতে ডাকাতির দিন ধার্য্য হইল। ইহা ৺কালীমাতার আদেশে হইতেছে জানিবা। সেই হেতু ৺কালীমাতার পূজার জন্য তোমার সঞ্চিত ধান্য ধন বস্ত্র অলঙ্কার তৈজসপত্রাদি সাজাইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিবা। অন্যথা লাঠিয়াল ও ফৌজ ঠিক করিয়া রাখিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তুমি ও তোমার গৃহের পরিবারেরা বিশেষ শাস্তি পাইবে জানিবা।

ইতি ২০শে কার্ত্তিক সন ১২১০ সাল। ৺কালীমাতার সেবক শ্রীজীবন সর্দ্দার।”

পত্রপাঠ শেষ করিয়া জীবন বলিল, “ভূতো! এখনি তাকে হাজির কর, না হলে অনর্থ ঘটাব। কাল কে কে ঘাঁটির কর্ত্তা ছিল, সকলকে দাঁড় করা।”

ভূত। (করযোড়ে) সর্দ্দার, [illegible]টু ঠাণ্ডা হয়ে বস। আমি ধরে এনে দিচ্ছি। না দিতে পারি, আমার গর্দ্দানা নিও।

ভূতনাথ এই কথা বলিয়া সেই দস্যুমণ্ডলীর মধ্য হইতে সঙ্কেতে পাঁচটী লোককে ডাকিয়া লইয়া নির্জ্জনে গেল। জীবন সর্দ্দার ইত্যবসরে আবার একবার পত্র খানি পাঠ করিয়া লইল। যখন জীবন চোখ তুলিল, তখন দেখিল, ভূতনাথ অপর এক ব্যক্তিকে লইয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সেই লোকটা ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে ও যোড়হস্তে কাতরনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। জীবন দেখিয়াই রোষকষায়িতনয়নে চীৎকার করিয়া বলিল, “কে তুই? রাঘব দালাল না? তোর এই কাজ?”

রাঘব বলিদানের ছাগের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। জীবন আবার বলিল, “আমার নামে চিঠি দিয়েছিস? হারামজাদ, কার হুকুমে এই চিঠি লিখেছিস?”

রাঘব নিরুত্তর, তাহার কাঁপুনি আরও বাড়িল।

জীবন। কি হুকুম ছিল আমার, হারামজাদ কুকুর? দাঁড়িরহাটের বোসেদের বাড়ী ডাকাতি করতে গিয়েছিলি? সাহস ত' কম নয়। আমার হুকুম মানিস না, আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিস না?

রাঘব। (কাঁপিতে কাঁপিতে) দোহাই সর্দ্দার! ঘাট হয়েছে, এইবারটা মাপ কর।

জীবন। কুকুরের বাচ্ছা! আমি নিজে হুকুম দিয়েছি, বোসেদের

বাড়ী আমার দলের কেউ কখনও ভুলেও ডাকাতি করবিনি, তুই সেই হুকুম না মেনে আমার নামে সেখানে চিঠি দিয়েছিস ? ভূতো, একে গাছে লটকে দে।”

হুকুম শুনিয়া অত বড় যোয়ান মরদ রাঘব দালাল ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও আছাড় খাইয়া জীবনের পদতলে পড়িল। ভূতনাথ অমনি তাহার ঘাড় ধরিল; তাহার সঙ্কেতমত আরও চারি পাঁচ জন ডাকাত তাহাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

দীননাথ এতক্ষণ নীরবে সকল ঘটনা দেখিতেছিল; এইবার কথা কহিল, জীবনকে বলিল, “দোহাই বাপ, আমার অনুরোধে ওকে ছেড়ে দাও। শাস্তি বরং কিছু দিতে হয় দাও, কিন্তু প্রাণে মেরো না।”

জীবন হাসিয়া বলিল, “মানুষ-মারা ত' দেখনি বুড়োকর্ত্তা! তাই এত ভয় পাচ্ছ। ওকে প্রাণে না মাল্লে ও হারামজাদা আরও কত সর্ব্বনাশ করবে।”

দীননাথ। দোহাই বাপ, ঠাকুর মহাশয়ের উপরোধ—

জীবনের মুখ গম্ভীর হইল। সে বলিল, “থাক! ওকে প্রাণে মারবো না”; তাহার পর রাঘবের দিকে চাহিয়া বলিল, “যা বেটা, বড় বেঁচে গেলি। কিন্তু যেমন প্রাণ পেলি, তেমনি সত্য কথা বল্, কেন ওখানে ডাকাতি কর্‌তে গিয়েছিলি।”

রাঘব এতক্ষণ মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল। এই আশ্বাস-বাক্যে ভরসা পাইয়া উঠিয়া যোড়হস্তে কহিল, “দোহাই সর্দ্দার, আমি সমস্তই বলিতেছি। এ সমস্ত দেওয়ান কালি দত্তের জন্য হয়েছে।”

জীবন সবিস্ময়ে বলিল, “সে কি ? কালিদত্ত” ? সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

রাঘব। হাঁ সর্দ্দার, কুঠীর দেওয়ান কালিদত্ত। সেই আমায় পয়সার লোভ দেখিয়ে এই কাজে নামিয়েছে। বোসেদের কর্ত্তার

সঙ্গে তার কি ঝগড়া হয়। সে দাদ তোলবার জন্য এই কাজ করেছে। অনেকটা টাকা, লোভ সামলাতে পাল্লেম না, রাজী হলেম। মনে ভাবলেম,—পত্র দিই তোমার নামে, যদি জীবন সর্দ্দারের নাম দেখে ভয়ে কোনও গোলযোগ না করে যা চাইব তাই দেয়। তা হলে দেওয়ানের দেওয়া পুরস্কার আর লুঠের টাকাকড়ী নিয়ে এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব। অনেক দূরে গিয়ে ঘর বেঁধে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করবো। সে চিঠি তোমার হাতে এসে পড়বে, একবারও ভাবিনি।

জীবন। আচ্ছা সব বুঝলেম। কিন্তু দেওয়ানের সঙ্গে তোর এ সব কথাবার্ত্তা হল কি করে?

রাঘব। দেওয়ান প্রথমে কুঠীর বরকন্দাজদের সর্দ্দার থানাদারকে বোসের বাড়ী ডাকাত সেজে লুঠ করতে যেতে বলে। থানাদার ভয়ে প্রথমে রাজী হয় নাই। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক যুক্তি ঠাওরাইল। সে ভাবিল,—সামান্য বারো জন বরকন্দাজ লইয়া দণ্ডীর-হাটের বসুদের বাড়ী ডাকাতি করিতে যাওয়াও যা, আর হাত পা বেঁধে বাঘের মুখে যাওয়াও তা; তার চেয়ে সত্যিসত্যি ডাকাতের আড্ডায় খবর দিলে হয় না? একে ত' লুঠতরাজ, তার উপর পুরস্কার, ডাকাত নিশ্চিত রাজী হবে। যুক্তির কথা সে সমস্তই দেওয়ানকে বলিল। দেওয়ান শুনিয়া মহা খুসি। থানাদার আরও অনেক টাকা চাহিল, ডাকাত ও সে নিজে—উভয়ের বখরা চাই তো! দেওয়ান সম্মত হইল; চুক্তির অগ্রিম অর্দ্ধেক টাকা তৎক্ষণাৎ দিয়া দিল। থানাদার আমাদের ফকিরহাটের ঘাঁটির কথা জানিত। আমি তখন সেখানকার ঘাঁটিদার। সেই খানেই আমার সঙ্গে থানাদারের সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। ভাবিয়াছিলাম আজ রাত্রে তোমরা ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইলে ডাকাতি করিতে যাইব।

জীবন। আমার অন্যান্য লোকে দণ্ডীরহাটের বসুদের বাটী ডাকাতি করিতে যাইত কি ?

রাঘব। আমি তাদের বলিতাম, তুমিই অনুমতি দিয়াছ, না হইলে কাহার সাধ্য বসুদের বাড়ী ডাকাতি করে ?

জীবন। হুঁ। ভুতো, এই বেটার দুগালে দুই কলিকার ছাপ দিয়ে ছেড়ে দে। বেটা যেন ঘুঘুড়ীর ত্রিসীমানায় আর না আসে।

চারি জন ডাকাত রাঘব দালালকে টানিয়া লইয়া গেল। জীবন ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিল, পরে দীননাথকে বলিল, "বুড়োকর্ত্তা, সবই শুনলে। ঠাকুর মহাশয়কে গিয়ে বোলো, আমার কোনও দোষ নাই. কর্ত্তা যেন আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন। তুমি একটু ঘরে গিয়ে বস, গুটীকতক কথা আছে। আমি যাচ্ছি।"

জীবন কেবল ভূতনাথ ও অপর চারিজন সর্দ্দারকে থাকিতে বলিয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিল। সকলে চলিয়া গেলে জীবন বলিল, "তোরা সব শুনলি। আমায় ধরবার জন্য কোম্পানী কত জায়গায় কত বরকন্দাজ যোগাড় করেছে। এখন কি বলিস্ ?"

ভূত। সর্দ্দার, আমাদের জঙ্গল আছে, ওদের বিশগুণ লোক আছে। আসুক না বরকন্দাজ।

জীবন। তা জানি। দু তিন শ বরকন্দাজ নিয়ে এসে আমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু এখন থেকে খুব হুঁসিয়ার হয়ে কাজ কর্‌তে হবে। প্রথমেই আমি বৈষ্ণবীকে এখানে এনে লুকিয়ে রাখতে চাই। তোরা কি বলিস্ ?

সর্দ্দারেরা চমকিত হইয়া একবাক্যে বলিল, "আড্ডায় মেয়েমানুষ ?"

জীবন। হাঁ, মেয়ে মানুষ। কেন, তোরা কি জানিস না, সে কেমন মেয়েমানুষ !

সর্দ্দার কানু মিস্ত্রী সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "জানি না, সর্দ্দার ?

সে যে আমাদের মা জননী! সর্দ্দার, তুমি নিয়ে এসো, আমরা তার সন্তান, মায়ের সেবা কর্‌বো।"

জীবন। আমার সুখের জন্য আনছি না, কানু। বড় দায়ে পড়েই আনতে হচ্ছে। সাহেব সোণাদানায় এসেই বৈষ্ণবীর সন্ধান আরম্ভ করেছে। বৈষ্ণবী ঘরে লুকিয়ে আছে বটে, কিন্তু ওখানে থাকলে আর দুই চারি দিনের মধ্যেই যে ধরা পড়বে, তাতে আর সন্দেহ নাই। এখানে তার বাসের ঘরের বন্দোবস্ত কর মিস্ত্রী। ভূতো! তাকে হেথায় আনিবার ভার তোর উপরেই রহিল। আমি শীঘ্রই সোণাদানায় গিয়ে সাহেবদের ভাবগতিক ভাল করে জেনে আসছি। গুরু হরিবেদের ছেলে ভোলাকে খবর দে, সে এখানে এসে সাজিয়ে দেবে।

ডাকাতের দরবার ভঙ্গ হইল। জীবন ঘরের মধ্যে দীননাথের সহিত দেখা করিতে গেল।

বাজিকর।

সোণাদানার কুঠীতে ভারি ধূম। পারকার সাহেব আসিয়াছেন, স্বয়ং কালেক্টর সাহেব আসিয়াছেন, খোদ পুলিশের বড় সাহেব আসিয়াছেন, আর পারকার সাহেবের বিলাত হইতে নবাগত দুইটী পুরুষ ও দুইটী স্ত্রী বন্ধু আসিয়াছেন। একবারে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গিয়াছে। নাচ গান, খেলা ধূলা, পান ভোজন, আমোদ প্রমোদের আর বিরাম নাই। সুবর্ণকেশী বিড়ালাক্ষী যুনানী যুবতীরা বনের হরিণশিশুর মত খোলা ময়দানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন; গাছের ডালে দোলা বাঁধিয়া দোল খাইতেছেন; হিহিহিহি হাসির তরঙ্গে দিগদিগন্ত কাঁপাইতেছেন; এ সাহেবের টুপি কাড়িয়া লইয়া,

ও সাহেবের গোঁপ ধরিয়া টানিয়া, অন্যের কান মলিয়া দিয়া পলাইতেছেন, সাহেবেরা ছুটিয়া গিয়া ধরিলে তাঁহাদের অঙ্গে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন; ময়ূরপঙ্খীতে নদীর উপর বাচ খেলিতেছেন, রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত সাহেবেরা ইচ্ছা করিয়া নৌকা দোলাইতেছেন, আর বিবিরা মিহি গলায় চিল চেঁচাইয়া সাহেবদিগকে জড়াইয়া ধরিতেছেন; সাহেবেরা পক্ষী শিকার করিয়া বেড়াইতেছেন, বিবিরা ঘরে বসিয়া তাস খেলিতেছেন।

আজ কয়দিন ধরিয়া এইরূপ চলিয়াছে। দেওয়ানজী সাহেবের বন্ধুদিগের মনস্তুষ্টির জন্য উদ্যোগ আয়োজনের কিছুই ত্রুটী রাখেন নাই। সাহেবের হুকুম আছে,—পয়সার জন্য ভাবিও না, যাহা বিল করিবে তাহাই পাইবে, তবে আমার বন্ধুদিগের তিলমাত্র অসুবিধা বা কষ্ট হইলে বিষম দণ্ড হইবে। ইঁহারা সকলেই সদ্বংশজাত। দেওয়ান জানিতেন, ঐ "সদ্বংশজাতের" অর্থ কি, কেননা তিনি ওকথা ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন। বারাসতে থাকিতে সেখানকার কোনও সম্ভ্রান্ত জমিদারের গৃহে কোনও কার্য্য উপলক্ষে সাহেবের নিমন্ত্রণ হয়। সেইদিন জমিদার স্থানীয় সমস্ত সাহেবমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করেন। স্বতন্ত্র দিন, স্বতন্ত্র স্থান, স্বতন্ত্র পানাহার প্রভৃতির ব্যবস্থা হইল। জমিদার এই ব্যবস্থার ভার কালিদত্তের উপরেই অর্পণ করেন, কেননা কালিদত্ত ঐসকল বিষয়ে দক্ষ। কালিদত্তও কলিকাতা হইতে বন্দোবস্ত করিয়া সব উদ্যোগ করিলেন। আহার্য্য প্রস্তুত হইলে সব সাহেবেরা উঠিলেন, পারকার সাহেব উঠিলেন না। জমিদার পীড়াপীড়ি করিলেন, সাহেব অসুস্থতার ভাণ করিলেন। ভোজন শেষ হইলে সকলে চলিয়া গেলেন, কেবল পারকার সাহেব ও দেওয়ান কালিদত্ত রহিলেন।

সাহেব তখন জমিদারের দুটী হাত ধরিয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "বন্ধু! কিছু মনে করিবেন না, তাহা হইলে আমি বড় কষ্ট পাইব। আমি

কাল আপনার বাটী আসিয়া নিজে চাহিয়া পেট পুরিয়া খাইয়া যাইব।"

জমিদার জিজ্ঞাসিলেন, "কেন? আজ আপনার আপত্তি কি ছিল?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কায়স্থ, আপনি কি বাগদীর সহিত একত্রে ভোজন করিতে পারেন?"

জমিদার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তাতে আপনার কি হইল?"

সাহেব, "আপনি যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, উঁহাদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন, যাঁহার সহিত আমি একত্রে ভোজন করিতে পারি না। তিনি এখানে খুব বড় সাহেব হইতে পারেন, কিন্তু দেশে তাঁহার পিতা পথে পথে জুতা শেলাই করিয়া বেড়াইতেন।"

জমিদার, "সে কি সাহেব, আপনাদের ত' জাতিবিচার নাই।"

সাহেব, "হাঁ, কাগজে কলমে লেখা নাই বটে। যাক, আপনারা যে আমাদের সঙ্গে খান না, তা না হলে আপনাদের মত সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত একত্রে ভোজন করিয়া আমাকে ধন্য জ্ঞান করিতাম।"

তাই দেওয়ানজী সাহেবের নিকট "সদ্বংশজাতের" কি কদর, তাহা বুঝিতেন। এবার যখন সাহেব নিজের বন্ধু বলিয়া ঐ সাহেব বিবি-গুলিকে আনাইয়াছেন, তখন নিশ্চিতই উঁহারা সকলেই সদ্বংশজাত, কেননা অন্যরূপ হইলে সাহেব প্রাণ থাকিতে তাঁহাদিগকে নিজগৃহের ত্রিসীমানায় আসিতে দিতেন না। এই নিমিত্ত দেওয়ানজী তাঁহাদিগের জন্য দূর দূরান্তর হইতে উত্তম ছাগ, মেষ, কুক্কুট, ডিম্ব, দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত, ফলমূল ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাহেবদের আদর অভ্যর্থনা পূরাদমেই চলিল। দেওয়ানজী সাহেবদের জন্য দেশী ছায়াবাজী, ভাঁড়ের নাচ, মনসার ভাসান, লাঠি সড়কি খেলা ইত্যাদি নানারূপ আমোদ প্রমোদেরও আয়োজন করিয়াছিলেন।

সাহেবের বাঙ্গলার পূর্ব্বদিকের বারান্দায় নদীর দিকে সম্মুখ করিয়া সাহেব বিবিরা বসিয়া আছেন। আজ দেশী বাজিকরে খেলা দেখাইবে। কুঠীরই কোনও কর্ম্মচারী উপযাচক হইয়া দেওয়ানজীকে এই বাজিকরের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার কথা বলিয়াছিল। দেওয়ানজী তাহারই উপরে ঐ বাজিকরকে আনিবার ভার দিয়া খরচপত্রের টাকা দেন। সেই কর্ম্মচারী বলিয়াছে, বাজিকরের বাটী দক্ষিণে, সে সদলবলে নৌকায় আসিবে। সাহেবেরা তাই তাহারই অপেক্ষায় এইস্থানে বসিয়া আছেন। প্রায় সন্ধ্যা; অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরশ্মি ইচ্ছামতীর জল রাঙ্গা করিয়াছে; ইচ্ছামতী তরতর তরঙ্গে বহিয়া যাইতেছে; দুই একখানি নৌকা পাইলভরে চলিয়া যাইতেছে; দুই একখানি নৌকায় চেরাগ (প্রদীপ) প্রজ্বলিত হইতেছে; ক্রমে ক্রমে আঁধার নামিতেছে, একটী দুটী করিয়া আকাশে তারা ফুটিতেছে; ধীর মধুর সান্ধ্য সমীরণ বহিতেছে; একখানি নৌকায় পূর্ব্বদেশীয় দাঁড়ী দাঁড় টানিতে টানিতে মনের আনন্দে সারি গাহিতেছে:—

আশার আশে সাঁইদরোদী, আর কতদিন রব (ও ওহো ও)।
(ও) গুরু চরণমালা গলে দিয়ে, মনের সাধ মিটাব (ও ওহো ও)॥

কোনও নৌকার মাঝি গগণ মেদিনী কাঁপাইয়া গাহিতেছে:—

হ্যাশে কেউ নাই রে, দাদারে কোয়ো বাই
আমরা পলুয়ার মাঝী, কসে ঢুল বাজাই।
যা ছিল পুইসাটিয়া, সব নিল লুটীর মেইয়া—
হ্যাশে যাইমু কিসির লইয়া, মাগুর হাতে দিমু ছাই॥

তাহাদের অশিক্ষিত উদার উন্মুক্ত কণ্ঠে সেই গানগুলি নদীর জলে সন্ধ্যাকালে বড় মিষ্ট শুনাইতে লাগিল। সাহেব বিবিরা বারান্দায় আরামকেদারায় ও সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নদীবক্ষে তরণীর আলোকের পানে চাহিয়া আছেন; খানসামা, খিদমদগার, বেহারা,

পাখাওয়ালা, হুঁকাবরদার প্রভৃতি ভৃত্যেরা শশব্যস্তে তাঁহাদের সেবা করিতেছে। বিলাত হইতে নবাগত সাহেব বিবিরা পারকার সাহেব এবং কালেক্টর ও পুলীশ সাহেবের সটকায় তামাক খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি খাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম উইলমট সাহেব বলিলেন, "I say, Parker, this is rather ludicrous, a Briton pulling at the hookah like a Padisha in right oriental fashion ! Lady Lilla would give you the go by if you don't give up this d—d habit." জ্যেষ্ঠা যুবতীর নামই লেডি লীলা এসেনডাইন। তিনি মৃদু হাসিয়া গোলাপ পাপড়ীর মত ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া ক্ষুদ্র হাতপাখাখানি দিয়া উইলমট সাহেবের গণ্ডদেশে ঈষৎ আঘাত করিয়া মিহি গলায় বলিলেন, "Oh, you silly goose !"

লর্ড ফ্রেডারিক কেভেণ্ডিস উইলমট, মার্কুইস টিনডেলের পুত্র ও লর্ড এসেনডাইনের শ্যালকপুত্র; অনরেবেল অগষ্টস এসেনডাইন, লর্ড এসেনডাইনের পুত্র, লেডি লীলা ও লেডি সেলিনা তাঁহার ভগিনী। লর্ড ফ্রেডারিক উইলমট ও অনরেবেল অগষ্টস, পারকার সাহেবের সহপাঠী ও সমবয়স্ক ছিলেন। বিলাতে থাকিতে তাঁহাদের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। লর্ড ফ্রেডারিক সম্ভ্রান্ত ও ধনবান জমিদার-সন্তান; কিন্তু এসেনডাইনেরা সম্ভ্রান্তবংশজাত হইলেও সামান্য গৃহস্থের মত ছিলেন। কাজেই কন্যাদুইটী সুন্দরী ও সদ্‌বংশজাতা হইলেও অর্থাভাবে তাঁহাদিগকে ভাল ঘরে বরে দিতে লর্ড এসেনডাইনকে বড়ই বেগ পাইতে হইল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি সপরিবারে ভারতে আসিলেন। আসিবার পূর্ব্বে তিনি সুপারিসের জোরে কলিকাতার কোনও একটা বড় রাজকর্ম্ম জুটাইয়া আনিলেন; আর আনিলেন সঙ্গে শ্যালকপুত্র লর্ড ফ্রেডারিক উইলমটকে। সে যুবক নাছোড়বান্দা, কাজেই মার্কুইস

টিনডেলকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুত্রকে এসেনডাইনদের সঙ্গে ভারতে পাঠাইতে হইল। কলিকাতায় আসিবার দিন কয়েক পরেই হঠাৎ রাজপথে পারকার সাহেবের সহিত যুবকদ্বয়ের সাক্ষাৎ হয়। পারকার সাহেব তখন পূজার বন্ধে কলিকাতায় গিয়াছেন। পারকার সাহেব নিজের নাম-পরিবর্ত্তনের একটা কারণ দেখাইলেন। আর যায় কোথা? বহুদিনের পর সাক্ষাৎ। যুবকদ্বয় তাঁহাকে একরূপ পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে পান ভোজন, আদর আপ্যায়নে সাত দিন কাটিল। পারকার সাহেব আসিবার সময় লর্ড এসেনডাইনকে ধরিয়া বহু কাকুতি মিনতি করিয়া বন্ধুদের ও লেডিদের একবার বারাসত ও সোলাদানা বেড়াইয়া আনিবার অনুমতি চাহিয়া লইলেন। লেডি এসেনডাইন প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, শেষে পারকার সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে যাইতে একবারেই অসম্মত হইলেন। হয়ত তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "যাক না ছেলে পুলেরা, আমি গেলে ওদের আনন্দে ব্যাঘাত হবে। আর যে উদ্দেশ্যে এই নির্ব্বাসনে, দারুণ গ্রীষ্মে, সর্প ব্যাঘ্র ভল্লুকের মুখে, বাস করিতে আসিলাম, তাহাও তো সফল হইতে পারে। পারকার সদ্বংশজাত এবং অতুল ধনসম্পত্তির মালিক। লীলার যদি এমনি একটী বর জুটে, তাহা হইলে তো বাঁচিয়া যাই। যাক না সেখানে; যদি একত্রে থাকিতে থাকিতে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।" হায় কুহকিনী আশা! সন্তানবৎসলা জননীর এই আশা কি পূর্ণ করিবে?

লেডি লীলা এসেনডাইন মাতুলপুত্রকে মৃদুভৎর্সনা করিয়া পারকার সাহেবের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "Please do not mind him, Mr. Parker. He is an idiot." সে দৃষ্টিতে কত অর্থ লুকায়িত! পারকার সাহেব প্রেমিক হইলে অথবা তাঁহার মনপ্রাণ অপর কোনও বরাঙ্গনার পায়ে পূর্ব্ব হইতে বিকাইয়া না গেলে নিশ্চিতই

এ দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন। সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "Lord Cavendish has meant no harm, my sweet Lady, though he is a little sinner always bent on mischief-making. I would like him to stay with us a while to be initiated in our ways of Bengal, and let me see how long he does resist the temptation of the devilish Hookah. What do you say, Cromley ? Ha ! Ha ! Ha !"

ক্রমলি কালেক্টর সাহেবের নাম। তিনি মহা বুদ্ধিমানের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "Perfectly true, my dear ! It won't do to live without the Hookah here in this grilling heat of dusty Hindustan. It's so cool and refreshing !"

পুলীশ সাহেব মিষ্টার মেবার্ট। তিনি কথায় কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না ; একটা কথা কহা চাইতো। তিনি বলিলেন, "It is as indispensably necessary to us—white Nabobs—as the baton is to the constable."

কালেক্টর সাহেব একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "Yes, not only that, but the vernacular too. It is indispensably necessary."

পারকার সাহেব তামাসাচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "Which vernacular ? The Bengali ? Ha ! Ha ! Ha ! By Jove, you men of the magistracy pretend to a knowledge of the Bengali, but sorry, you have not. The Bengali is to your order what the Egyptian Hieroglypic is to the rest of the world."

সাহেব বিবিরা হো হো হাসিয়া উঠিলেন ; কালেক্টর সাহেব চটিয়া

আগুন। তিনি রাগিলেই তোতলা হইয়া যাইতেন। কাজেই তো তো করিয়া বলিলেন, "Nonsense ! you do not mean to say that we who have passed the test would yield the palm to others in our knowledge of the Bengali."

পারকার সাহেব আরও একটু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলেন, "Well, I am not in a mood to contest the point with you. I would rather cite an independent witness to corroborate what I say. Here, Dutt Kali !"

দেওয়ানজী অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত দক্ষিণের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি, "Yes sir, here come old servant, sir !" বলিতে বলিতে দুই হাতে সেলাম করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন।

পারকার সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "Hallo, Dutt Kali, repeat your story of the Harispur Collector. Will you ? হড়িশপুর কালেক্টর সাহাবকো গল্প বোলো।"

দেওয়ানজী অবাক ! সাহেবের এ খেয়াল চাপিল কেন ? এতগুলি সাহেব বিবির—বিশেষতঃ কালেক্টর সাহেবের—সম্মুখে সেই গল্প করিবেন কিরূপে ? এমন বিপদে মানুষে পড়ে ! বিলম্ব দেখিয়া সাহেবও চটিতেছেন, কি করেন ? সাহেব পুনরায় বলিলেন "বোলো, বোলো, জলডি বোলো"। আর নীরবে থাকিতে দেওয়ানজীর ভরসা হইল না। তিনি ভূমিস্পর্শ করিয়া দুই হাতে কালেক্টর সাহেবকে সেলাম করিয়া সভয়ে বলিলেন, "এই বলি, খোদাবন্দ। এ শোনা কথা, হুজুর ! হরিশপুরের কালেক্টার সাহেবের এলাকায় এক মহাজনের বাড়ী এক রাত্রে ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা মার ধর ও উৎপীড়ন করিয়া টাকাকড়ি লইয়া চম্পট দেয়। তাহারা চলিয়া

গেলে মহাজন সেই রাত্রেই থানায় এজাহার দিতে যায়। কিন্তু একে মার খাইয়া তাহার গতর চূর্ণ; তাহার উপর পথে অন্ধকারে পড়িয়া গিয়া সে বিষম আঘাত পাইল; কাজেই সেই রাত্রে থানায় এজাহার দেওয়া হইল না। মোকদ্দমার দিন কালেক্টর সাহেবের মনে সন্দেহ হইল ডাকাতি মিথ্যা। কাজেই তিনি মহাজনকে জেরা করিতে লাগিলেন। জেরা বাঙ্গালাতেই হচ্ছে। কালেক্টর জিজ্ঞাসিলেন,—'তুমি বলিতেছ রাত্রি দেড় প্রহরের সময় তোমার বাটীতে ডাকাতি হইয়াছিল। তখনও অনেক রাত্রি ছিল। তবে সে রাত্রে থানায় যাও নাই কেন?' মহাজন,—'হুজুর, আমি সেই রাত্রেই থানায় যাইতেছিলাম, কিন্তু পথে অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম, তাই সে রাত্রে আর যাইতে পারিলাম না।' কালেক্টর সাহেব,—'হোঁচট? অত রাত্রে হোঁচট?' মহাজন,—'আজ্ঞে হাঁ, হুজুর।' কালেক্টর সাহেব,—'বাঞ্চৎ, তোর সব ঝুট, তুই অত রাত্রে কোথায় মোদকের দোকান খোলা পাইলি যে হোঁচট কিনিয়া খাইলি? কেবল হায়রাণি করিতে আসিয়াছিস? এই, যা তোর মোকদ্দমা ডিসমিস'।"

পারকার সাহেব নিতম্বদেশে চপেটাঘাত করিয়া আরাম কেদারায় একবার মাথা হেলাইয়া পড়িয়া একবার উঠিয়া বসিয়া, হা হা হা হা হাসিয়া উঠিলেন; তাঁহার চক্ষে জল নির্গত হইল। কালেক্টর ও পুলিশ সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল। পারকার সাহেবের হাসির বিরাম নাই। তাঁহার নবাগত বন্ধুরা বাঙ্গালা গল্পের অর্থ জিজ্ঞাসিলেন। প্রথমে তিনি হাসির চোটে কিছু বলিতেই পারেন না, শেষে বহুকষ্টে বুঝাইয়া দিলেন। তখন আবার একপালা হাসির ধূম পড়িল।

কালেক্টর সাহেব বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু বিবিদের

সাক্ষাতে রাগের ভাব দেখাইলে লজ্জা ও অপমানের একশেষ। কাজেই বেশী কিছু না বলিয়া কহিলেন, "Now, stop this silly nonsense, Parker. You ought to be ashamed to show yourself in such a colour before your servant—this here nigger. Just ask him about the jugglers."

অমনি সকলের হাসি থামিয়া গেল। সকলেই সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "Yes, yes, what about the jugglers? They have kept us waiting for a precious long time."

পারকার সাহেব দেওয়ানকে বাজিকরদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেওয়ানজী সেলাম করিয়া বলিলেন, "তাহারা সদলবলে সন্ধ্যার সময়েই হাজির হইয়াছে। কেবল হুজুরের আজ্ঞা পাই নাই বলেই তাদের আনছি না। তারা ঐ দক্ষিণের ঘাটে নৌকা বেঁধেছে; হুজুরের হুকুম পেলেই ঝাউতলায় তাদের নৌকা নিয়ে এসে বাঁধতে বলি।"

সাহেব ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "Go, run, you fool! We have been running at cross purposes, I depending on you and you awaiting my pleasure. Go, জলদি যাও, লে আও।"

দেওয়ানজী আর সেখানে নাই। তাঁহার চরণদ্বয় ভূমিস্পর্শ করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সাহেবেরা বাজিকরদিগের বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলেন।

লেডি লীলা বলিলেন, "Oh! How I long to see these Indian jugglers. We have heard so much of them at home!"

লেডি সেলিনা হাতে তালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "And I too."

অনারেবেল অগষ্টস এসেনডাইন বিদ্রূপের ছলে বলিলেন, "I believe, you don't put your credence, Parker, on these Juggling cheats !"

পারকার সাহেব কেবল একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "There are more things on heaven and earth, Augustus, than are dreamt of in your philosophy."

এই সময়ে সাহেব-বিবিদের সম্মুখে নদীতটে ঝাউতলার ঘাটে ময়ূরপঙ্খীর গায়ে বাজিকরদিগের নৌকা লাগিল। নৌকাখানি আয়তনে সঙ্কীর্ণ, কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ষাট হস্ত হইবে। দেখিলেই মনে হয় যেন ডাকাতে ছিপ; কিন্তু এ ছিপে ছত্রী আছে, ডাকাতে ছিপে থাকে না।

সাহেবদের অনুমতিক্রমে পূর্ব্বের বারান্দাতেই বাজি দেখান সাব্যস্ত হইল। সাহেব-বিবিরা বারান্দার চারিদিকে আরাম-কেদারায় বা সোফায় বসিলেন, মধ্যস্থলে ঢালা বিছানায় বাজিকর সদলবলে সসরঞ্জামে বসিল। বাজিকরের পশ্চিমা মুসলমানের মত বেশ ভূষা। সে বাঙ্গলা দেশে বাজী দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিয়া বেড়াইতেছে। বাজিকর সুপুরুষ, সৌখিন যুবক; তাহার বাবরী চুল, গালপাট্টা রঙ্গিল দাড়ী, ছাঁটা রঙ্গিল গোঁফ, বড় বড় চোখে সুর্ম্মা, কাণে আতর-মাখা তুলা, মুখে পান; গলদেশে রঙ্গিল রুমাল; পরিধানে মসলিনের ইজের ও আচকান, মাথায় মোগলাই শামলা; আঙ্গুলে আঙ্গটী। বাজিকরের সাজসরঞ্জামও বিস্তর, অনেকগুলি বেতের চুপড়ি ও সিন্দুক পেঁটরা; সঙ্গে দুই তিন জন লোক,—একজন সানাইদার, একজন ডুগীদার এবং একজন তম্বীদার—সে সব যোগাড় করিয়া গুছাইয়া দিতেছে।

বাজনা আরম্ভ হইল; বাজিকর ইষ্টদেবতার নানারূপ বন্দনা

করিয়া সাহেবদিগকে সেলাম করিয়া খেলা আরম্ভ করিল। তাহার হাতে এক হাড়, পার্শ্বে একটা বেতের পেঁটরা, মুখে নানারূপ বুলি।

প্রথমেই সে গোলার খেলা, ছোরার খেলা, সুপারির খেলা প্রভৃতি সাধারণ খেলা দেখাইল। তাহার পর মুখ দিয়া ভলকে ভলকে আগুন বাহির করিল, তরবারি গিলিয়া ফেলিল, জীহ্বায় আগুন রাখিল, কাঁটায় চোখ ফুঁড়িল জীহ্বা ফুঁড়িল, এক মুঠা চাউল লইয়া ছড়াইয়া দিল সেগুলি কাড় হইয়া গেল, একজন খানসামার পেট হইতে একটা রাজহংস বাহির করিল, একজন সাহেবের হাতে একটা কাল পাথর দিল ও তিনবার তাঁহার মাথার উপর হাড় ঘুরাইল, তখনি সাহেবের হাত হইতে ঝর ঝর করিয়া ৪০।৫০টী টাকা বৃষ্টি হইল। আবার বাজিকর পারকার সাহেবের নিকট একটী টাকা চাহিল; সে টাকাটী বিছানার মধ্যস্থলে রাখিল; একটী আঙ্গটীও সে সাহেবদের নিকট চাহিয়া লইল, আঙ্গটীটীর মাথায় খুব বড় একখানা সবুজ-পাথর। আঙ্গটীটী সম্মুখে রাখিয়া সে তাহাতে তিনবার অস্থি স্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আঙ্গটীকে বলিল, "হো হো বেটা, রূপেয়া কে পাস আভি চলা যাও।" কি আশ্চর্য্য! যেমন বলা, অমনি আঙ্গটী উঠিয়া দাঁড়াইল, বড় পাথর-খানা উপরে রহিল, সেখানা জ্বল জ্বল করিতে লাগিল; তাহার পর আঙ্গটী নাচিতে নাচিতে টাকার কাছে গেল; টাকা প্রায় সাহেবদের পদতলে, আর চারিদিকে আলোকের ছটায় দিন হইয়া গিয়াছে, কাজেই সাহেবেরা স্পষ্ট দেখিলেন, আঙ্গটীর অঙ্গে সূতা বা তার কিছুই বাঁধা নাই! সাহেবেরা আশ্চর্য্য হইলেন। বাজিকর আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বেটা চলে আও ইসতরফ, রূপেয়া শালেকা কাণ পকড়কে লে আও। ময় তুমকো বহৎ পেয়ার করুঙ্গা।" আশ্চর্য্য! বলিবামাত্র সবুজপাথরখানা যেন আঙ্গটী হইতে হেলিয়া পড়িয়া টাকাটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল ও টাকার সহিত যেন কুস্তি

করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে টাকাকে লইয়া বাজিকরের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। সাহেব বিবিরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। লেডি লীলা মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "O wonderful! wonderful!"

বাজিকর সাহেবদের ভাব দেখিয়া বুঝিল, সাহেবেরা খুসী হইয়াছেন। সে তখন লর্ড ফ্রেডারিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপ ইস পর খুস হুয়ে হ্যায়, হুজুর! বহৎ আচ্ছা, নয়া তামাসা দেখ্ লিজিয়ে!" এই কথা বলিয়াই সে লর্ড ফ্রেডারিকের হস্তে একটি আকবরী মুদ্রা অর্পণ করিয়া তাঁহাকে উহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া শক্ত করিয়া মুঠার মধ্যে ধরিতে বলিল। সাহেব মুদ্রাটী ভাল করিয়া এপিঠ ওপিঠ দেখিয়া লইলেন, সকলকে দেখাইয়া লইলেন ও তাহার পর দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাজিকর উঠিয়া নানা বুলী আওড়াইয়া তাঁহার মুঠার উপর তিনবার হাড় ঠেকাইয়া তাঁহাকে মুঠা খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিতে বলিল। সাহেব মুঠা খুলিলেন। কি আশ্চর্য্য—মোহর ত' তথায় নাই! বাজকির ভাণ করিয়া কত মিথ্যা কাঁদিল—এত দামী আকবরী মোহর হারাইয়া গেল, কে দাম দিবে। সাহেব অপ্রস্তুত, তিনি মোহরের দাম কত জিজ্ঞাসিলেন। বাজিকর হাসিয়া বলিল, "আপকো কিমৎ দেনে নেহি হোগা, লেকিন আপকো ইস আসরফিকা ওয়াস্তে আপকে দোস্তকে সাথ ঝগড়া করকে আসরফি ওসুল করনা পড়েগা। আসরফি আপকে ইস সাহাব দোস্তকে পাস হ্যায়।" সে অনারেবল অগসষ্টসকে দেখাইয়া দিল। সকলে অবাক, লোকটা বলে কি? বাজিকর পুনরপি বলিল, "আপ লোক একিন নেহি করতে হ্যাঁয়, লেকিন উনিকে পাস আসরফি হ্যায়। হুজুর! আপ মেহেরবানি করকে এক দফে উনকে কুর্ত্তেকা জেব দেখ লিজিয়ে।" অগষ্টস সাহেব যেন কলে চালিত হইয়া হাতখানি বুক-পকেটে দিলেন ও কিছুক্ষণ পরে লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতচক্ষে

হাত বাহির করিয়া হাতের দিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Hallo Here is the coin! He is the devil himself!" আশ্চর্য সাহেবের হাতে সেই মোহর! বাজিকর হাসিয়া বলিল, "আপ আচ্ছি-তরেসে আসরফি পাকড় রাখিয়ে।" সাহেব তাহাই করিলেন; আবার মুঠার উপর অস্থিস্পর্শ হইল। সাহেব হাত খুলিলেন; অমনি সকলে দেখিলেন, সাহেবের হাতে সে মোহর নাই, তাহার স্থলে একটা কোলাবেঙ্গ! সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, সাহেব সেটাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাজিকর সেটাকে তুলিয়া লইয়া মুঠার মধ্যে রাখিয়া "আহা উহু" করিয়া কত আদর করিল, পরে মুঠা খুলিল; কি আশ্চর্য্য! সে বেঙ্গ নাই, তাহার স্থলে একটা চকচকে কড়ি!

বাজিকর কড়িটি লইয়া লর্ড ফ্রেডারিকের হাতে দিল, বলিল, "কৌড়ি লিজিয়ে, আব মাত খোনা।" লর্ড ফ্রেডারিক প্রত্যেককে সেই কড়িটী দেখাইয়া বেড়াইলেন; বিবিরা হাতে লইয়া দেখিয়া সন্দেহ দূর করিলেন। বাজিকর বুলি আওড়াইতে লাগিল ও সাহেবের মুঠার উপর পূর্ব্ববৎ তিনবার অস্থিস্পর্শ করিল। সাহেবের মনে হইল, কড়িটা মুঠার ভিতর বড় শীতল হইতেছে ও ক্রমশঃ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; শেষে মনে হইল তিনি আর কড়ি ধরিয়া রাখিতে পারেন না, তখন হাত খুলিলেন; খুলিয়াই কিন্তু তিনি ভয়ঙ্কর ভীতিবিহ্বলচক্ষে হাতের দিকে চাহিয়া হাতের দ্রব্যটাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Oh, my God! What a fright!"

সকলে সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, সাহেবের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই দ্রব্যটী বিছানার উপর ক্রমে চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে; সেটী আর কিছুই নহে,—দুইহস্তপরিমিত কালসর্প গোক্ষুরা! সে কুণ্ডলী ছাড়াইয়া লম্বা হইয়া ভীষণ চক্র ধরিয়া বিছানার উপর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে! হঠাৎ চক্ষের নিমেষে সেই একটা বড় সাপ শত শত ক্ষুদ্র সাপের ছানায়

পরিণত হইয়া ঘরের মেঝের উপর কিল কিল করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সাহেব বিবিদের মধ্যে "হাউ মাউ" পড়িয়া গেল; বিবিরা মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিলেন, ভয়ানক একটা ওলট পালট হইয়া গেল। পুলীশ সাহেব ভয়ঙ্কর চটিয়া বলিলেন, "Damn his soul! বরকন্দাজ বোলাও, নিকালো বাঞ্চটকো।" কালেক্টর সাহেব বলিলেন, "Look to the ladies! Let him depart with his bag and baggage, Parker. We don't want to see his devilish tricks any further."

পারকার সাহেব ধীর, স্থির, অচল, অটল। তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন; তিনি পূর্ব্বে একবার এইরূপ বাজি দেখিয়াছেন, কাজেই জানিতেন যে এ সমস্তই বাজিকরের খেলা। তবু বন্ধুদিগের মনস্তুষ্টির জন্য বাজিকরকে বলিলেন, "ইসি মাফিক টামাসা বণ্ড করো। ডুসরা ডেখলাও।"

বাজিকর বুঝিল ও মনে মনে পারকার সাহেবের সাহসের বিস্তর তারিফ করিল। পরে সাহেবের কথামত হাড় ঠেকাইয়া সাপের ছানা গুলিকে একত্র করিয়া মুখে ফুঁদিয়া একটী সর্পে পরিণত করিল ও সেটাকে হাতে ধরিয়া রাখিয়া সাহেব বিবিদের বসিতে বলিল। সাহেব বিবিরা বসিলেন বটে, কিন্তু তখনও প্রকৃতিস্থ হন নাই, লেডিরা তখনও ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছেন। লেডি সেলিনা বলিলেন, "Oh! horrible! what a shock!" লর্ড ফ্রেডারিক লেডি সেলিনার হাত দুখানি সযত্নে ধরিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "My darling! be composed. It is only juggling." পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "Of all created things I detest and loathe the genus most." অনারেবল অগষ্টস লর্ড ফ্রেডারিকের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "I admire your courage, old fellow! I would have fainted outright had

I been placed in your position. My God! a live Cobra-di capello!

বাজিকর এদিকে সেই সর্পটার মুণ্ড নিজের বদনবিবরে প্রবেশ করাইয়া দিল ও অল্প অল্প করিয়া সেই সর্পটার দেহ গিলিতে লাগিল। সাহেব-বিবিরা স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে বাজিকর সমস্ত সাপটাই গিলিয়া ফেলিল ও মুখব্যাদান করিয়া সকলকে দেখাইল, কিছুই নাই, সব ফাঁক! সাহেব-বিবিরা পরস্পর মুখাবলোকন করিলেন।

সর্ব্বশেষে বাজিকর সাহেবদিগের অনুমতি অনুসারে সংক্ষেপে খেলা সারিয়া "অন্তর্দ্ধান" বাজি দেখাইয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিল। অন্তর্দ্ধানের বাজি দেখিয়া সাহেব-বিবিরা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া রহিলেন। আর না হইয়াই বা করেন কি? সে বাজি যে দেখিয়াছে, সেই ঐরূপ হইয়াছে। বাজি কিরূপ?

বাজিকর মুখে সঙ্কেত করিল, অমনি তাহার নৌকা হইতে প্রতিসঙ্কেত হইল; এইরূপ দুই তিন বার সঙ্কেত প্রতিসঙ্কেত হইল। তাহার পর নৌকার মধ্য হইতে নানারত্নালঙ্কারভূষিতা মহার্ঘবস্ত্র-পরিহিতা নববধূবেশিনা একটী সুন্দরী যুবতী রমণী দুই হাতে দুই খানি ছোরা লইয়া লোফালুফি করিতে করিতে, নূপুরসিঞ্জনে তানলহরী তুলিয়া নাচিতে নাচিতে হরিণশিশুর মত চঞ্চলচরণে তথায় উপস্থিত হইল ও হাসি হাসি মুখে সব সাহেব বিবিকে একে একে অভিবাদন করিল। সাহেববিবিরা অবাক,—এ দেশের স্ত্রীলোক এত সুন্দরী হয়! তাঁহারা যুবতীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পারকার সাহেব চিন্তাস্রোতে ভাসিলেন,—"এইরূপ মুখই আর কোথায় দেখিয়াছি না? কি জানি, কোথায়!" দেওয়ানজী দূরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে-ছিলেন, "আরে না না, তাও কি কখন হয়! সে হল বাঙ্গালীর মেয়ে,

আর ও মোছনমানী। তবে খুপস্সুরৎ বটে। বা বা! রূপ ফেটে পড়ছে। অনেকটা তারই মত।"

বাজিকর রমণীকে লছমী (লক্ষ্মী) বলিয়া সম্বোধন করিল ও আপনার পত্নী বলিয়া পরিচয় দিল। তৎপরে বাজিকরের আজ্ঞায় একটী চেঁচাড়ির বড় ঝোড়া বারান্দার মধ্যস্থলে স্থাপিত করা হইল। হাস্যস্ফুরিতাধরা বরাননা লছমী সুন্দরী একে একে সকলকে অভিবাদন করিয়া সেই ঝোড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল; ঝোড়ার মুখ ঢাকিয়া তাহার উপর পর পর দুইখানি বস্ত্র আচ্ছাদিত করা হইল। তখন বাজিকর ও লছমীতে কথাবার্ত্তা চলিল। কথার ভাব পারকার সাহেব এবং পুলীশ ও কালেক্টর সাহেব বুঝিতে পারিলেন। পারকার সাহেব অন্যান্য সাহেব বিবিকে তাঁহা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা এইঃ—বাজিকর লছমীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিল; লছমী ঘৃণার সহিত তাহার প্রত্যুত্তর দিল; বাজীকর আরও চড়া সুরে দোষ দিল, লছমীও সমান ওজনে তাহার কথার জবাব দিল; এইরূপে কলহ পাকিয়া উঠিল; শেষে বাজিকর ভয়ঙ্কর রাগিয়া উঠিল ও লছমীর প্রাণবধ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল. লছমী প্রাণভয়ে কাতরে কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ দর্শকদিগকে চমকিত করিয়া বাজিকর চকিতে তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত ঝোড়ার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল; চক্ষের নিমেষে সে এইরূপে ঝোড়ার চারিদিক হইতে ভিতরে তরবারির খোঁচা দিতে লাগিল ও রক্তাক্ত তরবারি টানিয়া বাহির করিতে লাগিল; সেই আচ্ছাদনের বস্ত্র ও সেই স্থানটা রক্তে রাঙ্গা হইয়া উঠিল; আর লছমীর পরিত্রাহি চিৎকারে ও করুণ ক্রন্দনে জলস্থল ভরিয়া গেল।

সাহেবেরা প্রথমে কিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার মত

দাঁড়াইয়া রহিলেন; বিবিরা "Oh, Horror! Oh, Horror!" বলিয়া চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া অবসন্নভাবে সোফায় এলাইয়া পড়িলেন। এ সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটিয়া গেল। সাহেবেরা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্রোধে বাজিকরকে মারিতে উদ্যত হইলেন। লর্ড ফ্রেডারিক বাজিকরের ঘাড় ধরিয়া বলিলেন, "Now, cease flourishing your damned brutality, you dirty monster! Or else I will—" লর্ড ফ্রেডারিকের হস্ত প্রহারের অভিপ্রায়ে উদ্যত, চক্ষু ধক ধক প্রজ্বলিত, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।

বাজিকর কণামাত্র বিচলিত না হইয়া লর্ড ফ্রেডারিকের হস্ত হইতে কসরত করিয়া নিমিষের মধ্যে নিষ্কৃতিলাভ করিল ও বেশ ধীরে সুস্থে তরবারির রক্ত মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "বেবাকাকা আপনে গুণহাকে ওয়াস্তে মাফিক সাজা মিলা। শয়তান! কেয়া হামারা ইস মহব্বতকা ইয়ে নতিজা হুয়া?" তৎপরে বাজিকর একে একে আচ্ছাদনের বস্ত্র দুইখানি অপসারিত করিয়া গুছাইয়া রাখিল ও যেন তখনও তাহার ক্রোধের উপশম হয় নাই,—এইরূপ ভাণ করিয়া লাথি মারিয়া ঝোড়া উলটাইয়া ফেলিয়া দিল।

কি আশ্চর্য্য! একি পৈশাচিক না ভৌতিক কাণ্ড! কই, ঝোড়ার মধ্যে কিছুই নাই ত'! লছমীও নাই, কিছুই নাই, সব ফাঁকা। সাহেব বিবিরা একবারে স্তম্ভিত। একি! সত্যই কি ভারতবর্ষ যাদুকরের দেশ! তাঁহাদের দেশে খোলা তক্তা রাখিয়া, পর্দ্দা টানাইয়া, নানা আড়াল দিয়া মানুষ উড়াইয়া দিবার বাজি করে বটে, কিন্তু একি, এযে অভাবনীয় অব্যক্ত কাণ্ড! ফাঁকা জায়গা, চারিদিকে মানুষ ঘেরা, নীচে তক্তা নাই, পাশে পর্দ্দা নাই, আড়াল নাই; জীবন্ত মানুষটাকে তরবারির খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করিয়া হত্যা করিল, তাহার পরিত্রাহি চীৎকারে সকলে চমকিত হইল, আঘাতকালে তাহার অঙ্গসঞ্চালনে

ঝোড়া এধার ওধার টলিতে লাগিল, অথচ ঝোড়া উলটাইয়া দিলে পর সে মানুষ আর নাই!

সাহেব-বিবিরা অবাক, বাজিকরও ভাণ করিয়া দেখাইল, সেও যেন অবাক হইয়াছে। সে সুন্দরী পত্নীর জন্য কত শোকপ্রকাশ করিল, কত কাঁদিতে লাগিল, প্রত্যেকের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি তাহার স্ত্রী কোথায় জানেন? শেষে সে, "মেরি লছমী কাঁহা গয়ি রে," "লছমী আওরে", "মেরি জান আওরে", "মেরি কলিজা আওরে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

অকস্মাৎ সকলে ভয়বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শুনিলেন, বড় হলের মধ্য হইতে লছমীর মিঠা গলায় কে উত্তর দিল, "ময় অভি আওঙ্গি, জানি!" সকলে হলের দ্বারের দিকে উৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অমনি সকলে সাশ্চর্য্যে দেখিলেন, লছমী সুন্দরী সেইরূপ হাসিমাখা মুখখানি লইয়া, সেইরূপ নুপুরসিঞ্জন করিতে করিতে, সেইরূপ অভিবাদন করিতে করিতে হরিণশিশুর ন্যায় চঞ্চলচরণে হলঘর হইতে বারান্দায় বাজিকরের পার্শ্বে আসিয়া মিলিত হইল। বাজিকর আবেগভরে তাহাকে কত মিষ্ট সম্ভাষণ করিল।

সাহেব বিবিরা মহা সন্তুষ্ট; তাঁহারা স্বপ্নাতীত দৃশ্য দেখিয়াছেন, আশাতীত মুগ্ধ হইয়াছেন। তখন পারিতোষিক বিতরণের ধূম পড়িয়া গেল। সাহেব-বিবিরা মুক্তহস্তে বাজিকর দম্পতীকে নানা ধন রত্ন দান করিলেন; সুন্দরী লছমী বিবিদের নিকট দুই তিনখানি মূল্যবান অলঙ্কারও পাইল। যাইবার পূর্ব্বে বাজিকর সাহেবদিগের নিকট একখানা প্রশংসাপত্র ভিক্ষা করিল। সাহেবেরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা লিখিয়া দিলেন। বাজিকর সদলবলে সসরঞ্জামে বিদায় হইল; তাহাদের নৌকা ছাড়িয়া দিল। সকলেই বাজিকরের কৌশল ও লছমীর রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে. সাহেবেরা শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন. এমন সময় অনারেবল অগষ্টস হলঘরের দ্বারের সম্মুখে একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইলেন। তিনি সেখানি পারকার সাহেবের হাতে দিয়া বলিলেন, "Perhaps it has been left by the juggler out of mistake." সাহেব অন্যমনস্কভাবে সেখানি হাতে লইয়া না দেখিয়া বলিলেন, "What is it ? Is it the certificate ?" তাহার পর সেখানি খুলিয়া দেখিলেন, অক্ষরগুলি বাঙ্গালাভাষায় লিখিত। অন্যমনে সেখানি হাতে লইয়া নাড়িতে চাড়িতে হঠাৎ একটা কথার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন ; দেখিলেন বাঙ্গালায় তাঁহারই নাম লেখা। আলোকের নিকট বসিয়া তিনি তখন পত্রখানি পাঠ করিলেন :—

"মান্যবর পারকার সাহেব ! আমি আপনার অনেক গুণের কথা শুনিয়াছি। আপনি দয়ালু, পরোপকারী ও ন্যায়বান। আমি এরূপ সাধু লোকের কখনও অনিষ্ট করি না। আপনি আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া আমার লোকজন আপনাকে সোলাদানার পথে ধরিয়াছিল। আপনার উপর আমার কোনও মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। আমি কেবল আপনাকে একবার দেখা দিয়া ছাড়িয়া দিতাম। যাহা হউক, শুনিলাম আপনি আমায় ধরিবার বা প্রাণে মারিবার জন্য নানা উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। আমি কখনও আপনার অনিষ্ট করি নাই, ভবিষ্যতে করিবও না। তখন আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এই অধমের উপর আপনার আক্রোশ কেন ? আপনি আমার অনিষ্ট চেষ্টা ছাড়িয়া দিন। আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার কার্য্য করিয়া যান, আমিও স্বচ্ছন্দে আমার কার্য্য করিয়া যাই। অন্যথা পরস্পরের বিপদ ঘটিতে পারে। আর শুনিতেছি, আপনি বৈষ্ণবীর জন্য বড় খোঁজ করিতেছেন, তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তাই

বৈষ্ণবীকে আজ একবার দেখাইয়া লইয়া গেলাম। বৈষ্ণবী এখন হইতে আমার কাছেই থাকিবে, তাহাকে আর বৃথা অন্বেষণ করিবেন না। ইতি একান্ত বশংবদ, লাঠিয়াল ও যাদুকর হরিবেদের শিষ্য, লছমী-রূপিনী বৈষ্ণবীর স্বামী, বাজিকর ও ডাকাত, জীবন সর্দ্দার।"

পারকার সাহেব স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "এতো সামান্য ডাকাত নয়, এযে আমাদের দেশের রবিন হুডকেও ছাপাইয়া যায়। ইহার নানা বিদ্যা অভ্যস্ত আছে দেখিতেছি।" প্রকাশ্যে ডাকিলেন—"ডাট্টোখালি! ডাট্টোখালি!"

দেওয়ানজী সে রাত্রিতে গৃহে যান নাই, সাহেবের ডাক শুনিয়াই ঘুমচোখে দৌড়াইয়া আসিলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "বাজিকর নৌকা কেটো ডুর গিয়াছে ?"

দেওয়ানজী। (চোখ মুছিতে মুছিতে) ওঃ, সে এতক্ষণ বসন্তপুর ছাড়াইয়াছে।

সাহেব। আচ্ছা, টাহাকে এখোন ঢরিটে পারো ?

দেওয়ান। কাকে, সেই ছিপকে? হুজুরের দেশের জাহাজ এলেও এখন তাকে ধরতে পারে না।

সাহেব। বাজিকরকে ডেখিয়াছে ? ও কে আছে ?

দেওয়ান। ওতো একজন ভোজপুরী। আমাদের বড় মুহুরী উহাকে আনাইয়াছে।

সাহেব। ভোজপুরী! হাঃ হাঃ! ভালা ভোজপুরী আছে। ও জীবন সর্দ্দার আছে।

দেওয়ান শিহরিয়া উঠিলেন। সাহেব বলিলেন, "এই পট্র ডেখো। টুমাকে আর বৈষ্ণবী মিলাইটে হইবে না। জীবন সণ্ঢান ডিয়াছে। আর একটা কোঠা আছে, ময়ুরপঙ্খী সাজাইয়া ঠিক করিয়া রাখিবে।

ডাড়ীডিগকে সাট ডিনের রসড লইয়া প্রস্টুট ঠাকিটে বলিবে। কাল যাট্রা কারবে। টুমি সাবচানে কাজ করিবে।"

দেওয়ান চলিয়া গেলেন। সাহেব তখনও আরাম-কেদারায় শুইয়া নদীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন ও ভাবিতেছেন, "ঠিক কথা, জীবন তো আমার কোনও অনিষ্ট করে নাই; তবে কেন আমি তার অনিষ্ট করি?"

অন্নপূর্ণার অগ্নি-পরীক্ষা।

নিরঞ্জনের বড় কঠিন পীড়া। কবিরাজ বৃদ্ধ, বিচক্ষণ; তিনি প্রাণপণে রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন; কিন্তু গোপনে বলিয়াছেন, রোগ দুরারোগ্য,—শিবের অসাধ্য। নিরঞ্জনের বয়সে সর্ব্বনেশে বাতশ্লেষ্মাবিকার! কবিরাজ হতাশ হইয়াছেন। আজ সাত দিন, একটা বিষম ফাঁড়ার দিন, কবিরাজ বলিয়াছেন, আজিকার দিনের ফাঁড়া কাটিলে, আরও কিছুদিন টাল মাটাল খাইয়া রোগের উপশম হইতে পারে।

দারুণ জ্বর, তদুপরি প্রলাপ, মাথা-চালা, শয্যার উপর ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিয়া বসা.; গাত্রদাহ ও তৃষ্ণা ত' আছেই। রোগী থাকিয়া থাকিয়া "মা, মা," আর "জল, জল" করিতেছে, হাসিতেছে, গাহিতেছে, বকিতেছে, মাথা দুহাতে ধরিয়া ঝাঁকার দিতেছে, শয্যা আঁচড়াইতেছে।

দর্পনারায়ণের বৃহৎ পুরী শান্ত বনাশ্রমের মত নিস্তব্ধ; যেন তাহাতে একটী প্রাণীও নাই। সেই দারুণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে কেবল রোগীর প্রলাপ-চিৎকার গগন মেদিনী ভরিয়া দিতেছে।

রোগীর পরিচর্য্যা চলিতেছে নীরবে; গৃহকর্ম্ম চলিতেছে নীরবে. ঠাকুর-সেবা চলিতেছে নীরবে; সেরেস্তার কাজ চলিতেছে নীরবে ঢেঁকিশালা, গোশালা, অতিথিশালা, বাগান, খামার ইত্যাদির নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য যেমন হয় তেমনই হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সব নীরবে। সংসারের তাবৎ প্রাণী—কি গৃহস্থ, কি কর্ম্মচারী, কি ভৃত্য—কাহারও মুখে হাসি নাই, সকলেরই মুখ বিষাদতমসাচ্ছন্ন। সকলেই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করিতেছে। রোগ শোক, তাপ কষ্ট—সবই আছে, কিন্তু তাহার জন্য সংসারের কাজ পড়িয়া থাকে না; প্রত্যহ চাঁদ উঠে, ফুল ফুটে, বায়ু বহে, আহার বিহার নিদ্রা মৈথুন, কিছুই বাকি থাকে না। এই তো সংসার!

গ্রামের তাবৎ লোকে ঘন ঘন বহির্ব্বাটীতে সংবাদ লইয়া যাইতেছে; যাঁহাদের অন্দরে প্রবেশাধিকার আছে, তাঁহারা নীরবে অন্তঃপুরে গিয়া রোগীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন; সকলে বিষাদক্লিষ্টমুখে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘরে ফিরিতেছেন।

শান্তি সস্ত্যয়ন, নারায়ণে তুলসী-অর্পণ, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি কিছুরই ত্রুটী নাই। গ্রামের হিন্দু অধিবাসীমাত্রেই শ্রীহরির চরণে লুঠ মানিতেছে, অহরহ সেই সর্ব্বসঙ্কটনাশিনী দুর্গমে ত্রাণকারিনী মূলা শক্তি জগন্মাতাকে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে; মুসলমানেরা সেই সর্ব্বমুস্কিল-আসান পীরের নিকট সিন্নী মানিতেছে, বৃদ্ধ নাজীর গাজী দরগায় মাথা কুটিতেছে। আহা! সে যে নিরঞ্জনকে কাঁধে পিঠে মানুষ করিয়াছে, ছেলেবেলায় কত পাখীর ছানা ধরিয়া দিয়াছে, কত ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়াছে!

এই বিপদের সময় গৃহ-কর্ত্তা গৃহে নাই; দর্পনারায়ণ আজ কয় দিন হইতে কোম্পানীর কাজে স্থানান্তরে গিয়াছেন। মাঝে মাঝে

তাঁহাকে এইরূপে সরকার বাহাদুরের কাজ করিয়া দিতে হইত; তাঁহার মত সালিশী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে অতি অল্প লোকই ছিল। এখনও তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই। বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া মেজকর্ত্তা চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছেন। আজ রাত্রিকালে তাঁহার আসিয়া পৌঁছিবার কথা। তিনি বয়সে অনেকের অপেক্ষা নবীন হইলেও গ্রামের বুদ্ধি, বল, ভরসা। আজ এই বিপদের দিনে সকলেই তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছে।

রাত কাটে কি না কাটে। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী যেন অন্নপূর্ণার মত ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। আজ চারি পাঁচ দিন তাঁহার আহার নিদ্রা নাই; তিনি পুত্রের নিকট হইতে ক্ষণমাত্রও উঠেন না; চূড়ামণি মহাশয়ের বহু উপরোধ অনুরোধে দিনান্তে একটা ডুব দিয়া ডাব চিনি খাইয়া আবার রোগীর পার্শ্বে বসেন। বক্ষ দীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পাছে পুত্রের অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে এ পর্য্যন্ত এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেন নাই; কাঠ হইয়া চোখের জল চোখেই চাপিয়া রোগীর সেবা করিতেছেন। নিরঞ্জন প্রলাপের ঝোঁকে মা মা বলিয়া ডাকিলে তাহার মুখের উপর পড়িয়া "কেন বাবা! বাপ আমার!", বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। আহা! এক একটী তপ্তশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুকের হাড় যেন মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে! জননী পুত্রকে ঠাকুরের চরণামৃত, তুলসীমঞ্চের পবিত্র মৃত্তিকা এবং ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়াইতেছেন, মুখে চোখে বুকে বুলাইয়া দিতেছেন, মনে মনে ঠাকুরের কাছে শতসহস্রবার ঘাট মানিতেছেন, আর সকাতরে বলিতেছেন, "হে মা দুর্গা! হে মা কালি! মুখ তুলে চাও মা! কত জন্ম মহাপাতক করেছি, তাই কি এই শাস্তি দিচ্ছিস্ মা? মা! আমার পরমায়ু নিয়ে আমার নিরুকে ভাল ক'রে

দে মা, তোর সোণার শাঁখা পড়িয়ে দেব মা, বাবা তারকনাথের সোণার ত্রিশূল করে দেবো মা!" হায়রে! ঠাকুরকে অলঙ্কার দিলে যদি কর্ম্মফল রোধ করা যাইত! বিধির বিধান যদি পরিবর্ত্তন করা যাইত!

আজ বড় বাড়াবাড়ি, রোগীর নাড়ী বড় চঞ্চল, বড় দ্রুত, অথচ রোগী ক্ষাণ; রোগী আজ বড় অস্থির, বড় বেশী প্রলাপ বকিতেছে জননী অন্নপূর্ণা তাহাকে একরূপ ক্রোড়ে করিয়াই বসিয়া আছেন। বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় শয্যার অপরপার্শ্বে বসিয়া ঘন ঘন নাড়ী দেখিতেছেন ও ঘন ঘন বিকট ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি বিস্তৃত জাজিমের উপর চূড়ামণি মহাশয়, দাদাঠাকুর, মেজকর্ত্তা ও নকর্ত্তা বসিয়া আছেন। অন্নপূর্ণার আজ লজ্জা সরম কোথায় পলাইয়াছে; তিনি বর্ষীয়সী গৃহিণী, অথচ আজিও গ্রামের কোনও গুরুজন তাঁহার মুখ দেখিতে বা তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পান নাই। কিন্তু আজ তিনি সকলের সমক্ষে কবিরাজ মহাশয়কে বা চূড়ামণি মহাশয়কে রোগীর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছেন, বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ-বাক্য সত্য মনে করিয়া তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেছেন।

নিরঞ্জন বিষম মাথা চালিতে লাগিল; দেশে নাম সঙ্কীর্ত্তন হইত, তাহার সুর আবৃত্তি করিতে লাগিল,—"যেদিন যাবে জীবন, মধুসূদন," ইত্যাদি। অন্নপূর্ণা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকাতরে চূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কি—আর কি—কোনও উপায় নাই?"

চূড়ামণি। কেন মা, উপায় নাই কেন? তুমি তো জান, নিরুপায়ের উপায় যিনি, তিনিই উপায়। সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক, তিনিই রক্ষা করিবেন।

অন্নপূর্ণা। বাবা, তেমন করে ডাকিনি বলেই কি মধুসূদন বিমুখ হলেন? বাবা, আমার যে ঐ শিবরাত্রির সলুতে টুকু!

চূড়ামণি। ছি মা! ভগবান কি কখনও বিমুখ হন, তিনি যে মঙ্গলময় দয়াল দীনবন্ধু!

দাদাঠাকুরের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, কথাই কহিতে পারেন না; বহু কষ্টে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "উঠ মা লক্ষ্মী! গাঁ শুদ্ধ লোককে কি মা হারা কর্‌বি?"

অন্নপূর্ণার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। ঘরে মেজকর্ত্তা, ন-কর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজন রহিয়াছেন, সে কথা তাঁহার স্মরণ নাই। তিনি কেবল মাথা কুটিতেছেন আর বলিতেছেন. "ওগো, আমি বুক চিরে রক্ত দিচ্ছি, আমার গোপালকে বাঁচাও। ওগো, নিরু যে আমার ঠাকুরের দোর ধরা!"

সকলেরই চক্ষুতে জল। চূড়ামণি মহাশয় নীরবে চক্ষুর জল মুছিয়া ভাবিলেন, "গ্রাম শুদ্ধ লোকে মাথা কুট্‌ছে; সকলের কাতর প্রার্থনা কি বিফল হবে? হরি হে! মুখ রেখো, দয়াময়!"

অকস্মাৎ সকলে সবিস্ময়ে শুনিলেন, কবিরাজ মহাশয় বলিয়া উঠি-লেন, "জয় মধুসূদন! জয় নারায়ণ!" কবিরাজ মহাশয়ের মুখ হর্ষোৎ-ফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণপূর্ব্বেই সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই অমোঘ ঔষধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় সানন্দে বলিলেন, "আর ভয় নাই, বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাইল।"

চূড়ামণি মহাশয় আনন্দগদগদস্বরে ভগবানের নাম লইলেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল; তিনি বলিলেন, "ভগবান, তুমিই সত্য!" সকলেই অন্তরে সেই সর্ব্বব্যথাহারী শ্রীহরির নাম লইলেন।

চূড়ামণি মহাশয় ও দাদাঠাকুর তখন অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর চৈতন্য-সম্পাদন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন, "মা লক্ষ্মী! এই দেখ মা, তোমার নিরু যে ভাল হয়ে উঠেছে।" আহা! উন্মাদিনীর কাণে কে যেন সুধাবর্ষণ করিল! অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ত্রস্তে উঠিয়া বলিলেন, "কই, কই, আমার নিলমণি কই!"

এমন সময়ে দূর হইতে পালকী বেহারার "হুঁই হাঁই, হুঁহুঁরে" শব্দ স্পষ্ট শ্রুত হইল। দাদাঠাকুর সানন্দে বলিলেন, "ঐ ছোট কর্ত্তা আসছেন, আর ভয় নাই।" বস্তুতঃ সকলের বুক হইতে যেন একটা পাষাণের গুরুভার নামিয়া গেল।

সত্যসত্যই দর্পনারায়ণ আসিয়াছেন, তিনি সারাপথ প্রাণটা হাতে লইয়া আসিতেছেন,—কি শুনি শুনি; যখন গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, গ্রাম নিস্তব্ধ, চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। দর্পনারায়ণের মন একেই হু হু করিতেছে, তাহাতে প্রকৃতির দারুণ নীরবতা তাঁহার মন আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। বাহির্ব্বাটীতে পৌঁছিয়াই দর্পনারায়ণ দেখিলেন, দেউড়ীতে বিস্তর লোক; তাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান—সকল জাতিই বিদ্যমান, সকলেই রোগীর সংবাদ লইতে আসিয়াছে। দর্পনারায়ণ তাহাদেরই নিকট শুনিলেন, অবস্থা একটু ভাল। দর্পনারায়ণ চক্ষু মুদিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিলেন ও অবিলম্বে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন।

দর্পনারায়ণ নিরঞ্জনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন কি হইতেছে, তাহা সেই অন্তর্যামীই জানেন। ঠিক সেই সময়ে নরহরি সেন পাগলের মত ছুটিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কেমন একপ্রকার বিকৃতস্বরে বলিল, "এই যে আপনারা সব এখানে। শীঘ্র আসুন, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমায় বাঁচান!"

নরহরির চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখের ভাব বিকট। মানুষ অতিরিক্ত চিন্তায় কিম্বা ভয়ে যে আকার ধারণ করে, নরহরির তখন ঠিক সেই অবস্থা। উপস্থিত সকলে নরহরির সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, তদধিক তাহার কথা শুনিয়া, বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মেজকর্ত্তা বলিলেন, "কি হইয়াছে, সেনজা? তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে।"

"হাঁ, সে বড় ভয়ানক ঘটনা। তা মুখে বলিবার নয়। আপনারা দেখিবেন আসুন। ও হোঃ হোঃ! আমার সোনার সংসার ছারখারে গিয়েছে!"

নরহরি এই কথা বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সকলের বিস্ময়ের আর সীমা নাই। কবিরাজ মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনারা বাহিরে যান, এখানে গোল করিবেন না।" সকলে অপ্রতিভ হইয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। দর্পনারায়ণও বিস্ময়ান্বিত হইয়া সকলের সঙ্গে উঠিলেন। তখনও তাঁহার হাতে মুখে জল পড়ে নাই। বাহিরে গিয়া দর্পনারায়ণ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "কি হয়েছে, নরহরি?"

নরহরি। কি হয়েছে? সব হয়েছে, আমি সব হারিয়েছি! ওরে বাপরে! সংসারের এত জ্বালা? কেন জন্মেছিলাম—রে!

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন। সকলেরই ধারণা হইল, নরহরির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

দর্পনারায়ণ বিস্মিত হইয়া নরহরির হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "নরহরি, এমন করিতেছ কেন? কি হইয়াছে বল।"

নরহরি হাপুসনয়নে কাঁদিয়া বলিল, "কি বল্‌বো, কর্ত্তামশাই বল্‌তে যে বুক ফেটে যায়! ওহোঃ হোঃ! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!

দর্পনারায়ণ। এঁ্যা, সে কি? কি হইয়াছে? শীঘ্র বল।

নরহরি। বল্‌তে যে পারি না, কর্ত্তামশাই! আসুন, দেখ্‌বেন আসুন, আমার সোনার সংসার শ্মশান হয়েছে! ও হোঃ হোঃ!

নরহরি এই কথা বলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল। ছোটকর্ত্তা একবার সকলের মুখপানে বিস্ময়াকুল লোচনে তাকাইলেন, মুহূর্ত্ত পরে নরহরির অনুসরণ করিলেন। তাঁহার স্নানাদি পড়িয়া রহিল; পুত্রের রোগশয্যার কথাও মনে রহিল না। মেজকর্ত্তা, নকর্ত্তা ও দাদাঠাকুর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; চূড়ামণি মহাশয় রোগীর তত্ত্বাবধানের জন্য তথায় রহিলেন।

সেনেদের সর্ব্বনাশ।

আজ মধ্যাহ্ন হইতে হরিমতী গৃহে আসে নাই। মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া গালে দোক্তা পান পুরিয়া সেই যে মালতীর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া পাড়া বেড়াইতে গিয়াছে, সেই অবধি আর ঘরে আসে নাই। অপরাহ্ন গেল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, তবু হরিমতীর দেখা নাই। সন্ধ্যা হইলে সে যেথায় থাকুক ঘরে ফিরিয়া আসে, তবে আজ আসিতেছে না কেন? মালতীর প্রাণ ধড়ফড় করিতে লাগিল। অন্য দিন শচীরাণী সঙ্গে থাকে, আজ আবার সেও সঙ্গে যায় নাই। সে দুরন্ত মেয়ে, কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘরে আসিয়াছে ও আহারাদি করিয়া শুইয়াছে। সে দিদির খবর জানে না। পুরুষেরা কার্য্যে গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই। পুরুষের মধ্যে নরহরি আর ভজহরি; রামহরি আজ কয়দিন হইতে বসন্তপুরে গিয়াছে; ঘরে ফিরে নাই। মালতী কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

ইদানীন্তন মালতীকে শাশুড়ীর সহিত কথা কহিতে হইত; কেন না, তাহা না করিলে সংসার চলে না। কেহ সংসারের কোনও ধার ধারে না, যা করে মালতী। কাজেই সংসারের কথা শাশুড়ীকে না জিজ্ঞাসা করিলে সংসারের কাজ হয় না। মালতী স্বভাবতঃই অতি মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কথা কহিত; কথা কহিবার সময়ে শাশুড়ীর সম্মুখে মুখখানি নত করিয়া, অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধবদন আচ্ছাদিত করিয়া, কথা কহিত। কিন্তু আজ তাহার মন এত চঞ্চল হইয়াছে যে, সে একবারে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও ভয়ব্যাকুলিত স্বরে জিজ্ঞাসিল, "মা! ঠাকুরঝি এখনও এলো না কেন? রাত এক পহর হয়ে এলো, কোথায় গেলো মা?"

সেন-গৃহিণীর মেজাজ আজ বড় কড়া; আজ প্রাতঃকাল হইতেই সে সকলের উপর খড়্গহস্ত হইয়া আছে। পুত্রবধূর কথার উত্তরে সে বলিল, "কোথায় গেল তা আমি কি জানি? চুলোয় গেছে। কোথায় যায় তা আমায় কখনও বলে যায় নাকি? তোদের দুজনের দিন রাত গুজগুজুনি ফুসফুসুনি; তোরাই জানিস কোথায় যায় আসে। পোড়ারমুখি! পাড়াবেড়ানি! সমস্ত মেয়ে গালে পানের টেবলা পুরে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন। আসুক আজ, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব এখন।"

মালতী দেখিল, শাশুড়ী আসল কথা কাণে তোলেন না। সে মহা বিভ্রাটে পড়িল। সুন্দরী বিধবা যুবতী,—এত রাত অবধি ঘরে আসে না কেন? কাহাকেই বা খুঁজিতে পাঠায়, কাহাকেই বা বলে, সে ঘরের বউ। এই সময়ে দেবর রামহরিকে মালতীর মনে পড়িল, আহা অমন লক্ষ্মণের মত দেবর কি কাহারও হয়! সে থাকিলে মালতীকে এত ভাবিতে হইত না। মালতীর চোখে জল আসিল। সেন-গৃহিণী মালতীর নীরব ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়াছিল। সে অমনই

তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "ওরে আমার ঝাঁঝরাচোখি! নেকরা করে সোহাগ জানাচ্ছেন। খবরদার চোখের জল ফেলিস নি বলছি। ভিটের লক্ষ্মী ছাড়িয়ে দিচ্ছে; মর, মর!"

মালতী সে কথা কাণে তুলিল না। তাহার মন তখন বড় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সে ব্যাকুল হইয়া আবার বলিল, "মা, পূবের বাড়ীতে খবর দিন, ঠাকুরঝিকে খুঁজতে—"

সেন-গৃহিণী বাঘিনীর মত লাফাইয়া উঠিয়া মালতীকে বলিল, "যা যা, ছুঁচো ছুঁড়ী কোথাকার! আমায় এল পরামর্শ দিতে! নিজের চরকায় তেল দিগে যা।"

মালতীর মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে রন্ধনশালায় চলিয়া গেল। সেন-গৃহিণী তখন কন্যা ও পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া অজস্র গালি দিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে নরহরি ও ভজহরি বাটী আসিল। দুই ভ্রাতায় আজ সোলাদানার হাটে ধান্য বিক্রয় করিতে গিয়াছিল; এই মাত্র বাঙ্গোড়ে নৌকা বাধিয়া আসিতেছে। নরহরি গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই শুনিল, তাহার জননী চিৎকার করিতেছেন; অমনই তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, ভাবিল, আজ আবার এক কাণ্ডই বা বাধে! এরূপ কাণ্ড যে প্রায় ঘটিত না এমন নহে, তবুও যে দিনই নরহরি জননীকে ক্রুদ্ধা দেখিত, সেই দিনই তাহার বুক ধড়ফড় করিত, সে কেবল ভগবানকে ডাকিয়া কাতরে প্রার্থনা করিত, "হে ভগবান! আমার এ যাতনার অবসান করিয়া দাও, হে ভগবান! ঝগড়া কলহ আমার গৃহ হইতে দূর করিয়া দাও। আমি আর কিছুই চাই না, আমায় শান্তিতে বাস করতে দাও।" হায় নরহরি! তোমার মত জগতে অনেকেই শান্তির জন্য মাথা কোটাকুটি করে, সকলের প্রার্থনা যদি পূর্ণ হইত!

নরহরি ম্লানমুখে গৃহে প্রবেশ করিল। হতভাগ্য যুবক ক্লান্তিদূর

করিবারও অবসর পাইল না। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া জননীকে শান্ত করিল; সেই অবসরে তাহার মাথার উপর দিয়া গালাগালির ঝড় বহিয়া গেল। নরহরি আপন শিরে গালাগালির ধারা বহন করিয়া কৃতার্থ হইল; ভাবিল, এইবার জননী শীতল হইলেন। কিন্তু নরহরির অদৃষ্টে বিধাতা শান্তি লিখেন নাই। নরহরি জননীর নিকট শুনিল, হরিমতী ঘরে আসে নাই। সে অমনই গায়ের ঘাম মরিতে না মরিতে বাটীর বাহির হইল। ভজহরিও তাহার অনুসরণ করিল; রান্নাঘরে বউএর নিকট ভাত চাহিয়া ভাত খাইবে বলিয়া মুখে হাতে জল দিতে যাইতেছিল; কিন্তু ভাতে আর বসা হইল না, সেও চলিল। বাটীর বাহির হইয়া নরহরি পূর্ব্ব দিকে গেল, ভজহরি পশ্চিম দিকে গেল।

নরহরি দুই চারি বাড়ী খুঁজিয়া শূলপাণি ভট্টাচার্য্যদিগের বাটীতে সন্ধান পাইল যে, হরিমতী সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদের বাটীতে ছিল; ঠিক সন্ধ্যার সময় তাহাদের বাটী হইতে গৃহাভিমুখে গিয়াছে। নরহরি শূলপাণির ভগিনী নবকুমারীর মুখে শুনিল যে, হরিমতী তাহাকে বলিয়াছে আজ তিন চারিদিন তাহার গা ছম ছম করে, যেন মনে হয় কে তাহার অনুসরণ করে, সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদের বাটীতে আসিবার সময় সে স্পষ্ট দেখিয়াছে, দুই জন অচেনা লোক গ্রামের পথে চলিতেছে, তাহাকে দেখিয়াই তাহারা যেন চোখে চোখে কি একটা সঙ্কেত করিতেছে। তাই শূলপাণি ও নবকুমারী তাহাকে কাঁকফুলতলা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে। নরহরি ভাবিল, ও সব পুঁটীর মনের ভ্রম। কিন্তু তাহা হইলে পুঁটী গেল কোথা? সে আরও দুই চারি বাড়ী ঘুরিল, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যর্থমনোরথ হইল। তখন তাহার মনে ভয় হইল। সে ভাবিল, "এ কি হইল? এমন ত' কোন দিন হয় না। পুঁটী

কোথা গেল? উহারা বলিতেছে, পুঁটীকে কাঁকফুলতলা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কাঁকফুলতলা হইতে আমাদের বাটী একটা মোড়, সেখান হইতে জোরে কথা কহিলে শুনা যায়। ওখান হইতে কোথা গেল? কাঁকফুলতলা দিয়া উত্তর দিকে গেলে বাঙ্গোড়ে যাওয়া যায়। পুঁটী বাঙ্গোড়ের দিকে যায় নাই ত'? তা কেন যাইবে? রাত্রিকালে বাঙ্গোড়ে যাইবার তাহার কোনও আবশ্যক নাই। কিন্তু খোঁজ করিতে ক্ষতি কি? যাই দেখিয়া আসি।"

নরহরি বাঙ্গোড়ের তীরে উপস্থিত হইল। সেখানে কারখানায় তখনও নৌকা মেরামত হইতেছে। নরহরি মিস্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক সন্ধ্যার পরে বাঙ্গোড়ের তীরে তাহারা কোনও স্ত্রীলোককে দেখিয়াছে কি না। উত্তরে তাহারা বলিল, "স্ত্রীলোক? কই, স্ত্রীলোক দেখি নাই। তবে একখানা পূবে চূণের ভড় আজ কদিন থেকে ঘাটে বাঁধা ছিল, তারই জন কতক লোক সন্ধ্যার পরেই গ্রামের ভিতর থেকে একটা মোট নিয়ে নৌকায় উঠ্‌ল দেখেছিলাম, তার পরেই তারা একখানা ডিঙ্গ খুলে বেরিয়ে গেল। তামাক খাবে না, সেনজা?" সেনজার তখন মাথা টলিতেছে; সে বলিল, "না কাজ আছে"। নরহরি আরও দুই চারি স্থানে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিল।

এদিকে নরহরির বাটীতে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। মালতী রন্ধনশালায় অন্নব্যঞ্জনাদি আগুলিয়া বসিয়া আছে। দুর্ভাবনায় তাহার অন্তরাত্মা শুখাইয়াছে। সে কেবল আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে। এমন অদৃষ্ট লইয়া আসিয়াছে যে, একদিনের তরেও সংসারের কাহাকেও সে সুখী করিতে পারিল না। শৈশবের, বাল্যের, কত কথা মনে পড়িল। বাপ মার আদর, ভ্রাতা ভগিনীদের যত্ন, সেই খেলা ধূলা, সেই হাসিখুসি, একে একে সব কথা মনে পড়িতে লাগিল; মালতীর চক্ষুপল্লব জলাসিক্ত হইল। শ্বশুরগৃহে আসিয়া শ্বশুরের সেই পিতার

অধিক স্নেহের কথা মনে করিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মালতী ভাবিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ রাত্রির সেই গম্ভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এক পরিত্রাহি আর্ত্তনাদ উঠিল। মালতীর শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল। মালতী সেই আর্ত্তনাদে শচীরাণীর কণ্ঠস্বর অনুভব করিল। সে অমনই দ্রুতবেগে রন্ধনশালার বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়াই দেখিল, তাহার শাশুড়ী ঘরের দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া হাত পা ছুড়িয়া "ওরে গেল রে, ওরে সর্ব্বনাশ হল রে," বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। মালতী দাওয়ার উপর উঠিয়া দেখিল, ঘরে দাউ দাউ আগুন জ্বলিতেছে, বিছানা মাদুর সব জ্বলিতেছে, আর সেই আগুনে বেষ্টিত হইয়া শচীরাণী পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে। মালতী পাগলিনীর মত ঘরের মধ্যে এক লম্ফে প্রবেশ করিল; ধূমে কিছুই দেখিতে পায় না; সর্ব্বাঙ্গ আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে, মালতীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে ডাকিল, "খুকী, খুকী"; পরমুহূর্ত্তেই সে জ্বলন্ত শচীরাণীকে বুকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল। দাওয়ার উপর কলসীতে জল ছিল; মালতী কলসীর জল শচীরাণীর অঙ্গে ঢালিয়া দিল; আগুন নিভিল। তখন মালতী কলসী কলসী জল আনিয়া ঘরের বিছানার আগুন নিভাইয়া ফেলিল। শয্যার শিয়রে প্রদীপ জ্বলিতেছিল; সম্ভবতঃ বাতাসে মশারি উড়িয়া প্রদীপের আলোকে পড়িয়াছিল ও তাহাতেই বিছানায় আগুন ধরিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে অগ্নি চালার গায়ে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কেবলমাত্র শয্যাটীতেই আগুন লাগিয়াছিল; তাই অল্পেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। এ কার্য্যগুলি এত অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল যে, সেন-গৃহিণী তাহা অনুভবই করিতে পারিল না; সে কেমন হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। মালতীর হাত পা পুড়িয়াছে, চোখ মুখ ঝলসিয়া গিয়াছে, বিষম জ্বালা করিতেছে, কিন্তু শচীরাণীর ভাবনায়

তাহার সে জ্বালার অনুভূতিই হইল না। সে ছুটিয়া গিয়া শচীরাণীকে কোলে লইয়া বসিল ও নারিকেল তৈল ও চূণ ফেনাইয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিতে লাগিল।

এই দারুণ বিপদের সময়েও সেন-গৃহিণী মালতীর সকলই কু ঠাওরাইতেছে। শচীরাণী ঘরে ঘুমাইতেছে, সে দাওয়ায় বসিয়া ঢুলিতেছে, এমন সময়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া কন্যাটীকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে এ বুদ্ধিও তাহার যোগাইল না; সে কেবল হায় হায় করিতে লাগিল। তাহার পর মালতী শচীরাণীকে আগুনের মুখ হইতে উদ্ধার করিল, ঘরের আগুন নিভাইল, শচীরাণীকে শুশ্রূষা করিতে বসিল। লোকজন ডাকিতে হইল না, হাঁকাহাঁকি করিতে হইল না, কেমন নীরবে কার্য্য সম্পন্ন হইল। সেন-গৃহিণীর সহ্য হইল না। সে আপন মনে গজরাইতে গজরাইতে বলিল, "সর্ব্বনাশি! জানি কোন দিন সর্ব্বনাশ হবে। রোজ বলি, পিদ্দীমটা মশারির কাছে রাখিস্ নে, তা চোখকাণখাগীরা যে চোখকাণের মাথা খেয়ে বসে আছেন।"

মালতী কথনও কথার প্রত্যুত্তর করে না, কিন্তু এ কথাটার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি তো আলো চৌকির উপর রেখেছিলাম, মা।"

আর যায় কোথা, সেন-গৃহিণী একবারে ধেই ধেই নাচিয়া উঠিল। বলিল, "কি বল্লি হারামজাদি, ছোটনোকের মেয়ে! যত বড় মুখ তত বড় কথা! তুই রাখিস নি তো কি আমি আলো মশারির কাছে রেখেছি? আমার মেয়ে পুড়ে মরে, তা আমার ভয় নেই, তোর হল ভয়! রাক্ষুসী! তুই ইচ্ছা করে আগুন ধরিয়ে আমার মেয়েটাকে খেয়েছিস।"

মালতী কোনও উত্তর করিল না। নীরবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দুই

ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। সেন-গৃহিণীর ক্রোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; তাহার চোখমুখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। সে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুই কি সামান্তি ধাড়ী! একটাকে খেয়েছিস, এটাকেও খেতে বসিছিস্। তুইই জানিস পুঁটী কোথায়। আমি বুঝি কাণে তুলো দিয়ে থাকি, না লা? আমি সব বুঝি। এখন যে দুজনের পীরিত খসেছে, পুঁটী এখন এখন দুকথা শোনায় কিনা? তাই ডাইনীর চোখের শূল হয়েছে। বল্, সর্ব্বনাশী, বল্ তার পানের সঙ্গে সেঁকো দিয়ে তাকে প্রাণে মেরেছিস্ কিনা, বল্!"

সেন-গৃহিণীর এ কথার অর্থ ছিল। যতদিন রামহরি বাটীতে ছিল, ইচ্ছা থাকিলেও গৃহিণী তাহার ভয়ে মালতীর উপর অত্যধিক অত্যাচার করিতে পারিত না। কিন্তু এখন রামহরি নাই, তাহাকে আর পায় কে—মালতীর উপর অত্যাচার চরমে চড়িল। মালতী দারুণ অপমানে অত্যাচারে অহোরাত্র জর্জ্জরিত হইত। কিন্তু কি মধুময়ী প্রকৃতি তাহার, সে কথার উত্তর দিতে অথবা কটু বলিতে জানিত না; নীরবে সকলই সহ্য করিয়া যাইত। সে সর্ব্বদাই ভাবিত, "আমার শাশুড়ীর রোগে শোকে তাপে মাথার ঠিক নাই; আমিও পদে পদে কত অপরাধ কর্‌ছি; তাই তিনি সহ্য কর্‌তে পারেন না। তিনি শাসন না কর্‌লে আমায় কে শাসন কর্‌বে? আমার আবার মান অভিমান কি?

মালতী কিছুই গায় মাখিত না, অকারণে বিনা দোষে সর্ব্বদা অপমানিত, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইলেও সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে; ইহার উপর যখন সে জগতে স্ত্রীজাতির সর্ব্বস্ব, ইহকাল পরকাল, সকল আবদার অভিমানের স্থান,—স্বামীর নিকট অনাদর ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইত, তখন

তাহার প্রাণ বড় কাঁদিয়া উঠিত, মন বড় হু হু করিত, সে তখন সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুঃখী তাপীর সহায়, মৃত্যুকে ডাকিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সদানন্দময়ী হরিমতীর হাসিমাখা মুখে মাঝে মাঝে নিরানন্দের একটীমাত্র রেখাপাত হইত। মালতীর বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিলে হরিমতীর অফুরন্ত হাসিও কোথায় চলিয়া যাইত; সে যখন মালতীর অন্তরের বেদনা নিজের অন্তরে অনুভব করিত, তখনই তাহার আনন্দ বিষাদে পরিণত হইত। রামহরির গৃহত্যাগের পরে যখন মালতীর উপর অত্যাচার চরমে চড়িল, তখন সে এক উপায় উদ্ভাবন করিল। সে চুপি চুপি মালতীর সহিত একটা পরামর্শ করিল, মালতী তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া আকুল। হরিমতী মালতীর গলাটী জড়াইয়া কাণে কাণে বলিল, "দেখ্ ভাই! মা তোকে বক্‌লে আমি যদি অসহ্য হ'লে তোর হয়ে দুকথা বলি, তা হলে মা তখনই ধিতাং ধিতাং নাচতে থাকে, আর তোকে গাল দিয়ে বিষ ঝেড়ে দেয়। এবার থেকে আমি উল্টো গাইব, দেখি কি হয়।"

মালতী বলিল, "সে আবার কি, ঠাকুর ঝি?"

হরিমতী তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া গালে ঠোনা মারিয়া বলিল, "আ মরণ, ঢেঁকি কিছু যদি বোঝে! ওলো, এবার থেকে মাও যাই তোকে বক্‌তে সুরু করবে, আমিও অমনই যোগ দেবো, তোকে বকে ফাটিয়ে দিব। একজন তোকে গাল দিচ্ছে শুনলে মার আহ্লাদ হবে, আর তা হলেই মা চুপ করে যাবে। কেমন, মন্দ যুক্তি ঠাওরেছি।"

মালতী হাসিয়া লুটিপাটি খাইল, বলিল, "এতও জান তুমি!"

হরিমতী বলিল, "মরণ! হেসেই গেলি যে। দেখ্, আমি বক্‌লে বা গাল্ দিলে তা তো আর তোর গায় লাগবে না, সে তো 'বেলে' গাল হবে।"

মালতী কিছুতেই হরিমতীকে মায়ের সহিত ওরূপ কপটতাচরণ

করিতে দিবে না। কিন্তু হরিমতী যাহা ধরিত, তাহা ছাড়িত না; কাজেই মালতীর কথা ভাসিয়া গেল।

তাহাই হইল, হরিমতীর কথাই রহিল। মালতীকে গৃহিণী তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, হরিমতীও মালতীকে তিরস্কার করিত। গৃহিণী প্রথম প্রথম বিস্মিত হইত, কিন্তু শেষে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইত ও আনন্দে অত্যধিক তিরস্কার করিতে ভুলিয়া যাইত। আজ কয়দিন হরিমতী এইরূপে মালতীকে তিরস্কার করিত ও মাকে শুনাইয়া গঞ্জনা দিত, মায়ের সাক্ষাতে সে মালতীর সহিত হাসিয়া কথা কহিত না। সেন-গৃহিণী প্রত্যহ এইরূপ দেখিয়া স্থির করিল, ননদে ভাজে মনোবিবাদ হইয়াছে, তাহারই ফলে হরিমতীর এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আর উভয়ের মধ্যে শত্রুতার বীজ উপ্ত হইয়াছে।

আজ হরিমতীর উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। পুত্রবধূকে তিরস্কার করিতে করিতে হঠাৎ ননদ-ভাজের শত্রুতার কথা গৃহিণীর মনে পড়িল; কে যেন অন্ধকারে আলোক আনিয়া দিল। গৃহিণী বেশ ছুতা পাইল,—মালতী হরিমতীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে, তাই হরিমতী আসিতেছে না। অবশ্য মালতীকে বিষনয়নে দেখিলেও গৃহিণী মালতীর প্রকৃতি জানিত; মালতী একটা সামান্য মক্ষিকাকেও মারিতে প্রাণে ব্যথা পায়, মালতী হরিমতীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবে?—অসম্ভব। এ কথা সে বিলক্ষণ জানিত। তবে তিরস্কারটা একটু পাকাপাকি ঘোরাল রকমের হয় বলিয়া সে ঐ কথা ঠেস দিয়া বলিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারিল না।

মালতী কিন্তু কথাটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। মনে মনে বলিল, "মা বসুন্ধরা, দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি। শাশুড়ী এতদিন ঘর করিয়াও আমায় চিনিলেন না, কি বরাত আমার!"—এই কথা ভাবিয়া তাহার প্রাণ ফাটিয়া গেল। সে অন্তরের দুঃখ অন্তরেই

চাপিয়া শচীরাণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সেন-গৃহিণী কলহের একটা সূত্র পাইয়াছে, আর তাহাকে পায় কে? বিনাইয়া বিনাইয়া নানা সুর ভাঁজিয়া নানা ছাঁদে নানা কথা তুলিয়া সে মালতীকে গঞ্জনা দিতে লাগিল:—"ওমা, কি রাক্ষসে অলুক্ষুণে বৌই ঘরে এনেছিলুম! সংসারটা ছারেখারে দিলে গা! দুদিন তর সইল না, ঘরে পা দিতে না দিতেই কত্তাকে খেলে, আবার মেয়ে দুটোকে খেলে, ছেলেগুলোকেও খেতে বসেছে। মর মর, শীগ্‌গীর মর, আমি আবার নোরোর বে দিয়ে বৌনিয়ে আসি। কি রাক্ষসের বংশেই জন্মেছিল! বাবা, বাবা! বাপ রাক্ষস, মা রাক্ষস, সব রাক্ষস, চোদ্দ পুরুষে রাক্ষসের বংশ, ও কি আর ভাল হয়!" ইত্যাদি।

কি জানি কেন, আজ কি হইতে কি হইয়া গেল। ইহা অপেক্ষা কঠোর কথা মালতী বহুদিন শুনিয়াছে, মুখটী বুজিয়া সকলই সহ্য করিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ বিধির বিধান অন্যরূপ। কি জানি কেন, হরিমতীর জন্য ও শচীরাণীর জন্য তাহার মনটা আজ বড় চঞ্চল ছিল বলিয়াই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, পিতৃকুলের অযথা নিন্দা আজ মালতীর অসহ্য বোধ হইল। সে বলিল, "আমায় গাল দিন না মা। আমার মা বাপকে কেন গাল—"

সেন-গৃহিণী মালতীর কথা শেষ হইতে দিল না। সে বাঘিনীর মত লাফাইয়া উঠিয়া তাহার মুখের নিকট হাত নাড়িয়া বলিল, "ওরে আমার বাপ-সোহাগী রে! গাল দেবো না, তোর চোদ্দপুরুষকে গাল দেবো, তোর সাত গুষ্ঠীকে গাল দিয়ে ভূত ভাগাবো। আ মোলো যা, যত বড় মুখ তত বড় কথা! মুড়ো খেংরা মেরে দূর করে দেবো জানিস নি!"

মালতী ধীরে ধীরে বলিল, "আমার বাপ মা কি দোষ কল্লেন, তাঁরা ত' কোন অপরাধ করেন নি।"

হঠাৎ সেন-গৃহিণীর চক্ষু ধক ধক জ্বলিয়া উঠিল; পাগলের চক্ষু যমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, তাহার চক্ষুও ঠিক সেইরূপ আকার ধারণ করিল। সেন গৃহিণী ক্রোধে জ্ঞানহারা। সে কি বলিতেছে, কি করিতেছে,—সে নিজেই জানে না। "কি বল্‌লি হারামজাদী, দেখবি তবে?" এই কথা বলিয়াই সে দুই হস্তে সবলে মালতীর গলা টিপিয়া ধরিল। পাগলিনীর দশটী অঙ্গুলি মালতীর গলায় বজ্রের মত আঁটিয়া বসিল; মালতী প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বিষম বন্ধন ছাড়াইতে তাহার সাধ্য কি? মালতীর চক্ষু কপালে উঠিল, মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইল; সে হাঁপাইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সব ফুরাইল!

নিমেষের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে নরহরি "কি কর্‌লে মা" বলিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল, গৃহিণীও "এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ" করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! নরহরি কিছু পূর্ব্বেই ঘরে ফিরিয়াছিল। পূর্ব্বদিকে হরিমতীর সন্ধান না পাইয়া সে একবার বাটীতে খোঁজ লইয়া পশ্চিমদিকে অনুসন্ধান করিতে যাইবে বলিয়া আসিতেছিল। গৃহদ্বারে সে জননীর উচ্চ কণ্ঠরব শুনিতে পাইল, ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেখানে দাঁড়াইয়া সে সকল কথা শুনিল, একবার ভাবিল, "চলিয়া যাই, গোলযোগে কাজ কি, সরিয়া পড়ি।" আবার কি ভাবিয়া একটু দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়ে ঐ বিষম কাণ্ড ঘটিল। নরহরির প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ে অকস্মাৎ কোথা হইতে নূতন বল আসিল। নরহরি আর সে নরহরি নাই। সে এক লম্ফে অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দাওয়ার উপরে উঠিল।

দাওয়ার উপরে মালতীর প্রাণশূন্য দেহ পড়িয়া আছে। মুকুল না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িয়াছে! মালতীর অঙ্গ মর্ম্মরশীতল, চক্ষু

ভীতিব্যঞ্জক; সেই সদাহাস্যস্ফুরিতাধরার মুখে হাসি ফুরাইয়াছে! সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া নরহরি পাগলের মত হইল। যে জননীকে সে যমের মত ভয় করিত, যে জননীকে সে আরাধ্যা দেবী ভাবিয়া আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, যে জননীর বিপক্ষে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ভাবিয়া সে একদিন ভ্রমেও মালতীকে আদর যত্ন করে নাই, আবার ভালবাসিয়াও সেই প্রগাঢ় ভালবাসা এক দিনও দেখাইতে পারে নাই, এমনকি কখনও একটি মিষ্ট কথাও বলিতে পারে নাই,—সেই জননী সংজ্ঞাহীনা হইয়া পার্শ্বে পতিতা, যে শচীরাণীকে সে কন্যাধিক স্নেহ করিত, সেই শচীরাণী মৃতপ্রায়,—কিন্তু নরহরির কোনও দিকে দৃষ্টি নাই। সে, জগৎ সংসার, জননী, ভগিনী,—সব ভুলিয়াছে; সে সেই মুহূর্ত্তে যেন স্বতন্ত্র জগতে বাস করিতেছে, সে জগতে কেবল সে আর মালতী, আর কেহ নাই। নরহরি মালতীর মুখমণ্ডল বক্ষে ধারণ করিয়া মুখ হইতে কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি অপসারিত করিয়া দিতে লাগিল ও চিৎকার করিয়া ডাকিল, "বড়বৌ, বড়বৌ! মালতী, মালতী! মালা, মালা!"

হায়, কে উত্তর দিবে! পাগল নরহরি তখনও বুঝে নাই যে, তাহার বড় আদরের মালতী সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

রুদ্ধ জলস্রোত একবার সেতুবন্ধন ক্ষুণ্ণ হইলে আর দাঁড়ায় না, তখন তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? নরহরির প্রতিহত প্রণয়-স্রোতের বাঁধ কাটিয়া গিয়াছে, সে এখন জগৎসংসার মালতীময় দেখিতেছে, আর তাহার বাধা বিঘ্ন নাই। হায়, হতভাগ্য! এতদিন সুপ্ত ছিলে, ভালই ছিলে; এখন তোমার এই জাগরণ যে কুম্ভকর্ণের জাগরণ হইল!

একে একে সুপ্ত স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মালতীর সেই

নবকিশলয়লাবণ্যমাখা হাসিহাসি মুখখানি, সেই ধীর স্থির শান্ত মন্থর গমন, সেই সলাজ অথচ সরল দৃষ্টি, সেই মনভুলানো মৃদু মধুর হাসি, সেই লজ্জাবিজড়িত মধুর সম্ভাষণ, সেই নীরব শান্ত গৃহস্থালী, সেই গুরুপরিজনে ভক্তিশ্রদ্ধা, সেই দেবর ননন্দায় অকৃত্রিম স্নেহাদর, সেই নীরব পতিসেবা, সেই অক্লান্ত পর-সেবা, সেই দেবদ্বিজে ধর্ম্মেকর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি, সেই অতিথি ভিক্ষুকে আতুর অন্ধে দয়া মমতা,—একে একে নরহরির স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। শোকোন্মাদিনী জননী যেমন ব্যাধিক্লিষ্ট শিশুকে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া গুণগুণ করিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করে, নরহরি ঠিক তেমনই মালতীকে বুকে চাপিয়া কত আদরের কত সোহাগের কথা বলিয়া তাহাকে ভুলাইতে লাগিল। হায়, নরহরি! রত্ন থাকিতে চিনিতে পার নাই, এখন আদরে ফল কি!

নরহরি কত ডাকিল, কত কাঁদিল, কৈ সাড়া নাই ত'! নরহরি তখন উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মালা, মালা! কোথায় তুমি? আমি তোমায় এত ডাকছি, কেন সাড়া দিচ্ছ না?" সব নীরব; কে উত্তর দিবে? নরহরি কাতরে বলিল, "জগৎসংসারে কেউ কি আমার কথার উত্তর দিবে না?"

অকস্মাৎ গগন-মেদিনী বিদারণ করিয়া আর্ত্তনাদ উঠিল, "বাপ!" নরহরির সংজ্ঞা কতকটা ফিরিয়া আসিল; সে শুনিল, দ্বারদেশে কে চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "মা, শীঘ্র আলো নিয়ে আয়, আমায় বুঝি পোকায় কাটলে।"

কি সর্ব্বনাশ! একি, এ যে ভজহরি! নরহরি আলোকহস্তে দ্রুতপদে বাহিরে আসিল; দেখিল, ভজহরি দ্বারদেশে চালতাতলায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে, তাহার মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতেছে। নরহরিকে দেখিয়াই সে অতি কষ্টে বলিল, "দাদা, প্রাণ যায় দাদা!

কালসাপে কামড়েছে। ঘরে ফিরছিলাম, চালতাতলায় আঁধারে লেজে পা দিয়েছি, পায়ে জড়িয়ে কামড়েছে। ওঃ বাপরে! এই তাগার বাঁধন দিয়েছি। দাদা, মাকে বৌকে শচীকে ডাক। দিদিকে পেয়েছো? ওঃ বাপরে! ওরে মারে! যাই যে।”

বলিতে বলিতে ভজহরির চক্ষু কপালে উঠিল। নরহরি এতক্ষণ তাহার পায় শক্ত করিয়া তাগা বাঁধিতেছিল; দেখিল, আর বাঁধন বৃথা, স্বয়ং কাল আসিয়া দংশিয়াছে, বাঁধনে কি করিবে? দেখিতে দেখিতে ভীষণ যাতনায় ছটফট করিতে করিতে বালক ভজহরির ইহলীলা ফুরাইল।

নরহরি একবার মাত্র কাঁদিয়া বলিল, “ভজা, তুইও ছেড়ে গেলি!” তৎপরে পলকহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। পরে ভ্রাতাকে উঠাইয়া অন্দরে দাওয়ার উপর শয়ন করাইয়া দিল। একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিল; জননী, ভ্রাতা, ভগিনী, পত্নী,—জগতে আপনার বলিতে যাহারা, তাহারা সকলেই সম্মুখে, কিন্তু কোথায় তাহারা? জননী সংজ্ঞাহীনা, ভ্রাতা মৃত, ভগিনীও মৃতপ্রায়, পত্নী মৃতা। আর এক ভ্রাতা সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আর এক ভগিনী নিরুদ্দেশ! নরহরি কেন জগতে আসিয়াছিল? এই দুঃখময়, জ্বালাময়, যন্ত্রণাময়, সংসারে মানুষের সুখ কি?

চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া নরহরি তন্ময় হইয়া গেল; নরহরির বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। সেই সময়ে তাহার জননীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল; সে উঠিয়া একবার চারিদিকে চাহিল; তাহার পর নরহরিকে সম্মুখে দেখিয়া সবেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। সেই শব্দে নরহরির চৈতন্য হইল; সে জননীকে ডাকিল, কিন্তু সাড়া পাইল না। নরহরি আর একবার সকলের দিকে চাহিল, মুহূর্ত্তপরেই ছুটিয়া গৃহের বাহির হইল।

নরহরি কোনদিকে না ফিরিয়া সরাসর দর্পনারায়ণের গৃহের দিকে গেল। যেন কোনও প্রবলশক্তি তাহাকে সেইদিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

দর্পনারায়ণ ও অন্যান্য সকলে নরহরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার গৃহে গেলেন। সেখানকার সেই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। নরহরিকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ফেল ফেল নেত্রে তাঁহাদের পানে তাকাইয়া রহিল। দাদাঠাকুর ভজহরির পদে তাগা বাঁধা দেখিয়া তখনই তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন; হৃদয়, নাসারন্ধ্র ও চক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে, চিকিৎসার আর আবশ্যক নাই। তখন দাদাঠাকুর শচীরাণীকে লইয়া বসিলেন, অপর সকলে সেন-গৃহিণীকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে ঘরের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু সব নীরব, কোন সাড়া শব্দ নাই। দর্পনারায়ণ মহা বিপদে পড়িলেন। বহুক্ষণ নরহরিকে ডাকাডাকির পর নরহরির চৈতন্য হইল; নরহরি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আহা! হতভাগার সে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন যে শুনিল, তাহারই হৃদয় ফাটিয়া গেল।

দর্পনারায়ণ তাহাকে মিষ্ট কথায় বহুকষ্টে শান্ত করিয়া ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত বলিতে অনুরোধ করিলেন। নরহরি তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আজ সোনাদানার হাট হইতে দুই ভায়ে এক প্রহর রাতে ঘরে ফিরি। আসিয়াই শুনিলাম পুঁটীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; সে দিবা দ্বিপ্রহরে পাড়ায় বাহির হইয়াছে, আর ঘরে ফিরে নাই। তখনই দুই ভায়ে ধূলাপায়েই পুঁটীর সন্ধানে রওনা হইলাম। আমি পূর্ব্বদিকে গেলাম, ভজা পশ্চিমে গেল। অনুসন্ধানে ফল ফলিল না, ঘরে ফিরিলাম। দেখিলাম, জননী মূর্চ্ছিতা, পত্নী মৃতা, ভগিনী মৃতপ্রায়। কি ব্যবস্থা করি ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারে

ভজার আর্ত্তনাদ শুনিলাম। ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম; দেখিলাম ভজাকে কালসর্পে দংশন করিয়াছে, মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেও মরিল। এখন আপনারা যাহা হয় করুন, আমি চলিলাম।"

নরহরি প্রস্থানোন্মুখ হইল, দর্পনারায়ণ তাহার হস্তধারণ করিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "পাগল! কোথায় যাইবে, এইখানে বস, এখনও সংসারের অনেক কাজ বাকি।"

নরহরি কাঁদিয়া বলিল, "আমার আর সংসার কি? আমার সংসারের সব কাজ ফুরিয়েছে। আমি একে একে সকলকেই খেয়েছি, আরও থাকলে, যারা আছে তাদেরও খাব।"

এই সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল; আলুথালু উন্মাদিনী বেশে সেন-গৃহিণী বাহিরে আসিল; গ্রামের গুরুজনেরা সম্মুখে, তাহার লজ্জা সরম নাই; তাহার মাথার কাপড় খসিয়াছে, অঙ্গের বসন শিথিল হইয়াছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। সে বাহিরে আসিয়াই স্পষ্টস্বরে বলিল, "ওগো আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমি রাক্ষসী, সব খেয়েছি গো, সব খেয়েছি; সোণার চাঁদ বৌকে খেয়েছি, দুধের বাছা ভজাকে খেয়েছি। ছেলে আমার কিছু বল্‌লে না, আমি সব বলছি। আমার বড় দর্প হয়েছিল, দর্পহারী দর্প চূর্ণ করেছেন!"

সকলে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। পাগলিনী আবার বলিতে লাগিল, "খুকী শুয়েছিল, বৌমা লক্ষ্মী মা আমার—আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল—বৌমা পিদীম চৌকীর উপর রেখেছিল, এখন আমার মনে হচ্ছে আমি সরিয়ে মশারির কাছে রাখি। মশারি ধরে যায়, বিছানায় আগুন লাগে, খুকী পুড়ে মরে। বৌমা ছুটে এসে খুকীকে টেনে বার করে আগুন থেকে বাঁচালে, আগুন নিভালে, আহা বাছা আমার পুড়ে ঝুড়ে খুন হলো গো, আমি পোড়ারমুখী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, আর হিংসেয় জ্বলে পুড়ে

মলুম। বৌমাকে অকারণ গাল দিলুম, তার বাপ মারও অকল্যাণ করলুম, বৌমা আমার মুখটী বুজে সব সহ্য করলে—কখনও মিষ্টি ছাড়া কড়া বলতে জানত না গো—যখন বাপ মাকে বড় গাল দিলুম তখন বাছা আমার কেবল বল্লে—মা, বাপ মার কি দোষ? আমি হতভাগী—আমার ঘাড়ে ভূত চাপল—দস্যির মত আমার ঘর আলো করা বৌমার এমনই করে গলা টিপে দফা শেষ করলুম।"

পাগলিনী সজোরে নিজের গলা চাপিয়া ধরিল, তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, চক্ষু বাহির হইয়া আসিল, শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। দর্পনারায়ণ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাত ছাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, "কর কি, সেনবৌ! তুমি কি পাগল হলে? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। দুর্ঘটনা এমন হয় না কি?"

পাগলিনীর চক্ষে পলক নাই। সে একদৃষ্টে মালতীর মুখপানে তাকাইয়া আছে। হঠাৎ বলিল, "না না, সত্য সত্যই বৌমাকে গলা টিপে মেরেছি, এই যে দেখ না, বাছার গলায় দশ আঙ্গুলের দাগ।"

পাগলিনী ছুটিয়া গিয়া মালতীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিল, মাথার কেশরাশি সরাইতে সরাইতে বলিল, "আহা, বাছাকে আমার একদিনও ভালমুখ দিই নি গো। বাছা আমার ঘুমুচ্ছে। দেখ দেখ, দেখ দেখ, এই যে বাছার মুখ নড়ছে, এই যে বাছা চোখ খুলে হাসছে, এই যে, এই যে নাকের কাছে আঁচল ধরেছি উড়ে যাচ্ছে! ওগো তোমরা দেখ, দেখ, দেখ, দেখ! ও বৌমা, বৌমা, বৌ—মা—"

পাগলিনী ঢলিয়া পড়িল। সকলে সভয়ে তাহাকে ধরিলেন, দেখিলেন, পাগলিনীর হৃদিতন্ত্রী ছিঁড়িয়াছে, পাগলিনীর ক্লান্ত বিধ্বস্ত প্রাণবায়ু উড়িয়া গিয়াছে!

বিপদের উপর বিপদ, নরহরি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাসিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! এ কি, এযে উন্মাদের বিকট হাসি! নরহরি প্রকৃতই

উন্মাদ হইয়াছে; সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও নাচে, কখনও গায়। হা ভগবন! এক দিনে সেনেদের একি সর্ব্বনাশ হইল!

এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া সকলের যেন বুদ্ধিভ্রংশ হইল; কেবল দর্পনারায়ণ এখনও ধীর স্থির; তিনি নরহরিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

মেজকর্ত্তা বিষম ভীত হইয়াছেন; তিনি বলিলেন, "কি করা যায় এখন; আমার ত' বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। তোমরা যা হয় কর।"

ন কর্ত্তা বলিলেন, "আর যাহা হয় হউক, থানাদারের হাঙ্গামা যাতে না হয় তাই কর।"

দর্পনারায়ণ সকলের কথা শুনিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনারা অত ধৈর্য্যহারা হইলে সব পণ্ড হইবে। আসুন, সকলে মিলিয়া যৎকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাউক।"

সকলে স্থির হইয়া বসিলেন। মন্ত্রণা চলিল, সেই ভীষণা রজনী তাঁহাদের চক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

নৌ-বিহার।

কুঠির সাহেব সদলবলে নৌ-বিহারে গিয়াছেন। সাত দিন বিহারেই কাটিবে, তৎপরে ফিরিয়া আসিবেন, এইরূপই কথা। কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে। সাহেব যাত্রা করিলেন। ময়ূরপঙ্ক্ষী অনুকূলপবনে পাইল তুলিয়া নাচিতে নাচিতে দক্ষিণমুখে ছুটিয়া চলিল। নদীর জল চল্ চল্ ছল্ ছল্ করিয়া দুই পার্শ্বে বহিয়া যাইতেছে, নৌকার মুখে জল দ্বিধা ভিন্ন হইয়া পক্ষীর পালকের মত দেখাইতেছে; সেই দলিত মথিত জলরাশির ফেনপুঞ্জ নৌকার দুই পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আর তাড়িত জল তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া বেলাভূমির দিকে ছুটিতেছে, তরঙ্গ কিছু দূরেই মিলাইয়া যাইতেছে। নদীর উপর

কত নৌকা ভাসিতেছে; পূবে কিস্তী বা ভড়, চট্টগ্রামের বেতের চৌকা, দক্ষিণের হলা, সুলুকা, পাউকা, ছোট, স্থানীয় পানসী ডিঙ্গি টাপুরে, আপন আপন কাজে নদীবক্ষে চলিতেছে। ব্যবসায়ী নৌকা গোলপাতা, কাষ্ঠ, ধান্য, গুড়, মাদুর, পাটী, খড়, বিচালা, ডাল, কলাই, লঙ্কা, সর্ষপ, ইত্যাদি বোঝাই লইয়া মন্থর গমনে চলিয়াছে; টাপুরে পানসী আরোহী যাত্রী বুকে ধরিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত যাইতেছে; ডিঙ্গি সুলুক তীরবেগে ছুটিতেছে; জেলেডিঙ্গি একরূপ দাঁড়াইয়াই আছে, তাহাতে জেলেরা মাছ ধরিতেছে।

সাহেবের মকরমুখী ময়ূরপঙ্খীর মাথায় বিটিশ-কেতন সগর্ব্বে পতপতশব্দে উড়িতেছে। সে পতাকার সম্মান সর্ব্বত্র; বঙ্গদেশে বিশেষতঃ সেই সময়ে ব্রিটিশ-প্রতাপের কি সম্মান, তাহা ইতিহাস-বেত্তা মাত্রেই জানেন। সাহেবের নৌকা অগ্রসর হইতেছে, দেশীয় নৌকা সম্মুখে পড়িলেই অমনই সভয়ে ময়ূরপঙ্খীর পথ ছাড়িয়া দিতেছে। সাহেবের নৌকার পশ্চাতে বহুদূরে জল-পুলীশের নৌকা প্রচ্ছন্ন প্রহরাস্বরূপ চলিয়াছে। দক্ষিণে কিছুদুর গিয়াই সাহেবের কি মন হইল, সাহেব উত্তরমুখে নৌকা চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। অল্প শীত পড়িয়াছে, উত্তরের বাতাস ছাড়িয়াছে। সাহেব ভাবিলেন, ফিরিবার মুখে বাতাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইলে বড় বিলম্ব হইবে। তাই এই হুকুম।

জলবিহারের প্রথম দিন বড় আনন্দে কাটিল। কত সুন্দর শান্ত পল্লী জনপদ নদীর উভয় পার্শ্বে দেখা যাইতেছে; বাঙ্গালার শ্যামল পল্লীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মত নয়নারাম পল্লী-শোভা আর কোথা আছে? তখন বঙ্গে সর্ব্বনাশী মেলেরিয়া রাক্ষসী দেখা দেয় নাই। তাই বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য তখনও অক্ষুণ্ণ। ইচ্ছামতীর সর্ব্বত্রেই এখন ঘেরা ঘাট, কেন না ইচ্ছামতীতে কুম্ভীরের বড়ই দৌরাত্ম্য। টাকী-হোসেনা-

বাদের লোণাখাল কাটার পর হইতেই সুন্দরী ইচ্ছামতীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে; প্রথমতঃ নদীর জল লবণাক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ নদীতে কুম্ভীরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কলিকাতার সহিত বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই এই খাল খনিত হইয়াছে; ফলে বাণিজ্যের ও গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু নদীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। তখন নদীর জলই নদীতীরস্থ পল্লীবাসীর প্রাণ ছিল; নদীর জলই তাহাদের পেয়, নদীর জলই তাহাদের অবগাহন-স্নানের প্রধান উপকরণ। সাহেব-বিবিরা নৌকায় বসিয়া দুই দিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। নদীর জলে কত শত লোক স্নান করিতেছে; বালক বালিকারা জলক্রীড়া করিতেছে, এ উহার গায় জল ছিটাইয়া দিতেছে, ও উহাকে জলে ডুবাইয়া দিতেছে, এ তাড়া করিলে সে ডুব-সাঁতার কাটিয়া পলাইতেছে; যুবকেরা দল বাঁধিয়া সাঁতার দিয়া নদী পারাপার হইতেছে, যুবতারা চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া গাত্রমার্জ্জনা করিতেছে ও মুখে জল পুরিয়া কুলি করিতেছে, সূর্য্যকিরণে যুবতী-মুখোৎক্ষিপ্ত জলে কত শত রামধেনুর সৃষ্টি হইতেছে; প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধারা স্নান তর্পণ সমাপনান্তে আহ্নিক করিতেছেন। আঘাটায় গোপাল ও কৃষকেরা গো মহিষাদি স্নান করাইয়া দিতেছে। কোথাও বা নির্জ্জনে বসিয়া কেহ মাছ ধরিতেছে। নদীর তীরে কত স্থানে কত কাঠের কারখানা, চূণের আড়ত, চাউল গুড় তামাক ডালকলাই প্রভৃতির সমৃদ্ধ গঞ্জ, কোথাও বা পুলীশ-থানা।

সাহেব-বিবিরা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছেন। বিলাত হইতে নবাগত সাহেব বিবিদের পক্ষে এ দৃশ্য নূতন; তাঁহারা ভাবিতেছেন, "বেশ দেশ তো! যেমন নিন্দা শুনিয়াছিলাম,—জলে কুম্ভীর, স্থলে বাঘ সাপ মাছি মশা গরম, তাহার তো কিছুই দেখিতেছি না। এ নেটিবেরা তো মানুষ খায়

না, বেশ আমাদেরই মত সুখে স্বচ্ছন্দে স্ত্রী পরিবার লইয়া বাস করে।” সাহেব-বিবিরা বিস্মিত হইতেছেন, মনে অত্যন্ত আনন্দও লাভ করিতেছেন; নদীতীরস্থ বা নৌকাস্থিত বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমানগণও তাঁহাদিগের ময়ূরপঙ্ক্ষী ও তদধিক তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছে।

ময়ূরপঙ্ক্ষী ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে বেলা বাড়িতেছে; সাহেব-বিবিরা ময়ূরপঙ্ক্ষীর গোসল ঘরে স্নানাদি সমাপন করিয়া আহারে বসিলেন। ময়ূরপঙ্ক্ষীর পশ্চাতে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁধা; তাহাতেই রন্ধনাদি হইয়াছে; খানসামা ও বাবুর্চ্চিতে পরামর্শ করিয়া সে দিন নদীর উপরেই জেলেদের কাছে ভেটকী ও পারস্য মৎস্য ক্রয় করিয়াছে। সাহেব-বিবিরা মুখরোচক বলিয়া সেই মাছ অধিক পরিমাণে তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। আহারান্তে একটু বিশ্রাম লইয়া তাঁহারা হুইষ্ট খেলিতে বসিলেন।

অপরাহ্ণে সকলে নৌকার ছাদে বেত্রাসনে উপবেশন করিয়া নদীর দুই তীরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড জলাভূমি দেখিতে পাইলেন। সেই জলার এপার ওপার দেখা যায় না। জলায় যাহা দেখিলেন, তাহাতে সাহেবদিগের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সাহেবেরা সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই বিস্তীর্ণ জলা জলচর পক্ষীতে ভরিয়া গিয়াছে। পারকার সাহেব মাঝিকে জলার নাম জিজ্ঞাসিলেন। মাঝি বলিল, “বিলবল্লী। হুজুর ওখানে ভারি সাপ,—শামুক-ভাঙ্গা কেউটে, মাথা মোটা পাতরাজ; ভয়ে কেউ ঐ জলায় নামে না।”

পাখী দেখিয়া শিকারের আশায় সাহেবদের মন যেমন প্রফুল্ল হইয়াছিল, তেমনই সাপের নাম শুনিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু ইংরাজ বড় শিকার-প্রিয়; সম্মুখে এরূপ শিকারের সুযোগ

পাইয়া সে লোভ সম্বরণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে দুষ্কর। পারকার সাহেব বন্ধুদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মাঝিকে সে রাত্রি সেইস্থানেই নঙ্গর করিয়া কাটাইতে আজ্ঞা দিলেন ; ইচ্ছা,- পরদিন প্রাতে পক্ষী শিকার করিবেন।

রাত্রিটা কিন্তু সাহেবদিগের পক্ষে বড় ভাল কাটিল না ; সেই রাত্রিতে লেডি সেলিনার শরীর অসুস্থ হইল ; তাঁহার উদরাময়ের মতই হইল ; উদরের যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। সাহেবেরা বলিলেন, মৎস্য পরিপাক না হওয়াতে অসুখ হইয়াছে। পারকার সাহেব ঔষধের বাক্স খুলিয়া ঔষধ দিলেন। লেডি সেলিনা কতকটা সুস্থ হইলেন।

রাত্রিটা কাটিল। সাহেবেরা রাত্রিকালেই শিকারের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাতেই সাজ সরঞ্জাম লইয়া শিকারে গেলেন। পারকার সাহেব সাপের ভয় দেখাইয়া বন্ধুদিগকে নিরস্ত করিবার বিস্তর চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা ময়ূরপঙ্খীতে থাকিতে সম্মত হইলেন না। তখন সাহেব আর এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বলিলেন, লেডি সেলিনা অসুস্থ, নৌকায় কাহারও উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। কথা শুনিয়া দুই বন্ধুর মুখ শুকাইয়া গেল ; শিকারের সময় স্ত্রীলোকের ন্যায় নৌকায় বসিয়া থাকিবেন—এ চিন্তা তাঁহাদের অসহ্য হইল। শেষে লেডি লীলা যখন বলিলেন যে, সেলিনার অসুখ সামান্য, তাহার জন্য পুরুষদিগের উপস্থিতির আবশ্যক নাই, তখন সকলে প্রফুল্লমনে বন্দুক লইয়া শিকারে চলিলেন। সঙ্গে একজন এদেশীয় পথ-প্রদর্শক রহিল।

রৌদ্রের তেজ বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সাহেবদিগের দেখা নাই। লেডি সেলিনার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; লেডি লীলা ব্যবস্থামত তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। কিন্তু বিদেশে,

পথের মাঝে এইরূপ পীড়া. তাহাতে আবার সাহেবেরা কেহ নাই, লেডী লীলার ভয় হইল। তাঁহার অভিপ্রায়, কাহাকেও সাহেবদিগের সন্ধানে পাঠাইয়া দেন ; কিন্তু তিনি এদেশের কোনও ভাষায় কথা কহিতে জানেন না, কাজেই কাহাকেই বা কি বলেন। এক প্রহর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সাহেবেরা আসিলেন না। এদিকে লেডি সেলিনা বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। লেডি লীলা বড় অস্থির হইলেন। তখন তিনি মাঝি ও খানসামা প্রভৃতিকে ডাকাইয়া ইসারায় ও ভাবভঙ্গীতে তাহাদিগকে মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা তাঁহার সেই অদ্ভুৎ প্রক্রিয়া দেখিয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না, অনেকে অতি কষ্টে হাস্যসংবরণ করিল। শেষে খানসামা সাহেব কতকটা বুঝিল ; তখন তাহার আজ্ঞায় দুই জন লোক সাহেব-দের সন্ধানে গেল।

সাহেবেরা এদিকে বিলে নামিয়াই পথপ্রদর্শকের নিষেধসত্ত্বেও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের আর আনন্দ ধরে না। তাঁহাদের মনে হইল যেন পাঠশালার জীবন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কেবল কালেক্টর ও পুলীশ সাহেব দৌড়াদৌড়িতে যোগ না দিয়া শিকারের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। পথ না জানা থাকিলে বিলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা বড় নিরাপদ নহে ; কেন না, কোথায় খানাখন্দ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। লর্ড ফ্রেডারিকের একবার প্রাণসংশয়ই হইয়া উঠিয়াছিল ; তিনি দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া বিলের জলে পড়িয়া গেলেন ; এদিকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, ওদিকে পদ জলের লতাপাতায় জড়াইয়া গিয়াছে, হাবুডুবু খাইয়া লর্ড ফ্রেডারিকের প্রাণ যায় আর কি! বহুকষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করা হইল।

ক্রমে তাঁহারা বিলের মধ্যে নামিলেন ; পথে দুই তিনটা সর্প তাঁহাদের পদশব্দে সর সর করিয়া ঝোপের মধ্যে পলাইল ; দুই একটা

জলচর পক্ষী তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া এ জল হইতে ও জলে বসিল। দুই তিনটা বড় বড় ঝোপ ও খানাখন্দ পার হইয়া তাঁহারা এক উন্মুক্ত জলার মাঝে অবতীর্ণ হইলেন।

অকস্মাৎ তাঁহাদের চক্ষুর সমক্ষে এক অভিনব দৃশ্য উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্যরশ্মি প্রখর হইয়াছে; সেই দীপ্ত সূর্য্যরাগে তাঁহারা দেখিলেন, সম্মুখে যতদূর চক্ষু যায়, বিস্তৃত জলাভূমি; তাহার মধ্যে কোথাও কচিৎ দুই এক খণ্ড ভূমি জাগিয়া আছে; কোথাও বা দীর্ঘ তৃণ মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা দুই একটা কেওড়াগাছ সঙ্গীহারা পথিকের মত বিষণ্নবদনে চারিদিকে ফেল ফেল চাহিতেছে; আর সেই বিস্তীর্ণ জলার উপর বালসূর্য্যের কিরণে অসংখ্য জলচর বিহঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে; কেহ জলে ডুব দিতেছে, কেহ পাখা মেলিতেছে, কেহ ডানার জল ঝাড়িতেছে, কেহ সাঁতার দিতেছে, কেহ একস্থান হইতে অন্যত্র উড়িয়া বসিতেছে। সাহেবেরা এত বড় জলাও কখনও দেখেন নাই, একত্রে এত পক্ষীও কখনও দেখেন নাই। তাঁহাদের হর্ষ-বিস্ময়ের আর সীমা নাই এই জলাই তাঁহারা নৌকার উপর হইতে দেখিয়াছিলেন।

শিকার কার্য্য চলিল; অনেক পক্ষী নিহত ও তীরে আনীত হইল; তখনও তাঁহাদের তৃপ্তি হয় নাই। পারকার সাহেব একটা উচ্চ ভূখণ্ডের উপর বসিয়া চুরুট টানিতেছেন, অন্যান্য সাহেবেরা শিকার করিতেছেন, এমন সময় নৌকা হইতে লেডি লীলার দূত আসিল। লেডি লীলা এই মুহূর্ত্তেই ফিরিয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন, এই কথা শুনিয়াই সাহেবদের শিকার করা ঘুরিয়া গেল। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে নদীতীরাভিমুখে চলিলেন। নৌকায় আসিয়া তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের চক্ষুস্থির হইল। লেডি সেলিনার পীড়া বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; তাঁহার বহুবার ভেদ হইয়াছে,

শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পারকার সাহেব তৎক্ষণাৎ নৌকা খুলিয়া কুঠিতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন; শীঘ্র পৌঁছাইয়া দিলে মাঝিদিগকে বক্‌শিস্ দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

মাঝিরা প্রাণপণে বাহিয়া চলিল। বহুপরিশ্রমেও মাঝিরা রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সোলাদানায় পৌঁছিতে পারিল না। এদিকে ঔষধের গুণে লেডি সেলিনা অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। যখন নৌকা সোলাদানায় পৌঁছিল, লেডি সেলিনা তখন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সকলেই বলিলেন, এ অবস্থায় নাড়াচাড়া করিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। কাজেই কুঠির ঘাটে নৌকা না বাঁধিয়া নদীর মধ্যস্থলে নৌকা নঙ্গর করা হইল। সকলে সারাদিনের পর একটু বিশ্রাম লইবার নিমিত্ত শয়ন করিলেন; কেবল পারকার সাহেব ছাদের উপর বসিয়া চুরুট খাইতে লাগিলেন।

সাহেব বেত্রাসনে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন; সেই তুষারধবলিতা জননী জন্মভূমির কথা, জনক-জননী ভ্রাতা-ভগিনী আত্মীয়-স্বজনের কথা, আদরিণী প্রণয়িণীর কথা, আর এই নির্ব্বাসিত জীবনের কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। এই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের কোথায় পরিণাম হইবে? এই অকিঞ্চিৎকর অনাবশ্যক জীবন পরের প্রয়োজনে উৎসর্গ করিতে পারিলেও একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তাহাই বা করি না কেন? সাহেব কত কথা মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ সাহেব এ অবস্থায় ছিলেন জানেন না। হঠাৎ মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনিতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; সাহেব ফিরিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে কালেক্টর সাহেব। তিনি পারকার সাহেবের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "Enjoying the cool moon-light, eh?"

পারকার সাহেব তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

কালেক্টর সাহেব রহস্য করিয়া বলিলেন, "You young folk are always love-sick. A sweet young face and two lovely eyes haunt you ever so!" সাহেব অমনই গুণ গুণ স্বরে গান ধরিলেন,—"Oh, the two lovely blue eyes, Oh! Ha! Ha! Ha!"

পারকার সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "Nonsense! Your lovely eyes be hanged! What devil hath possessed you to create such a terrific row when Lady Selina is down enjoying peace in sleep?"

কালেক্টর সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"Oh ho! what a savage beast I am! I beg a thousand pardons, Parker."

পারকার সাহেব সে কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "Now let us go down, it is getting late."

কালেক্টর সাহেব এই সময়ে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "Hallo! what is that light yonder? Is it your will-o-the-wisp?"

পারকার সাহেব নির্দ্দিষ্ট আলোকের পানে চাহিয়া বলিলেন, "Oh! It is nothing. Some factory people has lighted a lamp."

কালেক্টর সাহেব বলিলেন, "But it is in a out-of-the-way place."

পারকার সাহেব উত্তর দিলেন, "Don't be puzzling your brain over that. Come, let us have a wink of sleep."

সাহেবদ্বয় নামিয়া গেলেন। ময়ূরপঙ্খীতে তিনটী কামরা ও একটী গোসলখানা। একটী কামরায় লেডিরা শয়ন করিয়াছেন; অপর একটী

কালেক্টর সাহেব ও পুলীশ সাহেবের জন্ম নির্দ্দিষ্ট; তৃতীয়টীতে তিন বন্ধু থাকেন। কালেক্টর সাহেব নিজের কামরায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন ও ক্ষণকাল মধ্যেই নিদ্রিত হইলেন। পারকার সাহেব কামরায় গিয়া দেখিলেন, দুই বন্ধু অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সাহেব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। যখন দেখিলেন কোথাও সাড়াশব্দ নাই, তখন নৌকার বাহিরে আসিলেন; সেখানে মাঝিরা পাইল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতে ছিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি পশ্চাতে বাঁধা ডিঙ্গি খানি টানিয়া আনিয়া তাহাতে নামিলেন। ডিঙ্গিতে সাহেবের ভৃত্যেরা ঘুমাইতেছিল। তিনি কেবলমাত্র খানসামাকে জাগাইলেন। সে অত রাত্রে সাহেবকে ডিঙ্গিতে দেখিয়া অবাক। সাহেব অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে বলিয়া তাহাকে বোটে বাহিতে বলিলেন ও নিজে হাল ধরিলেন। ডিঙ্গি তীরবেগে কুঠির দিকে ছুটিল।

কিছু দুর গেলে সাহেব অন্য ভৃত্যগণকে জাগাইলেন ও একটা চর্ম্ম-নির্ম্মিত লণ্ঠন জ্বালাইতে বলিলেন। সাহেব খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহি বাট্টী ডেখা যাটা; ফিস গুডামকা হায়?"

খানসামা। হুজুর।

সাহেব। ওহি গুডাম বহুট রোজ বাণ্ড হায়; কুঠীকা বাঙ্গলা আউর ডফ্‌টরসে বহুট ডুর হায়। হুঁয়া কোন বাটি বাড়্‌হা হায়?

খানসামা। জনাব! এহি তো বড়া তাজ্জব!

নৌকা তীরে লাগিল। সাহেব খানসামাকে ও অপর একটী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বন্দুকহস্তে তীরে অবতীর্ণ হইলেন। চর্ম্মের লণ্ঠনের আলোকে দূরের বস্তু দেখা যায়, কিন্তু দুর হইতে সে আলোক কেহ দেখিতে পায় না। সাহেব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সাহেব শুনিলেন, সেই গুদামঘরের দিক হইতে নারী-কণ্ঠে

একটা পরিত্রাহি চিৎকার উঠিয়াই গগনে বিলীন হইয়া গেল। সাহেব দৌড়িলেন; মৎস্য-গুদামের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, দুইজন লোক তাহার দ্বার আগুলিয়া বসিয়া আছে। গভীর রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়াছেন, সাহেবের তখন ধৈর্য্য নাই। তিনি এক লম্ফে সেই মনুষ্য দুইটীর সম্মুখে পড়িয়া দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টুমারা কে আছে? জানানাকে কুঠা রাখিয়াছে বোলো, নটুবা বণ্ডুকে প্রাণ যাইবে।"

লোকদুটা প্রথমে সাহেবকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু লণ্ঠনের আলোকে সাহেবের মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাহেব ক্ষিপ্রহস্তে একজনকে ধরিয়া ফেলিলেন, খানসামা অপরকে ধরিল। তখন খানসামা পরিচয় দিল, উহারা কুঠিরই লোক।

ঠিক সেই সময়ে গুদাম্-ঘরের ভিতর হইতে আবার নারীকণ্ঠে কাতর ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। সাহেব আর থাকিতে পারিলেন না। লোক দুটাকে ভৃত্যদিগের পাহারায় রাখিয়া দিয়া সজোরে গুদামের দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। বহুকালের অব্যবহৃত দ্বার, আঘাতে নানা শব্দ করিয়া উঠিল। বার বার তিন চারিবার পদাঘাতের পর দ্বারের ভিতরের অর্গল ভাঙ্গিল, দ্বার খুলিয়া গেল। সাহেব ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন।

সতীর সতীত্ব।

যেদিন সেনেদের সর্ব্বনাশ হয়, সেই দিন মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া হরিমতী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল। সেই দিন বিমলিদের বাটী তাহার তাস-খেলার নিমন্ত্রণ ছিল। বিমলি বা বিমলা তারক করের আদরিণী কন্যা; বহুদিন পরে পিত্রালয়ে আসিয়াছে; সুতরাং খেলাধূলা, পানভোজন, গল্পগুজব, আদর আপ্যায়নেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিত। বিমলি সেদিন হরিমতীকে খেলিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, হরিমতী তাহার সমবয়স্কা সই।

কায়স্থ ব্রাহ্মণাদির মত ভাণ্ডারী কায়স্থের ঘরে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালনের কড়াকড়ি নাই। হরিমতী তাই পানটী খাইত, টিপটী কাটিত, পেড়ে সাটীখানি পরিত, হাতে বালা কাণে দুল ধারণ করিত, একাদশীর দিন একবেলা অন্ন বিনা অন্য সবই আহার করিত। আজও আহারাদি সারিয়া হরিমতী দর্পণখানি সম্মুখে রাখিয়া সাজিতে বসিল; ভাল করিয়া মুখখানি মুছিল, ভাল করিয়া কেশ বিন্যাস করিয়া সেই দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি পৃষ্ঠে এলাইয়া দিল, ভাল করিয়া টিপটী কাটিল, ভাল করিয়া পানটী চিবাইয়া অধরটী সুরঞ্জিত করিল, ভাল দেখিয়া একখানি সাটী বাছিয়া পরিল; তাহার পর দর্পণে একবার মুখখানি দেখিল।

হঠাৎ তাহার স্কন্ধের উপর কাহার করস্পর্শ হইল, হরিমতী চমকিয়া উঠিল; ফিরিয়া দেখিল, মালতী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ফিক ফিক হাসিতেছে।

মালতী হাসিয়া বলিল, "এত সাজগোছ কেন ভাই, কাকে মজাতে যাচ্ছ?"

হরিমতী হাসিয়া বলিল, "কেন, যমকে!"

মালতী। বালাই, ওকথা বল্‌তে নাই। ও অলক্ষুণে কথা কেন ভাই ?

হরিমতী। অলক্ষুণে কিসে ভাই ? আমাদের বেঁচে সুখ কি, যমই আমাদের ভাল।

মালতী। ছি ভাই, এ বয়সে ও কামনা কর্‌লে পাপ হয়। তুমি তো কখনও এমন কথা বল না।

হরিমতীর মুখ গম্ভীর হইল। সদানন্দময়ী হরিমতীর আজ হঠাৎ এ ভাবান্তর কেন ? হরিমতী অতি ধীরে অতি গম্ভীরস্বরে বলিল. "বৌ, যে আবাগার স্বামী নাই, তার যম ভিন্ন আর কে আছে ?"

মালতী হরিমতীর গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহে বলিল, "কেন ভাই, তার স্বামীর স্মৃতি আছে। যার তাও নাই, তার ভগবান আছেন! যার কেউ নাই, যে অনাথা, তার সেই দয়াময় হরি আছেন।"

হরিমতী মালতীর বুকে মাথা রাখিয়া বহুক্ষণ মালতীর মুখপানে তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল, "বৌ, তোর কথা যেন সুধামাখা। তুই যদি না থাকতিস, তাহলে কি করতাম ?"

মালতী হাসিয়া বলিল, "কেন, তা হলে খুঁজে পেতে আর একটা বউ ঘরে আনতে ?"

হরিমতী। পোড়া কপাল আর একটা বৌয়ের। বৌ, সত্যি ভাই, আমায় মাঝে মাঝে ভগবানের কথা বুঝাস্। কথকঠাকুরের কথা আমি ভাল বুঝতে পারি না। তোর কথা বড় মিষ্টি লাগে। আমি পোড়ারমুখী রাতদিন হেসে খেলে কাটাই, পরকালের কাজ কিছু করলাম না। আবার কত জন্ম ভুগ্‌তে হবে।

মালতী। কেন, পূববাড়ীতে কথার সময় কথকঠাকুরমহাশয় কেমন বুঝিয়ে দিলেন। সুখে দুঃখে সকল সময়ে তাঁকে ডাকবে।

দুঃখে বা বিপদে পড়ে ডাকলে ভগবান আর থাকতে পারেন না, অমনি ছুটে আসেন। সেই যে রাজপুত্র ধ্রুবর গল্প কেমন বল্লেন! আর দ্রৌপদীর কথা? শুনলে গায় কাঁটা দিয়ে উঠে। দুবার দুবার দুঃখিনী দ্রৌপদী বিপদে পড়ে বিপদভঞ্জন লজ্জানিবারণ বলে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডেকেছিলেন; দয়াল হরি আর থাকতে পারলেন না, ছুটে এসে রক্ষা করলেন।

মালতীর চক্ষুতে জল আসিল। হরিমতীও চক্ষুর জল মুছিল, বলিল, "বৌ, জন্ম জন্ম যেন তোর মত ভাজ পাই।" মালতীও হরিমতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আনন্দগদগদস্বরে বলিল, "আর আমিও যেন জন্ম জন্ম এমনই ননদ পাই।" বাস্তবিক মালতীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, এমন আর কে ছিল?

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিল। পরে হরিমতী বলিল, "যাই ভাই, সই আবার রাগ করবে, সকাল সকাল খেলার নিমন্ত্রণ করে রেখেছে।"

মালতী। "এস ভাই। কিন্তু কি জানি কেন আমার মনে আজ কু গাইছে। কেবল মনে হচ্ছে তোমায় আমায় এই শেষ দেখা।"

হায়, মালতী! কে জানিত তোমার একথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইবে!

হরিমতী। আচ্ছা, ও আবার একটা কথা।

মালতী। না ভাই, আজ কদিন ধরে আমার ডান চোখ নাচছে। মেজঠাকুরপো কেমন আছে ভাই, অনেক দিন খবর পাই নি।

হরিমতী। মেজদা ভাল আছে, দুচার দিন পরে বাড়ী আসবে। এখন আসি ভাই।

হরিমতী এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। আজ বাটী হইতে বাহির হইয়াই তাহার কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। অন্যদিন তো এমন হয় না। আজ যেন সে কেমন অন্যমনস্ক। আজ কয়দিন

হইতে হরিমতীর মনে হয়, পথে বাহির হইলেই কে যেন তাহার অনুসরণ করে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিবার সময় ছায়ার ন্যায় কাহারা যেন তাহার পশ্চাতে আসে। হরিমতী শুনিয়াছিল, লোকের মৃত্যুর পূর্ব্বে যমদূতে এইরূপে মানুষের পাছে পাছে ফিরে। সে ভাবিল, বুঝি বা তাহার মৃত্যু নিকট, তাই যমদূতে তাহার পশ্চাতে ফিরিতেছে। হরিমতী তাই আজ মালতীর নিকট মৃত্যুর কথা পাড়িয়াছিল। হরিমতী কয়েদের বাটী পৌঁছিল। সেখানে পাঁচজন সমবয়স্কার সহিত হাস্য-পরিহাসে খেলায় ধূলায় সকল কথা ভুলিয়া গেল; সে আবার যে হরিমতী সেই হরিমতীই হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে খেলা ভাঙ্গিল; হরিমতী একবার ভট্টাচার্য্যদের বাটী গেল। সেখানে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আবার তাহার সেই ছায়ার ন্যায় অনুসরণকারীদের কথা মনে পড়িল। একাকী একপ্রহর রাত্রিতে কোথাও যাইতে তাহার কখনও ভয় হয় না, কিন্তু আজ সন্ধ্যারাত্রিতে ঘরে ফিরিতে তাহার কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। সে তখন সকলকে ভয়ের কথা বলিল। কাজেই দুইজন তাহাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে আসিল। কাঁক-ফুল-তলার নিকট পৌঁছিয়া মালতী সঙ্গীদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিল; সেখান হইতে তাহাদের ঘরের আলোক দেখা যাইতেছে, একটু উচ্চকণ্ঠে কথা কহিলেই সেখান হইতে বাটীর লোকে শুনিতে পায়। আবার পূর্ব্বের বাটী ও দেওয়ানজী মহাশয়ের বাটী সেই স্থানের পার্শ্বে; কাজেই হরিমতীর সাহস হইল, তাই সে সঙ্গীদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিল।

সঙ্গীরা চলিয়া গিয়াছে, হরিমতী কাঁকফুলতলা ছাড়াইয়া পথের মোড় ফিরিয়াছে, আর দুই চারি পা গেলেই গৃহে পৌঁছায়, এমন সময় অকস্মাৎ খোনা চাপরাসীর টোকো আমতলার অন্ধকার হইতে দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি নির্গত হইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে ক্ষিপ্রহস্তে হরিমতীর মুখ

চাপিয়া ধরিল; হরিমতী একটা কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না। নিমিষের মধ্যে সেই লোক দুটা হরিমতীকে শূন্যে তুলিয়া আম-বাগানের আঁধারে লইয়া গিয়া লুকাইল; নিমিষের মধ্যে হরিমতীর হাত পা মুখ বাঁধা পড়িল; নিমিষের মধ্যে হরিমতীর দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইল ও স্কন্ধে বাহিত হইয়া বাঙ্গোড়ের দিকে নীত হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে হরিমতীকে এক ডিঙ্গীতে উঠান হইল; ডিঙ্গী পূর্ব্বমুখে নক্ষত্রবেগে ছুটিল; সন্ধ্যার আঁধারে অঙ্গ একরূপ লুক্কায়িত করিয়া ডিঙ্গী ক্রমশঃ বাঙ্গোড় বাহিয়া পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। নলকোড়া গ্রাম দণ্ডীরহাটের ঠিক পূর্ব্বে; এই গ্রামের নৌকা-ঘাটা অতিক্রম করিবার পর হরীমতীর মুখের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল।

এতক্ষণ হরিমতীর শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল; মুখের বাঁধন খুলিয়া গেলে পর সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; সে একবার চিৎকার করিতে গেল, কিন্তু কি জানি কেন তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

একজন যমদূতাকৃতি লোক ঠিক তাহার চক্ষুর সমক্ষে একখানি শাণিত ছুরিকা লইয়া বসিয়াছিল; সে অমনি কঠোরস্বরে বলিল, "খবরদার, চেঁচাবি ত' বুকে ছুরি বসিয়ে দেবো। চুপ করে শুয়ে থাক, খবরদার নড়িস নি।"

ইচ্ছা থাকিলেও হরিমতীর নড়িবার সাধ্য ছিল না, কেননা তাহার হাত পা বাঁধা। হরিমতীর ইচ্ছা হইল, আর একবার চেঁচাইবার চেষ্টা করে; তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, সে প্রাণের মমতা করে না; কিন্তু মনে ভাবিল, "বৃথা চেষ্টা; দেখিনা শেষ কি হয়, প্রাণ থাকিতে আমার অঙ্গ স্পর্শ করে কাহার সাধ্য?"

প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসিল, "আমায় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন? আমি তো তোমাদের কোনও অনিষ্ট করি নাই।"

পার্শ্বের লোকটা হাসিয়া বলিল, "তুই আর কি অনিষ্ট করিবি আমাদের? তবে আজ কয় দিন আমাদের হয়রাণ করেছিস বটে। ওঃ! কদিন ওৎ পেতে বসে বসে তবে আজ তোকে ধরেছি। নে, এখন চুপ করে পড়ে থাক; আমরা তামাক খাই। খবরদার চেঁচাস নি যেন, তাহলেই মরবি।"

হরিমতী কেবল জিজ্ঞাসিল, "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

লোকটা মহা গরম হইয়া বলিল, "চোপ চোপ, ফের কথা!" হরিমতী চুপ করিল।

ডিঙ্গী বাঙ্গোড় ছাড়াইয়া ইছামতীতে পড়িল। হরিমতী কিছুই জানিল না; কোথায় যাইতেছে, কোন মুখে যাইতেছে, হরিমতী কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। ডিঙ্গী ইছামতীতে পড়িয়া দক্ষিণ মুখে চলিল।

কিছুক্ষণ পরে ডিঙ্গী তীরে লাগিল। ডিঙ্গীর লোকেরা আবার হরিমতীর চোখ মুখ বাঁধিয়া ফেলিল; হরিমতী আবার শূন্যে বাহিত হইয়া চলিল। এইরূপে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য-অবস্থায় হরিমতী গন্তব্যস্থানে নীত হইল। তাহার বাঁধনগুলি উন্মোচিত হইল, সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হরিমতী চক্ষু মেলিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সেই-স্থানে একটী মোমবাতি জ্বলিতেছিল; তাহারই আলোকে হরিমতী দেখিল, সে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আনীত হইয়াছে; যে কক্ষে তাহাকে আনা হইয়াছে, সেটী ইষ্টক নির্ম্মিত, অতি উচ্চ ও প্রশস্ত; তাহার একটীমাত্র প্রবেশদ্বার, আর অতি উচ্চে প্রায় ছাদের কাছা-কাছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী আওয়াজি গবাক্ষ। বহুকাল অব্যবহৃত অবস্থায় কক্ষটী পড়িয়াছিল এইরূপই অনুমান হয়; তাহার আবর্জ্জনা-রাশি যে সম্প্রতি পরিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। ঘরের

মেঝের উপর একখানা তক্তপোষ পাতা হইয়াছে, তাহার উপর সামান্য শয্যা। ঘরের কোণে কলসীতে জল; আর এক কোণে কাষ্ঠাধারের উপর সেজে বাতি জ্বলিতেছে, আসবাব-পত্রের মধ্যে এই।

পূর্ব্বকথিত লোকটী হরিমতীকে বলিল, "কি দেখ্‌ছিস্, এখানে যমেও তোর খোঁজ পাবে না। চুপ করে শুয়ে থাক্। তৃষ্ণা পেয়ে থাকে, ঐ কলসী হতে জল গড়িয়ে খাস্। চেঁচামেচি করিস্ না, প্রাণ বার্ করে চেঁচালেও আধ ক্রোশের মধ্যে কেউ শুন্‌তে পাবে না। আমরা বাহিরে রহিলাম, চেঁচালেই ঘরে ঢুকে গলায় ছুরি বসিয়ে দেবো।"

লোকগুলা চলিয়া গেল। হরিমতী উঠিয়া বসিল, শুনিল বাহির হইতে দ্বারে শিকল পড়িল। অমনই সে ছুটিয়া গিয়া ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ করিতে গেল। হায়! বিধি বাম। দ্বারে অর্গল দিবার ব্যবস্থা সবই আছে, কিন্তু অর্গলটী নাই! তখন সে তক্তপোষখানা টানিয়া আনিয়া দ্বার চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। বৃথা চেষ্টা! সাধ্য কি অবলা রমণীর! সেই বিপুলকায় তক্তপোষ প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও হরিমতী একপদও নাড়াইতে পারিল না। তখন ভগ্নমনোরথ হইয়া অভাগিনী চারিদিকে পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু হায়! আগমনিগমের একটীমাত্র পথ, তাহাও আবার বাহির হইতে বন্ধ। তখন পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় সেই নিরুপায়া বালিকা কক্ষের চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহার মনে হইল, সে কক্ষপ্রাচীর ভেদ করিয়া চলিয়া যায়; সে অমনি পাগলিনীর ন্যায় প্রাচীর ভেদ করিতে ছুটিল; প্রাচীরে বিষম বাধা পাইয়া পড়িয়া গেল। আবার উঠিয়া চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। যখন দেখিল, আর কোনও উপায় নাই, তখন সে কক্ষতলে মাথা কুটিতে লাগিল; কাঁদিয়া বলিল, "হায়,

হায়, কি করবো! কেমন করে পলাব! আমি তো কারও কিছু করিনি। ভগবান! রক্ষা কর।”

বুঝি ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন; ঝন্ ঝন্ শব্দে কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল, একজন মনুষ্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। হরিমতী তখন মাথা কুটিতেছিল। দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দে সে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল। আগন্তুক তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারবদ্ধ করিতেছিল; যেমন সে মুখ ফিরাইল, অমনই হরিমতী আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, “দেওয়ান কাকা, দেওয়ান কাকা, তুমি কেমন করে খবর পেলে? এই দেখ আমায় ধরে এনেছে, আমায় বাড়ী নিয়ে চল”,—বলিতে বলিতে হরিমতী ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল। অতিরিক্ত ভয়, উৎকণ্ঠা ও মনঃকষ্টের পরে অতিরিক্ত আনন্দ হরিমতীর সহ্য হইল না; সে বিগতচেতনা হইয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইল।

দেওয়ানজী মহাশয় হরিমতীর সেই অসাড় নিস্পন্দ দেহ ভূমি হইতে সযত্নে উঠাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে গেলেন; কিন্তু একপদ অগ্রসর হইয়া আর তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে তাঁহার সাহস হইল না; তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিতে হইবে না যে ইনিই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দেওয়ান কালিচরণ দত্ত। দেওয়ান বর্ত্তিকার আলোকে হরিমতীর মুখের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটিল না; পাপিষ্ঠের পাপলালসা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তিনি কামান্ধ কুক্কুরের মত নির্লজ্জ হইয়া সংজ্ঞাহীনা বিস্রস্তবসনা কন্যাসমা যুবতী বিধবার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। হিংস্র-পশুভয়ভীতা কুরঙ্গীর মত এই আশ্রয়হীনা অসহায়া নিপীড়িতা বালিকা তাঁহাকে বড় আনন্দে পিতৃ সম্বোধন করিয়া আশ্রয় চাহিয়াছে; আর তিনি? বজ্র কি নাই!

হরিমতীর চেতনা হইল ; হতভাগিনী চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র প্রথমেই দেওয়ানজীর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল ; দেওয়ানজীর মুখ চক্ষুর ভাব দেখিয়া তাহার অত্যন্ত ভয় হইল ; তাঁহার লোলুপ দৃষ্টিপাতে লজ্জায় তাহার মুখচক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিল ; সে ত্রস্তে বক্ষের বসন সংযত করিয়া উঠিয়া বসিল।

এতক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল, বড় আনন্দে ছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন কোথায় কোন দূর দূরান্তরে অনন্ত নীল আকাশের পরপারে গন্ধর্ব্বাপ্সরসেবিত মলয়-সুবাসিত সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত সুরবিহঙ্গকুজিত সুরম্য কুঞ্জবনে উপনীত ; সেথায় কোলাহল নাই, কলহ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, চিন্তা নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, বিষাদ নাই, স্বার্থপরতা নাই, কপটতা নাই, লোভ নাই, ভোগস্পৃহা নাই,—আছে কেবল অনাবিল প্রীতি, অবিচ্ছিন্ন শান্তি! সেখানকার সূর্য্যালোক প্রখরোজ্জ্বল, কিন্তু তাহাতে দাহিকা-শক্তি নাই ; সেখানকার মলয়মারুতে শৈত্য আছে, কিন্তু তাহাতে পৌষের দারুণ দংশন নাই ; সেখানকার সুরভিত সুমনসের নাশ নাই, সদা সুবাসে দশদিশা আমোদিতা ; সেখানকার কলকণ্ঠ বিহগের কাকলি গন্ধর্ব্বকিন্নরসঙ্গীতের সুরে সুর মিলাইয়া ঝর ঝর ধারে ঝরিতেছে, সে সঙ্গীতের স্বর্গীয় মাধুরী অক্ষুন্ন। সেই মোহন কুঞ্জবনে গন্ধর্ব্বাঙ্গনাবেষ্টিত হইয়া বসিয়া সহাস্যাননে কে তাহার দিকে প্রীতিপূর্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন? এ যে বড় পরিচিত, বড় আপনার। কে ইনি? ইনিই না, ইনিই না? হাঁ হাঁ, ইনিই ত বটে। তখন হরিমতী যেন কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "কৈ স্বামী, কৈ প্রভু! এত নিকটে তুমি, তবু এত দূরে কেন? স্ত্রীজাতির জাগ্রত দেবতা, সহায়, সম্পত্তি, আশ্রয়, ইহকাল পরকাল, কৈ তুমি! সম্পদে বিপদে, ভয়ে লজ্জায়, অপমানে অভিমানে অবলম্বন, কৈ তুমি স্বামী? এই

দেখ, বড় বিপদে পড়েছি। এত নিকটে রয়েছো তুমি, রক্ষা কর রক্ষা কর, প্রভু!" তাহার স্বামী সেই দিব্য পুরুষ যেন বলিলেন, "ভয় কি? এই যে আমি। যেখানেই থাকি, যত দূরেই থাকি, আমাদের মিলন যে অবিচ্ছেদ্য।" হরিমতী যেন আবার বলিল "প্রভু বড় ভয় পাইয়াছি। রক্ষা কর, চরণে আশ্রয় দাও।" অমনই যেন দিব্যমাল্যভূষিত চন্দনচর্চ্চিত অনিন্দ্যসুন্দর স্বামী সহাস্যে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আরও উচ্চে দেখাইয়া বলিলেন, "ভয় কি? ঐ দেখ, সতীর লজ্জানিবারণ সতীকে কেমন রক্ষা করিতেছেন। সতি! সতীনাথ বিপদভঞ্জন লজ্জানিবারণকে ডাক; ভয় দূরে পলাইবে।" ভীতা বালিকা নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে তাকাইল; যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার রোমাঞ্চ হইল। দেখিল, অনতিদূরে অপূর্ব্ব রাজসভা, সে সভার শোভায় চক্ষু ঝলসিয়া যায়; সেই সভায় অসংখ্য উজ্জ্বল পুরুষ উপবিষ্ট; সভার মধ্যস্থলে অলৌকিক রূপের ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্‌ভাসিত করিয়া এক অনবদ্যাঙ্গী সুন্দরী যুবতী ঊর্দ্ধমুখে যোড়হস্তে দণ্ডায়মানা; তাহার চক্ষে দরদর অশ্রুধারা। দেবকুমারের ন্যায় অতুল রূপবান রাজবেশধারী এক যুবক কুটিল ব্যঙ্গের হাসি হাসিতে হাসিতে তাহার হস্ত ধরিয়া আছে ও সেই সভামধ্যে নির্লজ্জ কাপুরুষের ন্যায় সেই নিরাশ্রয়া দীনা যুবতীর বসন উন্মোচন করিতেছে। সভায় রাজবেশধারী বহু উজ্জ্বল পুরুষ যুবতীর অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছে, কয়েকজন হেটমুণ্ডে বসিয়া আছে। আহা যুবতীর কি কেহ নাই? যুবতী কাতরে কাঁদিয়া বলিতেছে, "কোথায় প্রভু অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপদভঞ্জন দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ শ্রীমধুসূদন, কোথা তুমি প্রাণসখা! দেখ, দেখ, সভার মাঝে দুঃশাসন তোমার সখীকে বুঝি বিবসনা করে! এসো, এসো, কাঙ্গালের ঠাকুর, দীনবন্ধু, এসো প্রাণবল্লভ হরি! তোমার আশ্রিতা সেবিকা দাসীকে রক্ষা কর" ও কি! কোথা হইতে বিদ্যুৎ চমকিল! না না,

এ যে রূপের প্রভা! ঐ যে চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর বনমালী হরি বসনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! ঐ যে শিরে মোহন চূড়া, ঐ যে কটিতটে পীতধড়া, ঐ যে অধরে মোহন মুরলী, ঐ যে অলকা-তিলকাশোভিত মধুর মুখমণ্ডল, ঐ যে মধুর হাসি, ঐ যে গলে বনমালা, ঐ যে মধুর নুপুরসিঞ্জন! আহা হা, কি রূপ! এ রূপের কাছে যে ভয় লজ্জা দূরে যায়! বিপদভঞ্জন মধুসূদন দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করিতে আসিয়াছেন, মধুর স্বরে বলিতেছেন, "সখি! ভয় কি, এই যে আমি এসেছি। সতীর লজ্জা হরণ করে কাহার সাধ্য?"

হরিমতীর হৃদয় ভক্তিরসে ও আনন্দে ভরিয়া গেল; এ সুখের দৃশ্য,—এ আনন্দ অধিকক্ষণ থাকিবে না, এই ভয়ে যেন হরিমতী চক্ষু মুদিল। যখন চাহিল,—হায়, হায়! হরিমতীর সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হরিমতীর মোহ কাটিয়াছে। হরিমতী চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তখনও তাহার স্বপ্নের ঘোর রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাহার লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তখন সে কামান্ধ দেওয়ানের চক্ষুর ভাব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; ত্রস্তে অঙ্গের বসন সংযত করিয়া উঠিয়া বসিল; ক্ষণপরে দেওয়ানজীর দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কই, দেওয়ান কাকা, চল আমায় ঘরে রেখে আস্‌বে চল। কত রাত হয়ে গেল; মা, দাদা, বৌ সকলে কত ভাব্‌ছে। চল না, কাকা।"

দেওয়ানজী তখন প্রাণ ভরিয়া তাহার রূপসুধা পান করিতে-ছিলেন; ভাবিতেছিলেন, "ঘরের দুয়ারে এমন রূপের খনি থাকিতে আমি হিল্লী দিল্লী রূপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম! আমি কি অন্ধ? এতদিন দীনুর মেয়ের পাছে পাছে না ছুটে যদি এই রূপ উপভোগের চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে কাজ গুছাইতে পারিতাম। ওঃ তারা

কি অদ্ভুৎ রমণী! কত দেখেছি, কত ভোগ করেছি, এমনটী আর দেখিলাম না। আমায় নাকে দড়ী দিয়া ভালুকের মত খেলাইয়াছে!"

হরিমতী আবার কাতরে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "দেওয়ান কাকা, কথা কচ্ছ না যে! চল না আমায় নিয়ে।" এই বলিয়া হরিমতী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দেওয়ানজী অমনই দ্বার আগুলিয়া বলিলেন, "এঁ্যা, হাঁ, না; এই, এই যে যাই। আচ্ছা, পুঁটী, তুই কি করে এখানে এলি বল দেখি?"

হরিমতী অত্যন্ত অধীর হইয়া বলিল, "কাকা, আগে আমায় এখান থেকে নিয়ে চল। বাড়ী গিয়ে সব কথা বল্‌বো।"

দেওয়ান। আরে পাগলী! যাবই তো। এখন একটু চুপ করে থাকতে হবে, বাইরে লোক পাহারায় রয়েছে। তারা একটু অন্যমনস্ক হলেই তোকে নিয়ে পালাবো।

হরিমতী। কাকা, তারা পাহারায় রয়েছে, তুমি এলে কি করে?

দেওয়ান। এই দেখ, সাধে কি লোকে তোকে পাগলী বলে। বস্ দেখি এখন ঐ বিছানার উপর। আমি একবার বাইরে চারিদিক দেখে আসি।

হরিমতী। না কাকা, আমার বড় ভয় কর্‌ছে। তুমি আমায় ফেলে যেও না। তোমার দুটী পায়ে পড়ি।

হরিমতী এই কথা বলিয়া দুই হাতে দেওয়ানজীর হাত চাপিয়া ধরিল। দেওয়ানজীর সর্ব্ব শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তাঁহার মুখ চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি তখন বনের পশুর মত কামোন্মত্ত। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি হরিমতীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে গেলেন।

অঙ্গস্পর্শ হইবামাত্র হরিমতী লম্ফ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সতীর

চক্ষু ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এখনই আমার পথ ছেড়ে দেও, আমি চলে যাই। তোমার এই কাজ!"

দেওয়ানজী কেবল একটু ফিক্ ফিক্ হাসিয়া বলিলেন, "ছেড়ে দিবার জন্যই কি তোমায় এখানে এত কাণ্ড করে এনেছি? এত পয়সা খরচ করেছি?"

হরিমতী দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরাইল; গম্ভীরস্বরে বলিল, "ছিঃ, তুমি না বাপের সমান!"

দেওয়ানজী মনুষ্যত্ববিহীন না হইলে সে ধিক্কারে মরমে মরিয়া গিয়া বলিতেন,—"মা বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি।" কিন্তু তিনি যে পশুরও অধম!

হরিমতীর কথায় দেওয়ানজী হাসিয়া বলিলেন, "বাপের সমান! কিসের বাপ? তোমায় আমায় কিসের সম্বন্ধ? দেখ হরি, তোমায় দেখে আমি পাগল হয়েছি, আমায় দয়া না করলে আমি আত্মঘাতী হব।"

হরিমতী সে কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া সবেগে ছুটিয়া দ্বার খুলিতে গেল; দেওয়ান তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দ্বারে অর্গল বদ্ধ করিয়া দিলেন। অর্গল তাঁহার নিকটেই ছিল। হরিমতী তখন চিৎকার করিয়া বলিল, "ওগো, কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর।" সে হাত ছাড়াইয়া কক্ষের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

দেওয়ানজী হাসিয়া বলিলেন, "এখানে মাথা কুটিয়া মরিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না। বাহিরে যাহারা পাহারা দিতেছে, তাহারা আমারই লোক। দেখ হরি, আমায় ভজ, আমি তোমার রূপে পাগল হয়েছি; যেদিন ভজহরিকে রাত্রিতে ঔষধ দিতে গিয়াছিলাম, সেই দিনই মজেছি। আমায় দয়া কর।"

হরিমতী দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠিল। দেওয়ানজী তখন তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "চেঁচাইতেছ কেন? বলিলাম তো উহাতে ফল নাই। হরি, সাধে কি তোমায় দেখিয়া মজিয়াছি? তুমি যখন পানটী খেয়ে, ঠোঁট দুখানি টুকটুকে করে, কপালে টিপটী কেটে, পথ দিয়ে চলে যেতে যেতে আশে পাশে দেখতে, আর ফিক্ ফিক্ করে মন-মজান হাসি হাসতে, তখন আমি তো কোন ছার, মুনি ঋষিরও মন টলে যেত। হরি, এমনই করে মজিয়ে এখন রাগ দেখাচ্ছ কেন? না, নারীজাতির রীতিই এই। তোমাদের মুখে রাগ, অন্তরে অনুরাগ। আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এস, এস, আমার হৃদয়ে এস।" পাপিষ্ঠ পশু হরিমতীকে আলিঙ্গন করিতে বাহুপ্রসারণ করিয়া ছুটিল।

হরিমতী তখন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার হৃদয়ে তখন কি এক অভিনব অব্যক্ত বল আসিয়াছে। সে ক্ষিপ্রহস্তে আলোকের সেজ ভূমিতে নামাইয়া কাষ্ঠাসনটী উঠাইয়া লইল ও সেইটী সম্মুখে ঘুরাইয়া বলিল, "সাবধান, আমার দিকে এলে এই চৌকি মাথায় ছুড়ে মারবো।"

কাপুরুষ প্রাণভয়ে দশ হস্ত পিছাইয়া গেল; ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "হরি! তোমার এই যৌবন, এই রূপ, কি বৃথায় যাইবে? কেন দুঃখে কষ্টে কাল কাটাইতেছ? যদি সুখ ভোগ করতেই না পেলে, তবে এ রূপ যৌবন কিসের জন্য? তুমি যা বল আমি তাই করবো, তোমায় রাজরাণীর মত রাখবো; লোকলজ্জার ভয়ে দেশান্তরে যেতে বল, আমি সব ছেড়ে তোমায় নিয়ে সেই খানেই যাব। দেখ, আমার অগাধ টাকা; অলঙ্কার, বস্ত্র, দাস, দাসী, যা চাও তাই দেবো। আমায় দয়া কর।"

দেওয়ান আবার অগ্রসর হইলেন, হরিমতী আবার তাঁহার মস্তক

লক্ষ্য করিয়া চৌকি উঠাইল; দেওয়ান আবার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন। শেষে বলিলেন, "আচ্ছা থাক, আমি এখন যাইতেছি। তোমার জন্য ফল মূল ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেছি, আহার করিয়া শয়ন করিও; তাহার পর বেশ করিয়া আমার কথাটা চিন্তা করিও। দেখ, সহজে স্বেচ্ছায় যদি সম্মত হও, তাহা হইলে রাজরাণীর মত থাকিবে; না হইলে বলপূর্ব্বক তোমায় অঙ্কশায়িনী করিব, পরে আকাঙ্ক্ষা মিটিলে ভিখারিণীর বেশে রাজপথে তাড়াইয়া দিব। যাহা ভাল বিবেচনা হয় স্থির করিও।"

পাষণ্ড অর্গলটা লইয়া চলিয়া গেল; বাহিরে দ্বারে শিকল পড়িল। অভাগিনী বালিকা অকুল চিন্তাসাগরে ভাসিল। আজ প্রাণ যাইবে নিশ্চিত, প্রাণ থাকিতে সতীর অঙ্গস্পর্শ করে কাহার সাধ্য? সংসারের সকলের কথা মনে পড়িতে লাগিল; জননী, ভগিনী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, ননন্দা,—একে একে সকলকে মনে পড়িতে লাগিল। জীবনের এই শেষ দিনে সর্ব্বাপেক্ষা সেই সুখে সুখিনী দুঃখে দুঃখিনী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা স্নেহশালিনী ভ্রাতৃজায়ার মুখখানি পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। হায়! কোথায় তাহারা? জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আজ সে দাঁড়াইয়া,—অথচ আপনার বলিতে যাহারা, আজ তাহারা কোথায়! আর, আর—তিনি, সেই যে চন্দনচর্চ্চিত গন্ধর্ব্বাম্বরবেষ্টিত দিব্য পুরুষ,—সেই যে তাহার জীবনের প্রথম প্রভাতে অরুণ কিরণের মত একবার হাসিয়া নিভিয়া গিয়াছেন,—সেই তিনি আজ কোথায়! কোথায়, কোন্ দূর দেশে, কোন অজানা অচেনা অপরিচিত স্থানে? ঐ যে উপরে ক্ষুদ্র গবাক্ষের মধ্য দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে, ঐ যে আকাশের উপর ছোট ছোট সাদা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, ঐ যে আকাশে অগণিত তারা মিটি মিটি জ্বলিতেছে,—ঐ অসীম অনন্ত নীল আকাশের পর পারে কি?

ঝন ঝন শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল ; হরিমতীর চমক ভাঙ্গিল, সে চাহিয়া দেখিল, এক জন লোক এক পাত্রে করিয়া ফল মূলাদি আহার্য্য রাখিয়া গেল। সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই হরিমতী দ্রুতপদে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহার পদতলে পড়িয়া কাতরে কৃপাভিক্ষা করিল ; সে কোনও উত্তর না দিয়া কক্ষত্যাগ করিল। হরিমতীও তাহার অনুসরণ করিতে গেল ; কিন্তু চেষ্টা বিফল ; সশব্দে বাহির হইতে কপাট বন্ধ হইয়া গেল।

আবার হরিমতী একাকিনী কেবল দুশ্চিন্তা তাহার সহচরী ! সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সে আপনাকেই ধিক্কার দিল। কেন সে ছার রূপের যত্ন করিয়াছে ? কেন সে হাসিয়া খেলিয়া কাল অতিপাত করিয়াছে ? কেন সে আপনার সরল মনটীর মাপে এই পাপ প্রলোভনময় হিংস্র জগৎকে বুঝিয়াছে ? কেন সে ধর্ম্মে কর্ম্মে, স্বামীধ্যানে ও ঈশ্বর-চিন্তায় মনোযোগ করে নাই ? হায় ! আপনার পাপে আজ তাহার এই বিপদ !

আজ হরিমতীর ইহকাল পরকাল যাইতে বসিয়াছে। স্ত্রীজাতির যাহা সর্ব্বস্ব, আজ দুর্দ্দান্ত দস্যুতে তাহাই তাহার নিকট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে। প্রাণত্যাগ ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। কিন্তু প্রাণ-ত্যাগেরই বা উপায় কি ? নিকটে অস্ত্র নাই, গলে রজ্জু বা বস্ত্র দিয়া প্রাণত্যাগেরও সম্ভাবনা নাই, ছাদ ও গবাক্ষ অতি উচ্চে। আছে, এক উপায় আছে ? ঐ যে সেজের ভিতরে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা ! হিন্দু-রমণীর মরিবার আর ভাবনা কি ? যে হিন্দুরমণী হাসিতে হাসিতে পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, তাহার পরিধানে বস্ত্র ও নিকটে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা থাকিতে মরণের ভাবনা কি ? হরিমতীর মুখ প্রফুল্ল হইল।

হরিমতী আর একবার কক্ষের চারিদিক দেখিয়া লইল। হায়, বৃথা

আশা! ঊর্দ্ধের গবাক্ষ ব্যতীত সর্ব্বত্র মক্ষিকারও আগম-নিগমের পথ রুদ্ধ। আর কালবিলম্ব করিলে পাপ নারকী আবার আসিয়া অঙ্গস্পর্শ করিবে। হরিমতী দ্রুতপদে আলোকের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া সে আলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, তৎপরে একটী অঙ্গুলী আলোকের নিকটে লইয়া গেল। উঃ কি বিষম উত্তাপ! হরিমতী অঙ্গুলী সরাইয়া লইল। আবার অগ্রসর হইল, আবার পিছাইল। না, হরিমতীর আগুনে পুড়িয়া মরা বুঝি হইল না। সে বর্ত্তিকা রাখিয়া দিল; ভাবিল. "ছিঃ ছিঃ, ইহকাল পরকাল যাইতে বসিয়াছে, এখনও আগুনে ভয়! কি করিতেছি!"

হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িল। হরিমতী অঞ্চলটী গলায় জড়াইয়া পাক দিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহার মুখচক্ষু লাল হইয়া উঠিল, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল; ক্রমে তাহার জ্ঞানলোপ হইতে লাগিল।

এই সময়ে দ্বার খুলিয়া গেল; দেওয়ানজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন; চাহিয়া দেখিলেন, হরিমতী প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় ভূমে ঢলিয়া পড়িতেছে। দেওয়ানজী ছুটিয়া গিয়া হরিমতীকে ধরিয়া ফেলিলেন ও সেই স্থানেই তাহাকে শয়ন করাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে গলার বাঁধন খুলিয়া দিলেন; কলসা হইতে জল লইয়া তাহার মুখে চক্ষে দিতে লাগিলেন। কিছু পরে হরিমতীর চেতনা হইল। দেওয়ানজীর মুখে সুরার তীব্র গন্ধ নির্গত হইতেছিল। তিনি একরূপ হরিমতীকে অঙ্কেই ধারণ করিয়া ছিলেন। চেতনা প্রাপ্ত হইয়াই হরিমতী তীরবেগে উঠিয়া বসিল ও দশহস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

দেওয়ানজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণ নষ্ট করিতেছিলে? পাগল আর কি? এই বয়সে মরতে ইচ্ছা হয়? আমি না আসিলে কি

হইত? হরি, আমিই তোমার প্রাণ রক্ষা করেছি, আমার প্রতি মুখ তুলে চাও। চাইবে না? আচ্ছা, একটা কথাই কও।"

দেওয়ানজী অল্পে অল্পে হরিমতীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হরিমতীও এক পা এক পা করিয়া আলোকের দিকে পিছাইতে লাগিল। দেওয়ানজী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এবার আর চৌকিতে সানাইতেছে না, আমিও প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। দুষ্টামি কর যদি, তাহা হইলে লোক ডাকিয়া আনিব; আর তাহার পর—বুঝিতেছ?

হরিমতী সেজের মুখে অঞ্চল প্রান্তটী ধরিয়া বলিল, "যদি আর অগ্রসর হও, তাহা হইলে এই কাপুড়ে আগুন ধরাইয়া পুড়িয়া মরিব।"

দেওয়ানজীর বড় ভয় হইল; তিনি দেখিলেন, সত্য সত্যই হরিমতী বসনে অগ্নিসংযোগ করিতে যাইতেছে এই অশিক্ষিতা সামান্যা হিন্দু বালিকার এ কি ভয়ঙ্কর হৃদয়ের বল! দেওয়ানজী স্তম্ভিত হইলেন, কাতরে বলিলেন, "দোহাই হরি, দোহাই তোমার, আর আমি তোমায় কিছুই বলিব না। তোমায় আমি গৃহে পৌঁছাইয়া দিব। দোহাই তোমার, আগুনের কাছ থেকে সরে এস।"

হরিমতী বলিল, "মরা বাঁচা তোমার হাতে। তুমি দ্বারের অর্গল রাখিয়া ঘর হইতে বাহিরে যাও; আমি মরিব না। না গেলে এখনই পুড়িয়া মরিব।"

দেওয়ানজী কেবল অবসর খুঁজিতেছিলেন; উদ্দেশ্য, কথার ছলে তাহাকে নিরস্ত রাখা। তিনি বলিলেন, "ছিঃ, হরি! সাধে কি বলে ছেলে মানুষ! যখন বলেছি, তখন নিশ্চয়ই ছেড়ে দিব। এস, আগুনের কাছ থেকে সরে এস। আমি তোমায় নিয়ে যাবার যোগাড় করি গিয়ে।"

দেওয়ানজী যেন ঘরের অর্গল উন্মোচন করিয়া বাহিরে যাইবেন, এইরূপই ভাণ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। হরিমতী একটু অন্যমনস্ক হইয়া বস্ত্রাঞ্চল নামাইল। অমনই দেওয়ানজী বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া হরিমতীকে ধরিয়া ফেলিয়া ঘরের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিলেন। হরিমতী অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া প্রথমে কেমন জড় ভরতের মত হইয়া গেল; কিন্তু পরে সে প্রাণপণে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সাধ্য কি তাহার দেওয়ানজীর সেই বজ্রমুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইয়া লয়! তখন সে পরিত্রাহি চিৎকার করিয়া উঠিল। দেওয়ানজী সবলে হরিমতীকে ধরিয়া শয্যার উপর ফেলিয়া দিলেন ও সক্রোধে বলিলেন, "তুই যেমন বুনো ওল, আমি তেমনই বাঘা তেঁতুল। ভাল মুখের কেউ নয়। যে যেমন, তাহার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করতে হয়। লাথির ঢেঁকি, চড়ে উঠ্‌বে কেন?"

হরিমতী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; দেওয়ানজীও সবলে তাহার অঙ্গের বসন উন্মোচন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হরিমতী তখন পাগলের মত হইয়াছে, সে চিৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার, গায়ে হাত দিবি তো আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌বো।"

দেওয়ানজী কোনও কথার জবাব না দিয়া হরিমতীর বসন কাড়িয়া লইতে লাগিলেন; হরিমতীও নখাঘাতে তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। কিন্তু অবলা বালিকা, কামোন্মত্ত পশুর সহিত সে কতক্ষণ যুঝিবে? ক্রমে সে অবশ হইয়া পড়িল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কেশপাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। সে তখন কাতরে কাঁদিয়া উঠিল, "কে কোথায় আছ, রক্ষা কর। কোথায় মধুসূদন, রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

দেওয়ানজী প্রেতের ন্যায় বিকট হাসিয়া চিৎকার করিয়া

বলিলেন, "ডাক্ তোর কে কোথায় আছে। ডাক্ তোর মধুসূদনকে, দেখি তোর মধুসূদন বাবা কেমন তোকে রক্ষা করে।"

অকস্মাৎ বাহির হইতে দ্বারে পদাঘাতের শব্দ হইল; সশব্দে দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল; দ্বার খুলিয়া গেল। উন্মুক্ত দ্বারপথে দুইজন লোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রথম আগন্তুক দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া এক পদাঘাতে দেওয়ানজীকে ভূতলশায়ী করিয়া কঠোরস্বরে বলিলেন, "You scoundrel! You cowardly brute!" হরিমতী হতচেতনা হইয়া শয্যার পার্শ্বে পড়িয়া গেল।

দেওয়ানজী ভূতলে পড়িয়া মিটিমিটি চাহিয়া দেখিলেন,—আঃ সর্ব্বনাশ! এ যে সাহেব! এত রাত্রিতে সাহেব কোথা হইতে আসিল? সাহেব তো নৌবিহারে গিয়াছে। সঙ্গে আলোকহস্তে সাহেবের বড় খানসামা। কি সর্ব্বনাশ! এমন অভাবনীয় ঘটনা কি করিয়া ঘটিল? হায়, পাপিষ্ঠ! জাননা, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, সেই শ্রীমধুসূদনই অঘটন ঘটাইয়া দেন!

সাহেব খানসামাকে বলিলেন, "পানি লাও, জল্‌ডি জল্‌ডি।" খানসামা ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছিল, সেই সময়ে দেওয়ানজী উঠিয়া দুই হাতে সেলাম ঠুকিয়া যোড়হস্তে বলিলেন, "আমি জল দিতেছি, ধর্ম্মাবতার, আমি জল দিতেছি, এই ঘরেই জল আছে।"

দেওয়ানজী ঘরের কোণ হইতে কলসী আনয়ন করিলেন। কিন্তু জলের আর আবশ্যক হইল না। হরিমতী আপনিই উঠিয়া বসিয়া অঙ্গের ছিন্নবসন যথাসম্ভব সংযত করিয়া দিল ও চারিদিকে কেমন একপ্রকার ভয়জড়িত চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। সে কখন জীবনে সাহেব দেখে নাই। পারকার সাহেবের সেই কোমলতামাখা প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া সে মনে করিল, তিনি বুঝি দেবদূত, ভগবান তাঁহাকে

তাহার উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়াছেন। সে অমনই তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাবা, তুমি আমার ধর্ম্মপিতা। তুমি যেই হও আমায় রক্ষা কর, আমায় ঘরে রেখে এস।"

সাহেব অতি কোমলস্বরে বলিলেন, "মা, টুমার কুছু ভয় না আছে। হামি টোমার সণ্টান, হামি টোমার বাই। কুঠায় টুমার গর আছে বোলো, হামি টুমাকে এখনই পাঠাইয়া ডিবে।"

হরিমতী সাহেবের সদয় ও মিষ্ট ব্যবহারে গলিয়া গেল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। পরে সে সাহেবকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। দেওয়ানজী ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া যথার্থ নীত পূজার পশুর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।

সাহেব শুনিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে দেওয়ানজীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হামি সব বুঝিয়াছে। শালা হারামজাড! হারামজাডকি করিটে আসিয়াছে? পূর্ব্বে শুনিট, বিশ্বাস করিট না; এখন চক্ষে ডেখিলাম, টোমার হারমজাড্কি ছোড়াইবে। বাঞ্চট! হিণ্ডু হইয়া হিণ্ডুর ঢরম মানিস্ না? পরের স্ত্রীকে মাটার মট ডেখিবি; স্ত্রীজাটির অপমান করিলি, টোর সর্ব্বনাশ হইবে।"

দেওয়ানজীর কাঁপুনি বৃদ্ধি পাইল সাহেব পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "হামি টোকে ঠানাডারের জিম্মায় ডিটাম, টোর ভাল সাজা হইট। কিন্তু টুই বহুট ডিন হামার কাম করিয়াছিস, উহা করিবে না, সকলের নিকট অপমান করিবে না। কিন্তু টুই এখনই হামার কুঠি হইটে চলিয়া যা, আর আসিবি না। টোর পাপের শাষ্টি ভগবান ডিবে। আ হাঃ হাঃ! এই বালিকা! অট্যাচার করিটে টোর লজ্জা হইল না? যা, হামার সম্মুখ হইটে ডুর হইয়া যা।"

সাহেব আবার পদাঘাত করিবার মানসে পদোত্তোলন করিলেন; দেওয়ানজী বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

সাহেব তখন হরিমতীকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "মা, হামার সহিট আইস। হামি আজ রাট্রেই টুমাকে গরে পাঠাইবে। হামার কুঠিতে বহুট লোক জানানার সহিট বাস করে। জানানা সাঠে ডিয়া ডিঙ্গি করিয়া টুমাকে গরে পাঠাইয়া ডিবে। আইস মা, হামার কুঠিতে তোমার অপমান হইল, এজন্য হামার বড় কোষ্টো হইয়াছে। মা, সণ্টানের কুছু অপরাট নেহি মা!"

সাহেব এত মধুর—এত কোমল স্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, সকলের মন গলিয়া গেল। সাহেবের চক্ষুতে জল দেখা দিল। হরিমতী আবেগভরে কাঁদিয়া ফেলিল। সে কিছুই বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, স্বর জড়িত। সে কেবল মনে ভাবিল, সাহেব নিশ্চিতই শাপভ্রষ্ট দেবতা; সে ভগবানের নিকট কায়মনে সাহেবের মঙ্গল প্রার্থনা করিল।

তাহার পর সাহেবের সহিত সকলে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সেই রজনীতেই হরিমতী নৌকাযোগে দণ্ডীরহাটে প্রেরিত হইল।

প্রত্যাবর্ত্তন।

বহুদিন পরে সেনেদের রামহরি ঘরে ফিরিতেছে। দুঃখে অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া সে বসন্তপুরে আত্মীয়ের গৃহে চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে গিয়াও সে একদিনের তরেও মনের শান্তি পায় নাই। কলহ বিবাদের সীমানা সে অতিক্রম করিল বটে, কিন্তু সেখানে সে গৃহের মত আনন্দ বা তৃপ্তি পাইত না। তাহার সকলই কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত—যেন কি নাই—যেন কি একটা অব্যক্ত অভাব তাহার মনে অনুক্ষণ জাগরূক থাকিত। কার্য্য হইতে বিরাম

পাইলেই সে সেই সকল কথা তোলাপাড়া করিত, আর গৃহে ফিরিবার নিমিত্ত তাহার প্রাণ হু হু করিত। সেই জন্য সে সর্ব্বদা কার্য্যে লাগিয়া থাকিত। জননীর ভৎর্সনা, ভ্রাতার অকৃত্রিম আন্তরিক ভালবাসা, স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়ার প্রাণপাত আদর যত্ন, ভগিনীদের অনাবিল পবিত্র-প্রেম,—যখনই তাহার মনে পড়িত, তখনই তাহার প্রাণের ভিতর আকুলি বিকুলি করিত, ঘরের জন্য তাহার মন বড় টানিত, তাই সে সেই সময়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে মনোযোগ দিত। রামহরি কিছু পুঁজি সঙ্গে আনিয়াছিল। সেই পুঁজি খাটাইয়া আর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে অল্পদিনেই পুঁজি দ্বিগুণ করিয়া ফেলিল। তখন তাহার গৃহে ফিরিবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আপনার জনকে আয়ের অর্থ দেখাইয়া—তাহাদিগকে প্রীতিভোজ দিয়া সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা আর কি আনন্দ আছে? দারুণ অভিমানেই রামহরি গৃহত্যাগ করিয়াছিল, অভিমানেই সে এতদিন ঘরে ফিরিতে পারে নাই। এখন বহুদিনের বিচ্ছেদে সে অভিমান কাটিয়া গিয়াছে; ঘরে ফিরিবার বাসনা তাই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাঁধ একবার কাটিলে, জলের স্রোত নিবারণ করে কাহার সাধ্য?

রামহরি আত্মীয়দিগের নিকট কিছুদিনের নিমিত্ত বিদায় লইয়া গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। আজ তাহার বড় আনন্দ, আজ তাহার মন বড় প্রফুল্ল; আজ সে সারা জগৎখানাই যেন হাস্যময় দেখিতেছে। রামহরি ভাবিতেছে, "চুপি চুপি না বলিয়া না কহিয়া ঘরে ফিরিতেছি, একবারে যখন হুপ করিয়া ঘরের মাঝে উপস্থিত হইব, তখন সকলে কেমন চমকাইয়া উঠিবে, কেমন হর্ষবিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইবে। আচ্ছা, মা কি বলিবে? গোঁয়ারটা ফিরেছে,—এ কথা নিশ্চয়ই বলিবে, তবে মনে মনে নিশ্চয়ই আহ্লাদে আটখানা হইবে। এতদিন পরে ঘরে ফিরিতেছি,—আহ্লাদ হইবে না? দাদার তো কথাই নাই, সদাশিব

দাদা। দাদা আমায় দেখে কি বল্‌বে, কি কর্‌বে, ঠিক কর্‌তে পারবে না। ভজাও তাই। আর বোন্ দুটো? তাদের আহ্লাদের কথা মনে পড়ে এখনই আমার চোখে জল আস্‌ছে। সকলের চেয়ে বউ! এমন সোনার লক্ষ্মী, দাদা কত জন্ম তপস্যা করেছিল, তাই পেয়েছে। বউ যে আমায় দেখে কি কর্‌বে, তা বল্‌তে পারিনি। কি খাওয়াবে, কি পরাবে, কি করে সেবা কর্‌বে, কি করে সুখী কর্‌বে, বেচারি তাই ভেবে ঠাউরে উঠ্‌তে পারবে না।” ভাবিতে ভাবিতে রামহরির চোখ জলে ভরিয়া গেল।

সে দিন সোলাদানার হাট। বসন্তপুর হইতে সোলাদানার হাটুরে নৌকা আসে, তাহাতে ভাড়া অতি সামান্য। রামহরি সেই নৌকায় উঠিয়া অপরাহ্ণে সোলাদানায় পৌঁছিল। সেখানে হাটে সে একটা বড় মৎস্য খরিদ করিল; খুকীর জন্য কদমা, বাতাসা, কাঠের খেলানা, মাটীর খেলানা কিনিল; বউ ও পুঁটীর জন্য জোলার তাঁতের সাটী, গামছা এবং সিন্দুর অলক্তক ক্রয় করিল; দাদার জন্য ভাল একটা হুঁকা ও তামাকু এবং জননীর জন্য একটা বেতের পেঁটরা কিনিল। দ্রব্যাদি পেঁটরার মধ্যে পুরিয়া পেঁটরা মাথায় লইয়া ও হাতে মাছ ঝুলাইয়া লইয়া রামহরি মহা আনন্দে গৃহাভিমুখে ছুটিল।

হাটে লোকের মুখে সে একটা কথা শুনিয়াছিল। কুঠীর দেওয়ানের চাকুরী গিয়াছে; দেওয়ান কুঠীতে কাদের মেয়েকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল, তাই সাহেব তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। একজনের মুখে শুনিল, “সাহেব খুব ভাল লোক, কারও অন্যায় দেখতে পারে না, তা সে যেই হউক না। আমি সাহেবের বড় খানসামার চাচার মুখে শুনেছি যে, দেওয়ান সেই ছুঁড়িটাকে ধরে এনে বে-ইজ্জৎ কর্‌তে যাচ্ছিল; সাহেব জান্তে পেরে লাথি মেরে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে; আর ছুঁড়িটাকে মা বলে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে।”

রামহরির ঘরের দিকে টান পড়িয়াছে, সে ওসব কথায় ভাল করিয়া কাণ দেয় নাই। তবে দেওয়ানের নামটা হওয়াতে সে একটু শুনিয়াছিল। এখন গৃহাভিমুখে ছুটিতে ছুটিতে সে দেওয়ানের কথা ভাবিতে লাগিল। সে মনে ভাবিল, "দেওয়ান বেটা কি পাজী! বুড়ো হয়ে মর্‌তে চল্‌লো, তবু এখনও স্বভাব শুধ্‌রালো না? এই স্বভাবের জন্যে, কত জায়গায় যে মার খেয়েছে, কত যে অপমান হয়েছে, তা আর বলা যায় না। গাঁয়ের সকলে ওর গুণ জানে না। আমায় ধানের তাগাদায় গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরতে হয়, তাই কত কথাই কাণে উঠে। সেবার গয়লাদের ওখানে বাঁকপেটা খেলে, আবার কুমোরজোলের কপালীদের কাছে সেবার লাঠিপেটা খেয়ে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচেছে। যাক্, বেটার এইবার অতি বাড় বেড়েছিল; কোন্ গেরস্তর বৌয়ের সর্ব্বনাশ কর্‌তে গিয়েছিল, সাহেবের লাথি খেয়েছে, এইবার গাঁ থেকে দূর হয়ে যাবে।"

কত লোক হাট হইতে ঘরে ফিরিতেছে, কাহারও প্রতি রামহরির ভ্রূক্ষেপ নাই; সে আপন মনে এক গোঁয়ে চলিয়াছে। যাহারা রামহরিকে চিনিত, তাহারা তাহাকে সেখানে সেই অবস্থায় দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু রামহরিকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না, কেননা সে ভোঁ ভোঁ দৌড়াইতেছে। দণ্ডীরহাটের দুই এক জন লোকের সহিত রামহরির সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা রামহরিকে দেখিয়া যেন সভয়ে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। রামহরি অন্যমনস্ক, সেদিকে তাহার লক্ষ্যও নাই, সে তখন মনের আনন্দে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছে।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সময় রামহরি ফকিরহাটে পৌঁছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ফকিরহাট দণ্ডীরহাটের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ। এইখানে দণ্ডীরহাটের ও সোলাদানার পথের সঙ্গমস্থলে দুই চারিখানি

মুদীর দোকান। রামহরি ইচ্ছা করিলেই তথায় বিশ্রাম লইতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গালার বাড়ীর টান বড় টান। রামহরি ফকিরহাটে না বসিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। পথের পার্শ্বে বসুদেরই এক পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীতে আশে পাশের বারুই ও কামার কুমার প্রভৃতিরা জল সরে। রামহরি পুষ্করিণীতটে এক বাদাম বৃক্ষের মূলে বোঝা নামাইয়া পায়ের কাদা ধুইয়া ফেলিবার নিমিত্ত জলে নামিতে গেল; কিন্তু দেখিল, অনেকগুলি বৌ ঝি জলে নামিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া রামহরি ফিরিয়া আসিয়া বাদামতলে বসিয়া বিশ্রাম লইতে লাগিল। ভাবিল,—সন্ধ্যা হইয়াছে, বৌ ঝিরা এখনই ঘরে ফিরিবে, আমিও ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করিয়া লই। বাস্তবিকই ক্রোশাধিক পথ পেঁটরা মাথায় দৌড়িয়া সে গলদঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছিল; বাদামতলায় বসিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বস্ত্রাঞ্চল দিয়া হাওয়া খাইতে লাগিল।

হঠাৎ একটা কথা তাহার কাণে গেল; কথাটা পুকুরঘাট হইতেই আসিল। রামহরি উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, কোনও রমণী বলিতেছে, "ওলো, আমি তখনই বলেছিলাম, ও ছুঁড়ী ঘরে থাকবার নয়। হেসে হেসে ঢোলে ঢোলেই আছেন, মরণ আর কি! গেরস্তর ঘরের বিধবার আবার অত হাসি খেলার ঘটা কেন?"

অপর একজন নারী বলিল, "তা, ওর দোষ কি? দেওয়ান মুখ-পোড়াই তো ওরে ধরে নিয়ে গেল। ও তো আর ইচ্ছে করে যায় নি।"

প্রথমা তাহার মুখে থাবা দিয়া বলিল, "আহা হা! ইচ্ছে করে না তো কি? দুপুর বেলা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে তাস খেলতে, সন্ধ্যা হল তবুও ঘরে ফেরে না; এমন তো একটী দিন নয়, রোজ রোজ—কেন ঘরে কাজ নাই? ওকি গা, অত বড় সমত্ত মেয়ে! আবার রাঁঢ়! তুই বৌয়ের ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরুস কেন? ওর

পেটে পেটে বজ্জাত। ওর সব গড়া পেটা ছিল, সাহেবের সঙ্গে থাকবে ; ছুতো করে দেওয়ানকে দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে গেল।"

অপরা। "অমন কথা বলিস্ নি বাছা, ছি ছি ঘেন্নার কথা! পুঁটীর মত একটা মেয়ে বার কর দেখি ?"

পুঁটীর নাম শুনিয়াই রামহরি চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিল, কোন পুঁটী, তাহাদের পুঁটী নয় তো? সংসারে কত পুঁটী আছে। কিন্তু সমস্ত মেয়ে, বিধবা ..

তৃতীয়া এক রমণী বলিল, "বিরাজী দিদি ঠিক কথাই বলেছে। আর শুনেছিস দিদি, সাহেব না কি ওরে কোলে কোরে তুলেছে, আর সাহেবের মোছলমান খানসামা ওর মুখে জল দিয়েছে।"

চতুর্থা বলিলেন, "ওমা কি ঘেন্নার কথা গো, কোথা যাব গো !"

একটী রমণী এতক্ষণ গামছা জল-আছড়া করিতেছিল সে বলিয়া উঠিল, "গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! বেরুলি, বেরুলি, তা ঐ কটাচোখো কটাচুলো হাসা মুখপোড়াটার সঙ্গে বেরুলি কেন? মাগো, রূপ তো নয় যেন গিলে খেতে আসে। আমার বাপের বাড়ীর দেশে আমি ওরকম কত মুখপোড়াকে দেখেছি।" যুবতীর পিত্রালয় গঙ্গাতীরে বারাকপুরের কাছে।

দ্বিতীয়া রমণী সানের উপর পা ঘসিতে ঘসিতে চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "আ মরণ, বেরুলো আবার কবে? সেই রাতেই তো ঘরে ফিরেছে। তোদের সকল বিটকেল্! বলে, যারে দেখ্তে নারি তার চরণ বাঁকা।"

প্রথমা মুখনাড়া দিয়া কহিল, "আ হা হা! দেখিস্, টস্ যে একবারে বয়ে পড়ছে! বেরুলো না তো কি লা! ধম্ম যখন খেয়েছে একবার, সাহেব কি তখন আর চুপ ক'রে থাকে? এখন চল্লো, ঐ সেন-বাড়ী আর কুঠী, কুঠী আর সেন-বাড়ী।"

রামহরি এতক্ষণ কাঠ হইয়া স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথন শুনিতে-

ছিল; ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া তাহাকে পরের কথাবার্ত্তা শুনিতে হইতেছিল, কেন না "পুঁটীর" নাম শুনিয়া তাহার আর নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা ছিল না। শেষ কথাটা শুনিয়া তাহার মাথার ভিতর রি রি করিয়া উঠিল; সে সেই স্থানে শুইয়া পড়িল। শুনিল, দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটী বলিতেছে, "তোদের গড় করি, ক্ষেমা দে বাছা! আহা, সেনেদের মাথায় মাথায় এই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, এখনও তেরাত্তির পোহায় নি, আর তোরা কিনা—

রামহরি আর শুনিল না, তাহার পা ধোয়া মাথায় উঠিল; সে তীরের ন্যায় উঠিয়া বসিল, দ্রব্যাদি লইয়া আবার হন্ হন্ করিয়া পথ চলিল। পথে দুই এক জন গ্রামবাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু সে কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপন মনে চলিল, গ্রামবাসীরাও তাহাকে দেখিয়া কেমন একপ্রকার দৃষ্টিতে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না।

রামহরি গৃহের নিকটে পৌঁছিল; তাহার বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঐ যে বাঁধা বকুলতলা; ঐ যে চালতাতলা; ঐ যে বাহিরের দাওয়া। কই, আজ তো এই সন্ধ্যারাত্রিতেও ঐ স্থানে জনসমাগম নাই, অন্য সময়ে ঐখানে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন বসে!

মাথার উপর দিয়া একটা কাল পেঁচা বিকট রব করিয়া হুহু শব্দে উড়িয়া গেল; রামহরির বুক ধড় ফড় করিয়া উঠিল। ঐ তেঁতুলগাছে কুল্লোপাখা ঠিক শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল; রামহরির পা আর চলে না, রামহরি বকুলপীঠে উপবেশন করিল।

একবার সাহসে ভর করিয়া সে গৃহপানে তাকাইল, দেখিল গৃহ হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে; রামহরি বুকে বল পাইল; এক পা এক পা করিয়া গুটি গুটি অগ্রসর হইয়া গৃহদ্বারে উপনীত হইল।

দ্বারের নিকট মোট নামাইয়া রামহরি একবার দাদার নাম লইয়া ডাকিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। আবার চেষ্টা করিল, আবার বিফল হইল, কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। রামহরি এত দৃঢ়, এত তেজস্বী,—কিন্তু আজ যেন সে নির্জ্জীব। সে আর একবার প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া ডাকিল, "দাদা!" নৈশ গগণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রতিধ্বনি উঠিল, "দাদা"। কিন্তু কৈ, সাড়া তো নাই। কি হইল, গৃহে আলোক দেখা যাইতেছে, অথচ কেহ উত্তর দেয় না কেন? হায়, রামহরি! তুমি তো জান না, তোমার কি সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে!

রামহরি আবার ডাকিল, "দাদা"। সাড়া নাই। রামহরি অস্থির হইয়া উঠিল ; এবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "দাদা! পুঁটী! মা!" কই, কেউ তো উত্তর দেয় না, কি হ'ল!

রামহরি ধৈর্য্যহারা হইয়া আকুলপ্রাণে বার বার ডাকিতে লাগিল। হায়, কে উত্তর দিবে? তখন সে সাহসে ভর করিয়া দ্বার ঠেলিল। একি! দ্বার খুলিয়া গেল। প্রশস্ত অঙ্গনের মাঝে দাঁড়াইয়া রামহরি কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "দাদা, দাদা, কোথায় তোমরা! কই মা, কোথায় তুমি, তোমার রামা এসেছে, কেন উত্তর দিচ্ছ না?"

আবার সে পাগলের মত ছুটিয়া রন্ধনশালার দিকে গিয়া ডাকিল, "বৌ, বৌ, কোথায় তুমি! আমার বড় খিদে পেয়েছে। আমার খিদে পেলে তো তুমি থাকৃতে পার না, তবে আজ লুকিয়ে থেকে সাড়া দিচ্ছ না কেন? বৌ, বৌ—"

অকস্মাৎ রামহরির পশ্চাতে অতি ভয়ঙ্কর, অতি বিকট, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাসির রোল উঠিল ; রামহরির শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। সে ফিরিয়া দেখিল,—কি ভয়ঙ্কর বীভৎস মূর্ত্তি! শতগ্রন্থি ছিন্ন মলিন বাস, ধূলিধূসরিত কর্দ্দমসিক্ত অঙ্গ, তৈলাভাবে রুক্ষ অযত্নরক্ষিত

কেশরাশি, লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন সদা ঘূর্ণায়মান চক্ষু, হস্তে একরাশি স্ত্রীলোকের কুঞ্চিত কেশ,—কে এ ভীষণমূর্ত্তি? একি, এ যে তাহারই অগ্রজ নরহরি! ওহো ভগবান! একি দৃশ্য দেখালে, ঠাকুর!

নরহরি বিকট হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল, "বেটা চোর, চুরি কর্‌তে এসেছ? রাক্ষস বেটা, সব খেলে, একগালে পুরে দিলে। আর কি নিবি? এই দেখ্, আমিও চুরি করে এনেছি। এই দেখ তার চুল; ও হোঃ হোঃ! আমার মালার চুল রে! ওরে, তোদের দেবো না, তোদের দেবো না। শালা রাক্ষস, চুলও খাবি? না ভাই, খাস নি, খাস নি, তোর দুটী পায়ে পড়ি। ওরে বাবারে, খেলে রে! যাই, যাই, পালিয়ে যাই।"

নরহরি ছুট দিল। রামহরি তাহার অনুসরণ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "দাদা, দাদা, আমি যে তোমার রামা। দাদা, দাদা!"

আর দাদা! নরহরি একবার ভীতিবিহ্বলনেত্রে পশ্চাতে তাকাইয়া রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়াছে; পড়ে তো মরে; দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। রামহরি বসিয়া পড়িল; সে সাহসী ও বলিষ্ঠ, কিন্তু আজ তাহার হাটুতে বল নাই। সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল; ভাবিতে ভাবিতে সে একবারে উন্মত্তের মত হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষু নিমীলিত নহে, কিন্তু সে বহির্জগতের কিছুই দেখিতেছে না। কতক্ষণ সে এই অবস্থায় ছিল, সে জানে না। যখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল, তাহার সম্মুখে একখানি বিষাদময়ী মূর্ত্তি দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রামহরি প্রথমে চিনিতে পারিল না; সে দেখিতেছে, অথচ দেখিতেছে না,—তাহার মন অন্যত্র অন্য রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। একবার শুনিল, যেন কে বলিতেছে, "দাদা, তুমি এখন এলে?"

ওঃ! সেই স্বর কি ভয়ানক বিষাদকাতরতাজড়িত! যেন সেই কথা কয়টী উচ্চারণ করিতে বক্তার হৃদিতন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইতেছে, বুকের হাড় মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতেছে, চক্ষু ফাটিয়া শোণিতস্রাব হইতেছে!

রামহরি এইবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, দেখিয়া চিনিল—এ যে তাহার ভগিনী হরিমতী! ওঃ কি ভয়ঙ্কর! এত অল্পদিনে এত আকৃতির পরিবর্ত্তন! এ তো তাহার কায়া নয়, এ যে ছায়া! এই কি সেই সদানন্দময়ী সদাহাস্যস্ফুরিতাধরা সুস্থা সরলা হরিমতী! কই সদানন্দময়ীর সে হাসি কোথায়? কই সে কলকণ্ঠ? কই সে চঞ্চল চরণ? কই সে অস্থির অঙ্গবিক্ষেপ? সোণার কমল যে শুকাইয়াছে!

গভীর-বিষাদ-জড়িত-কম্পিত-স্বরে হরিমতী পুনরায় বলিল, "মেজদাদা, কি দেখ্‌তে এসেছো? শ্মশান! মা মরেছে, বৌ মরেছে, ভাই মরেছে, দাদা পাগল হয়েছে, খুকী ক'দিন ধুক্‌ধুক্ কচ্ছিল কাল তাও শেষ হয়েছে। আর আমি? আমায় দেখ্‌ছো? এই দেখ আমি আছি। আমার সমাজে স্থান নাই।"

বলিষ্ঠ রামহরি দুর্ব্বল শিশুর মত কাঁপিতে লাগিল; তাহার বুক ভাঙ্গিয়াছে। সে কাঁদিয়া বলিল, "পুঁটী, কি বল্‌ছিস্, কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

হরিমতীর চক্ষুতে একবিন্দু জল নাই; তাহার মুখের একটী মাত্রও মাংসপেশী কাঁপিতেছে না, তাহার সেই পূর্ব্বের চঞ্চলতা আর নাই; সে ধীর, স্থির, অচল, অটল; কেবল তাহার স্বর বিষাদ কাতরতা ও অভিমান বিজড়িত। হরিমতী তখন ভ্রাতার নিকট অঙ্গনেই উপবেশন করিল ও একে একে সকল কথা বলিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে রামহরির মুখে কখনও ভয়, কখনও বিস্ময়, কখনও ক্রোধ, কখনও ঘৃণা, কখনও দুঃখ, কখনও বিষাদ—নানা ভাব প্রস্ফুট

হইতে লাগিল। কখনও সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। দুইতিন বার সে ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করিয়া গৃহ হইতে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইতে গেল, হরিমতী ধরিয়া বসাইল। অন্য সময় হইলে রামহরি হরিমতীর বাধা মানিত না; কিন্তু আজ তাহার মনের অবস্থা অন্যরূপ, তাই সে স্থির হইয়া বসিল। হরিমতী সকল কথা বলিয়া শেষে কহিল, "আজ পাঁচদিন হইল, আমায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই দিন শেষ রাত্রিতেই সাহেব কুঠীর দুইজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে দিয়ে নৌকায় করে আমাকে ঘরে পাঠিয়ে দেন। মেজদাদা, অমন লোক হয় না। সাহেব নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার ছেলে ছিল। এখানে পৌঁছে সব শুনলাম। পূব্‌বাড়ীতে আমায় আশ্রয় দিলে, খুকীও ঐ খানে ছিল। বড়বাড়ীতে আমায় থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল, খুকীকেও এর আগে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু দাদাভায়ের বাড়াবাড়ি অসুখ বলে কবিরাজ আমাদের যেতে মানা করেছিলেন, তাই পূববাড়ীতে আছি। ঘরে দুয়ারে আসতে ইচ্ছা করে না; এলেই প্রাণ হুহু করে; কেবল ঝাঁট পাট আর সন্ধ্যা দিতে আসি। দাদা পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে, কারও অনিষ্ট করে না, তবে তাকে ধরে বেঁধে খাওয়াতে হয়; বড়বাড়ী হতে দাদার রক্ষার জন্য লোক মোতায়েন হয়েছে।"

রামহরি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসিল, "খুকী গেল কবে?"

হরিমতী বলিল, "কাল। পূবের বাড়ীর সকলে আমাদের খুব যত্ন করছে। কিন্তু আর আমাদের ওখানে স্থান হবে না।"

রামহরি। কেন?

হরিমতী। গাঁয়ে দেওয়ান রটিয়েছে, সাহেবই আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে কিছুই জানে না; আমায় সাহেব ছুঁয়েছে, আমি খানসামার জল খেয়েছি। আর, আর,—

রামহরির চক্ষু ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "বটে, বটে! হারামজাদা চামার! শালার মুণ্ডু যদি আজ না ছিঁড়ে ফেলি, তা হলে আমি বেজা—

হরিমতী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল, "ছিঃ! ও কথা বলতে নাই। অদৃষ্টে যা ছিল, ঘটেছে।"

রামহরি তখনও ফোঁপাইতেছে, তাহার সর্ব্বশরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া রামহরি ধীরে ধীরে বলিল, "আমি জানতাম, আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। ঘরের লক্ষ্মীকে অমন করে দুবেলা পায়ে ছানলে, লক্ষ্মী যে আপনিই দুদিনে পালান। হা রে কপাল! মা, দাদা, কেউ চিনলে না! তারেও মারলে, আপনারাও মল। আ হাঃ হাঃ! আমি থাকলে কি এ সর্ব্বনাশ হয়!" রামহরি শিরে করাঘাত করিয়া বালকের মত ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরিমতী। যা হবার তা হয়েছে, এখন হাতে মুখে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হও। আমি তোমার খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ করি গিয়ে।

রামহরি। খাওয়া দাওয়া? হাঃ হাঃ! এত খেলাম, আরও খিদে?

হরিমতী। যা হয়েছে তা তো আর ফিরবে না। এখন এস।

রামহরি। হাঁ যাই। তুমি যাও, আমি আসছি।

রামহরি এই কথা বলিয়া বকুলতলার পার্শ্বের ডোবাতে পা ধুইতে গেল। যখন দেখিল, হরিমতী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূবের বাটীর দিকে গেল, তখন সে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। একবার অঙ্গনে মাথা কুটিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিয়া বলিল, "ভগবান! কি করলে যা ছিল তাই ফিরে আসে? প্রাণ দিলে যদি তাই পাওয়া যায়, আমি এখনই দিচ্ছি। ও হোঃ হোঃ হোঃ, কি সর্ব্বনাশ হল।" তাহার পর চুপ করিয়া দাওয়ার খুঁটীতে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল। তাহার

সেই সুখের সংসারের সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। হঠাৎ সে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া এক কোণ হইতে একখানি বৃহৎ রামদা বাহির করিল। প্রদীপের আলোকে ধরিয়া সেখানা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। পরীক্ষা করিয়া তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। রামহরি সেই রামদা বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। সেখানে আসিয়াই শুনিল, কিছু দূর হইতে নানা বাজনার আওয়াজ আসিতেছে আর দেখিল, রোসনায়ের আলোক দূরে চারিদিক আলোকিত করিয়াছে। রামহরি বিস্ময়ান্বিত হইল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া রহিল।

ভীষণ প্রতিশোধ।

দেওয়ান কালিদত্তের বাটী ডাকাত পড়িয়াছে। গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ডাকাতের ঘাঁটি বসিয়াছে। ভদ্রবাগানে দেওয়ানজীর বাটীর চারিদিকে ডাকাতে কুক করিয়া লাঠি খেলিতেছে। চারিদিকে মশাল জ্বলিতেছে, সেই মশালের আলোকে দুর্দ্দান্ত দস্যুগণের ভীষণ আকৃতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ডাকাতের ভীষণ বাদ্যের ও কুক হাঁকারের শব্দে পেটের প্লীহা চমকাইতেছে। দোমা দোদমার আওয়াজে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। সে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ডে গ্রামবাসী ভয়ে জড়ভরত হইয়া গিয়াছে।

আজ তিনদিন পূর্ব্বে দেওয়ান কালিদত্ত ডাকাতির পত্র পাইয়াছেন। পত্রে জীবন সর্দ্দারের নাম দস্তখত আছে। কালিদত্তের বাটী চারি দিনের মধ্যে ডাকাত পড়িবে, দেওয়ান পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হউন,—পত্রে

এইরূপ লেখা ছিল। পত্র পাইয়াই দেওয়ানজীর চক্ষুস্থির। একে তাঁহার নানারূপ অপমান লাঞ্ছনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার এই উৎপাত, ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার শনির দশা পড়িল দেখিতেছি। এতদিন বেশ কাটাইলাম, আর চলে না। চপলাকে বড় বিশ্বাস করিতাম, সেও আমার বুকে ছুরি বসাইল। কলির ধর্ম্মই এই! এত সুখে রাজরাণীর হালে রাখিলাম, তা সইবে কেন? গোড়ায় যে গলদ! শেষে রাক্ষসী আমার মুখে চূণ কালি দিল! কিনা, একটা একরত্তি ছোঁড়াকে দেখে মজ্‌ল, আমার গাঁ শুদ্ধ লোকের কাছে মাথা কাটা গেল! বড় দম্ভ করে ছোঁড়াকে জব্দ করতে গিয়েছিলাম। তা জব্দ সে তো হ'লনা, হলাম আমি। আচ্ছা এর প্রতিশোধ নেবোই নেবো। বিশ্বাসঘাতিনীর জাব টেনে বার কর্‌বো আর তার সখের নাগরকেও ফাঁসাবো, তবে আমার নাম কালিদত্ত। জাল জুয়াচুরি, খুন খারাপি, কিসে আমি পেছু পা? মনে ভাব্‌লেম, এখন থাক, তুদিন যাক্। আগে ঐ নাগর ছোঁড়া সেরে উঠুক, তারপর তুটোকে এক গাড়ে দেবো। আর সেই অবসরে হরিমতীটাকে হাত কর্‌বো আর দীনে গুণ্ডটারও সর্ব্বনাশ করবো। তা শনি লেগেছে, সব ফেঁসে গেল। হরিমতীর কিছুই কর্‌তে পারলাম না, বরং বিপরীত ফল ফল্‌লো, সাহেবের লাথি খেলাম, অমন রাজার চাকুরী খোয়ালেম। তারপর দীনে বেটাও যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, কিছুই জান্‌তে পারলেম না। শালা মিটমিটে ডান। আমার পেটের কথা সে অনেক জানে। আর তার মেয়ে? ওরে বাপরে! অমন মেয়ে আমার বয়সে দেখি নাই। বেটী কি যাতু জানে। ছোট লোকের ঘরের মেয়ের এত বুদ্ধি, এত বিবেচনা! আমার সব কথাই সে জানে। কেমন করে যে পেট থেকে কথা টেনে বার কর্‌ত, তা বল্‌তে পারি না। তারা পালিয়েছে, আমারও ধুকফুকুনি বেড়েছে।

নিশ্চিন্তে থাকিবার যো নাই ; এইবার এ দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। আবার তার উপর এই ডাকাতে চিঠি ! বাপ, আর এখানে থাকে ? আগে গহনাপত্র টাকাকড়ি যা কিছু আছে সব হাতাই, তার পর চপলার বুকে ছুরি বসিয়ে দফা রফা করে, ছেলেটাকে আছড়ে মেরে ফেলে, রাতারাতি পালাব। নিরে ছোঁড়াটার কিছু করতে পারলেম না। তা হক্, আগে আপনি বাঁচি, তার পর তার ভাবনা। এখন পালাই কোথা ? কলিকাতায় যাই, সেখানে ভিড়ের মধ্যে ডুবে থেকে একবার বেঁচেছি, এবারও বাঁচতে পারবো না কি ? নিশ্চয়ই বাঁচবো। কলিকাতা, কলিকাতা ; হাঁ, কলিকাতায় যাওয়াই ঠিক। চপলাকে এখন কিছু বলা হবে না। যে দিন পালাবো সেইদিন সব বলে তাকে নিকেশ করে পালাবো। আচ্ছা, সাহেবকে ডাকাতির কথা একবার জানাবো ? সাহেব ভাল লোক, বিপদে পড়েছি শুনলে রক্ষা করলেও করতে পারে। না, অন্য অপরাধ করলে সাহেবের কাছে ক্ষমা আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করেছি, এবার সাহেবের কাছে গেলে আমায় থানায় ধরিয়ে দেবে। কাজ নাই সাহেবের কাছে গিয়ে। তবে কি বসিরহাটের দারোগার কাছে যাব ? না, না, সে বেটাও আমার শত্রু। সে আমার অনেক কথা জানে। তার কাছেও যাওয়া হবে না। গাঁয়ের লোক কি আমায় রক্ষা করবে না ? তাদের কি বয়ে যাচ্ছে ? আমার উপর কেউ সন্তুষ্ট নয়। তারা বরং মজা দেখবে। দর্পনারায়ণ গ্রামে থাকলেও কথা ছিল ; কিন্তু সেও গ্রাম ছাড়া। কাজ নাই কাউকে জানিয়ে।”

দেওয়ানজী মনে মনে এই সঙ্কল্প আঁটিয়া পলাইবার যোগাড় দেখিতে লাগিলেন। টাকা কড়ি, কতক অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিলেন। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রহিল, কেবল তিনি উঠিলেই হয়। কেবল একটা দ্রব্যের অভাবে তাঁহার

যাত্রার ব্যাঘাত ঘটিল। চপলার অঙ্গে পরিহিত অলঙ্কারগুলি তিনি কিছুতেই লইতে পরিলেন না। দুই দিন ধরিয়া নানা কৌশলে সেই অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাঁহার কোনও কৌশলই খাটিল না। দ্বিতীয় দিন রাত্রিকালে চপলাকে হত্যা করিয়া অলঙ্কারগুলি হাতাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু চপলা সারারাত্রি জাগিয়া রহিলেন। চপলাও তাঁহার ব্যবহারে বিষম সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। তৃতীয় দিন রাত্রিতে দেওয়ানজী প্রকাশ্যে চপলার প্রাণবধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; ভাবিলেন, "হয় আজ, না হয় কাল ডাকাত পড়িবে, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। আর চক্ষুলজ্জার প্রয়োজন কি? যখন আসরে নামিয়াছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত বেয়ে দেখব। আজ ডাকাত পড়িবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা রাত্রিতেই চপলাকে খুন করিব, তাহার পর মাল পত্র লইয়া খিড়কির বাগান দিয়া চম্পট দিব। বাগানের কোলে বাঙ্গোড়ে নৌকা। একবার নৌকায় চাপিয়া বসিলে কোনও শালার আর তোয়াক্কা রাখিব না।" হায় রে লোভি! তুমি মনে মনে লোভে পড়িয়া কত সঙ্কল্পই আটিতেছ, আকাশে কতই সুন্দর নয়নারাম হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতেছ, কিন্তু দেওয়ানজী! তোমার উপরে একজন বিধাতাপুরুষ যে তোমার ভাগ্যসূত্রে ধরিয়া রহিয়াছেন!

অতিলোভ না করিলে দেওয়ানজী ইতিপূর্ব্বে স্বচ্ছন্দে পলাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইবার নয়। তাহা হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় কিরূপে?

সন্ধ্যার পর দেওয়ানজী আহারাদি করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। চপলা পুত্রটীকে লইয়া খাইতে গেলেন। দেওয়ান কক্ষের দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া মালপত্র গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া একত্র গুছাইয়া রাখিলেন; তাহার পর বন্দুকটী পাড়িয়া পরিস্কৃত করিলেন

এবং তাহাতে বারুদ ঠাসিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। কি বিষম মানুষ! মুহূর্ত্ত পরে যে একটী প্রাণীর প্রাণবধ করিবে, সে স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় গুড়গুড়ির নল টানিতেছে!

দেওয়ান-গৃহিণী আহারাদি শেষ করিয়া পুত্রকে লইয়া শুইতে আসিলেন। পুত্র অল্পক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল। চপলা শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "দরজা বন্ধ করে কি হচ্ছিল? আচ্ছা, আজ কদিন তোমার যেন কেমন কেমন ভাব! কি হয়েছে বল দেখি?"

দেওয়ানজীর মুখ গম্ভীর। কোনও কথার উত্তর না দিয়া তিনি বলিলেন, "চপলা, এটা কি দেখ্‌ছো? এই বন্দুকই না তুমি তোমার নিরঞ্জনকে দিয়েছিলে?"

চপলার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখ শুকাইল, তিনি সভয়ে বলিলেন, "ওকথা কেন? যে কথা বল্‌লে প্রাণে ব্যথা লাগে, সে কথা তোলা কেন?"

দেওয়ান কুটিল ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ ব্যথা পাবে কেন? সে যে নবীন নাগর, তার কথায় তো প্রাণ নেচে উঠবে।"

চপলা। ছিঃ! তুমি কি দীনুর কথা বিশ্বাস কর্‌লে? তোমায় যে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, তোমার জন্য যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি, সব ভুলে গেলে?

দেওয়ান। হাঃ হাঃ হাঃ! ভালবাসা? তোমায় আমায় ভালবাসা? তুমি পিশাচী, আমি পিশাচ,—ভালবাসার নাম মুখে এনো না।

চপলা। তুমি এখন যা বল, কিন্তু যথার্থই আমি তোমা বই জানি না। দেখ তোমার জন্য আমি কি না করেছি। পিতার ও শ্বশুরের নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিয়েছি। রাজরাণী ছিলেম, কেবল

তোমারই জন্য আজ ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও কুলত্যাগিনী হয়েছি। আমার পুত্র ঘরে থাকলে আজ যে রাজপুত্র হ'ত! ভেবে দেখ দেখি, কি ছিলাম কি হয়েছি?

দেওয়ান। বলে যাও, বলে যাও; কাণ আছে শুন্‌বো। কিন্তু ফল কি? সব জানি। তুমি কামুকা, তাই কামবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার জন্য সোনার সংসার ছেড়ে কুলের বাহিরে এসেছ, আমি উপলক্ষ মাত্র। তোমায় বিশ্বাস কি? যে কামুকা নারী কামের দায়ে একবার কুলত্যাগ কর্‌তে পারে, সে সব করতে পারে। এখনই তুমি মনে আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়েছো, পরে কামের বশে অন্য পুরুষে মজ্‌তে পার। জানি কি, হয়ত এতদিন মজেছ। কোন দিন হয়তো নিষ্কণ্টক হবার জন্য আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দেবে।

চপলার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। তিনি কাতরে বলিলেন, "তোমায় আমায় কি আজ দুদিনের সম্বন্ধ? এত দিনেও আমায় বুঝতে পারলে না? কই, কখনও কি কোনও ছল পেয়েছ? আর আজ একটা পেয়াদার কথায় আমার উপর সন্দেহ কর্‌ছ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমার এত অবিশ্বাসী মন!"

দেওয়ান উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অঙ্গযষ্টি থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন, "বটে! তবে সকল কথা খুলিয়া বলিব কি? এই পত্রগুলি কাহার হাতের লেখা? নাগরকে সোহাগের পত্র লিখিয়াছিলে, দিবার সুযোগ পাও নাই, কেমন!"

দেওয়ানজী পত্রগুলি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া চপলার সম্মুখে ধরিলেন। চপলার মুখ শুকাইল, তিনি ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন।

দেওয়ানজী বিকট হাসিয়া বলিলেন, "কেমন, আরও প্রমাণ চাই? বারাসতে শ্রীরাম কথকের সঙ্গে কি হয়েছিল? আমি গোড়ায়

জান্‌তে পেরেছিলাম বলেইতো ব্যাপার গড়ায় নাই। কুলটাকে বিশ্বাস কি ?”

চপলা কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “দেখ, এত সন্দেহ যখন তোমার, তখন একত্র থেকে সুখ কি ? আজ কদিনই তোমার এমনই ভাব দেখছি। দাও, আমায় বিদায় করে দাও, আমি চলে যাই।”

দেওয়ান। বেশ, তাই যাও। তবে যাবার পূর্ব্বে গায়ের ঐ গহনাগুলি খুলে রেখে যাও। তোমার বাপ বড় মানুষ, তোমার হবে। আমার কিছু নাই, আমি খাব কি ?

চপলা। সে কি ? গহনা তো আমার, তোমার কি আছে ? দেখ, আমার বাপ কুবেরের তুল্য ধনবান, কলিকাতায় তাঁহার মত ধনী কয়জন আছে ? আমি তাঁহার আদরের মেয়ে। আমার শ্বশুর জমিদার। আমার কিসের অভাব ছিল ? তুমি আমার পিতার বাজারের গোমস্তা ছিলে। কি কুহকে আমাকে মজালে! লক্ষমুদ্রার অলঙ্কার নিয়ে শিশুপুত্রের হাত ধরে তোমার সঙ্গে কুলের বাহির হয়ে আকুল পাথারে ভাস্‌লাম। দুদিনে জুয়াখেলায় সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিলে, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে গা থেকে এক এক খানি করে অলঙ্কার খুলে দিয়েছি। শেষে পাপের ফল্ ফল্‌লো, দারিদ্র সাগরে ভাস্‌লেম। দুঃখ ভুলে থাকবার জন্য তুমি আমায় মদ খাওয়াতে শিখালে, অধঃপতনের চূড়ান্ত হল। তার পর বহুকষ্টে জাহাজের সরকারি জুটল, দুপয়সার মুখ দেখ্‌লে, কষ্টও ঘুচল। শেষে সাহেবের নজরে পড়ে তোমার উন্নতি হল। তখন তুমি আমার গহনাগুলি একে একে দিতে লাগ্‌লে। কিন্তু এখনও যে সিকিও শোধ করতে পারনি। আমার গহনা, দিবেনা কেন ?

দেওয়ান। তুমি কামের জ্বালায় ঘর হতে বেরিয়েছ, তার

ফলে তোমার অলঙ্কার নষ্ট হয়েছে। আমার অলঙ্কার আমি দিব কেন ?

চপলা। দিবে না ? তাহা হইলে কোথায় যাইব ?

দেওয়ান। কেন তোমার বাপ মা আছে, শ্বশুর আছে।

চপলা। সেখানে আর এমুখ দেখাইব না। এখন খাইব কি ?

দেওয়ান। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! কুলটার আবার খাবার ভাবনা ! তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, দোকান খুলিয়া বস, খরিদ্দার জুটিবে।

চপলা। তার চেয়ে আমায় মেরে ফেল না কেন ? সত্য সত্যই আমি ত' ব্রাহ্মণের মেয়ে !

দেওয়ান। যে ব্রাহ্মণের মেয়ে কুলে কালি দেয়, সে আবার কিসের ব্রাহ্মণের মেয়ে ? কুলটার আবার এত বংশের বড়াই কেন ?

চপলা। তুমি আমায় একথা বল্‌লে ? আমার যে মরণই ভাল।

দেওয়ান। হাঁ, তাই বটে, তোমার মরণই ভাল।

চপলা। তবে আর বিলম্ব কর্‌ছ কেন ? ঐতো বন্দুক রয়েছে, বুকে গুলি বসিয়ে দেওনা কেন ?

দেওয়ান। পারবে ? সে সাহস হবে ? বল, আমি প্রস্তুত। এই দেখ, বন্দুকে গুলি ভরা।

সত্যসত্যই দেওয়ানজী বন্দুক উঠাইয়া চপলার মস্তক লক্ষ্য করিলেন। চপলা তখনও জানেন যে, দেওয়ান মিছামিছি ভয় দেখাইতেছেন। তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, বন্দুকে গুলি ভরা আছে। তিনি বলিলেন, "মারো, মারো, মেরে ফেলো। এই দেখ মাথা পেতে রইলাম, তোমার আপদ ঘুচে যাক্।"

দেওয়ানের জিঘাংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার চক্ষু ধক ধক জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মস্তিস্ক উত্তপ্ত হইয়াছে। একবার

বন্দুকের কলে তাঁহার অঙ্গুলী স্পর্শ হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে চপলার প্রাণ-পক্ষী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইবে। দেওয়ান কি ভাবিয়া বন্দুক নামাইয়া গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "চপলা!"

চপলা চমকিয়া উঠিলেন; দেওয়ানজীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার বিষম ভয় হইল। দেওয়ান বলিলেন, "চপলা! তোমায় আমায় কিসের সম্বন্ধ?"

চপলা। ও কথা বল্‌ছ কেন?

দেওয়ান। তোমায় খুন কর্‌বো। সত্য সত্যই বন্দুকে গুলি ভরা। মর্‌তে সাহস আছে ত?

চপলা সভয়ে বলিলেন, "না, না, মেরো না। আমি চলে যাচ্ছি, আর তোমার পথের কণ্টক হবো না।"

চপলা শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও?"

চপলা। এই আমার ছেলেকে নিয়ে আমি দূর হয়ে যাচ্ছি। তোমার আপদ বালাই কিছুই রেখে যাব না।

দেওয়ান। না, তা হবে না; আমি তোমায় হত্যা কর্‌ব। তুমি বেঁচে থাকলে আমার আশঙ্কা ঘুচবে না। তুমি আমার সব কথা জান। রূপের মোহে অন্ধ হয়ে তোমায় আমার হৃদয় খুলে দেখিয়েছি। আমার মরা বাঁচা তোমার হাতে।

চপলা। না, না, মেরো না। ঈশ্বর সাক্ষী—

দেওয়ান। খবরদার, ওনাম মুখে আনিস নি। কুলটার আবার শপথ কি? এই তোর শেষ দিন—

অকস্মাৎ অনতিদূরে ভীম রোলে বাজনা বাজিয়া উঠিল; ধুমদাম করিয়া দমা ফাটিতে লাগিল; হৈ হৈ রৈ রৈ চিৎকারে গগণ মেদিনী ভরিয়ে গেল। দেওয়ানজীর হাতের বন্দুক হাতেই রহিল।

তিনি বিস্মিত হইয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন। দালান হইতে দেখিলেন, অনতিদূরে রোশনাই করিয়া বাদ্য বাজাইয়া বিস্তর লোক লাঠি ও তরবারি খেলিতে খেলিতে আসিতেছে। আর তাঁহার মনে সংশয় রহিল না। এ তো নিশ্চয়ই জীবনে ডাকাতের দল! তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এত সন্ধ্যা রাত্রিতে তো ডাকাত পড়ে না। জীবনের কি সবই বিপরীত!

আর চিন্তা করিবার অবসর নাই, মুহূর্ত্ত পরেই ডাকাতে বাটী ঘেরাও করিবে। দেওয়ানজী ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। কক্ষে কেহ নাই। তখন দেওয়ানজীর মনে অন্য কোনও চিন্তা নাই, কাহারও কথা ভাবিবার অবসর নাই; তিনি শয্যাতল হইতে অলঙ্কার ও মালপত্রের মোটটী বাহির করিয়া কুক্ষিতে লইলেন ও দ্রুতপদে খিড়কীর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বারদেশে পৌছিয়া দেখিলেন, চপলা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ব্যাধভয়ভীতা কুরঙ্গীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে কক্ষের দিকেই ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চপলা বলিলেন, "পালাও, শীঘ্র পালাও। দ্বারে শত্রু। খিড়কীর দরজায়, ডাকাতের পাহারা।"

দেওয়ানজীর মুখ শুকাইল; একবার খিড়কীর দ্বারের বহির্দ্দেশে তাকাইয়া দেখিলেন, সত্যসত্যই সেখানে চারিজন যমদূতাকৃতি লোক সশস্ত্র দাঁড়াইয়া আছে। দেওয়ান সম্মুখদ্বারের দিকে দৌড়াইলেন। হায় হায়! সে পথেও কণ্টক! কেবল দ্বারে নহে, বাগানের হেথা সেথা সশস্ত্র লোক পাহারা দিতেছে। যেদিকে যান, সেইদিকেই ডাকাতের ঘাঁটি। দেওয়ানজী দেখিলেন, তাঁহার অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন পড়িয়াছে, পলাইবার আর পথ নাই। তখন নিরুপায় হইয়া তিনি বন্দুক লইবার নিমিত্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, চপলাও হতাশ হইয়া বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মত সেই কক্ষে ফিরিয়া

আসিয়াছেন। চপলাকে দেখিয়াই তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, চপলাই যত সর্ব্বনাশের মূল। তাঁহাকে সুখে রাখিবার নিমিত্তই তিনি এ অঞ্চলে কুঠির দেওয়ানিপদ লইয়াছিলেন; নতুবা তাঁহার কিসের ভাবনা? তিনি স্বচ্ছন্দে কলিকাতায় নিরাপদে থাকিতে পারিতেন, ডাকাতে তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি ত্রস্তে বন্দুকটা উঠাইয়া লইয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "পিশাচি! সর্ব্বনাশি! তোর জন্যই আজ আমার এই সর্ব্বনাশ। আমি তো গিয়েছি, কিন্তু যাবার আগে তোকেও রেখে যাব না।"

নির্ম্মম নিষ্ঠুর দেওয়ান বন্দুক উঠাইলেন; চপলা ও চপলার পুত্র পরিত্রাহি চিৎকার করিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। আর এক মুহূর্ত্ত পরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবে। দেওয়ান বন্দুকের কলে অঙ্গুলী অর্পণ করিয়া বলিলেন, "নে, একবার শেষ কথা বলে নে। আর ত—"

আর কথা শেষ হইল না; পশ্চাদ্দিক হইতে কে সজোরে দেওয়ানজীর গলা টিপিয়া ধরিল।

দেওয়ান সভয়ে বলিলেন, "ওরে বাপরে, তুই কে রে?"

উত্তর হইল, "তোর যম।"

দেওয়ান। ওরে আমায় ছেড়ে দে, তুই যা চাস সব দেবো, আমায় ছেড়ে দে।

উত্তর। এই যে ছেড়ে দিচ্ছি, একবারে ভবের পারে পৌঁছে দিচ্ছি।

দেওয়ান। ওরে, তুই আমার ধর্ম্মবাপ! বাবা, গলাটা একবার ছাড়, যাই যে।

চপলা এতক্ষণ মৃতবৎ পড়িয়া ছিলেন, তাঁহার পুত্রেরও সেই অবস্থা। এখন সাহস পাইয়া চপলা উঠিয়া যোড়হস্তে সকাতরে বলিলেন, "বাবা, রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমাদের ছেড়ে দেও বাবা।"

উত্তর হইল,—"চুপ, ফের কথা কহিবি তো এক চড়ে নিকেশ করবো। ঐ কোণে দাঁড়িয়ে থাক।"

উত্তরকারী এই কথা বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দেওয়ানজীর হস্ত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া দেওয়ানজীর গলদেশ পরিত্যাগ করিল। সে দ্বারদেশ পশ্চাৎ করিয়া বন্দুক হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। দেওয়ানজীর প্রাণ ধুক ধুক করিতেছে, তথাপি শেষ একবার সাহসে বুক বাঁধিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুই?"

লোকটী ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি জীবন সর্দ্দার"।

সকলে চমকিয়া উঠিলেন।

দেওয়ান। আমি কে জানিস্?

জীবন। জানি।

দেওয়ান। আমি কুঠীর দেওয়ান কালী দত্ত, আমার বাড়ী ডাকাতি?

জীবন। মিথ্যা কথা, তুই কালী দত্ত—এ কথা মিথ্যা।

দেওয়ান। আমি দেওয়ান কালীদত্ত নয় তো কে?

জীবন দারুণ ঘৃণার হাসি হাসিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল,—"যে পিশাচ পবিত্র কাশীতীর্থ পাপে কলঙ্কিত করেছিল, যে নরাধম বেশ্যাকে স্ত্রী পরিচয়ে ঘরে এনে কুল কলুষিত করেছিল, যে পাষণ্ড কত শত সতীর অমূল্য সতীত্ব রত্ন ছলে বলে কৌশলে কেড়ে নিয়েছিল, যে রাক্ষস আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত নর নারীকে খুন করেছিল, জাল জুয়াচুরি যে দাগাবাজের অঙ্গভূষণ ছিল, যে নরকের কীট পুত্রের সমক্ষে অসহায়া নিরাশ্রয়া নীচজাতীয়া দুঃখিনী পোদবধূর সর্ব্বনাশ সাধন করেছিল,—তুই সেই নরাকারে পশু কুদুলিয়ার নন্দগোপাল।"

"এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা"—বলিতে বলিতে দেওয়ান ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

জীবন আবার বলিতে লাগিল, "পাপিষ্ঠ, আমিই সেই জীবনে পোদ। যার সুখের সংসারে তুই আগুন দিয়েছিলি; যার স্নেহময়ী জননী তোরই পাপে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে, যার ইহ-জীবনের সুখশান্তি তুই নষ্ট করে দিয়েছিলি, যার শান্ত পবিত্র মনে দারুণ প্রতিহিংসানল জ্বালিয়ে তুই যারে সমাজদ্রোহী নৃশংস দস্যুতে পরিণত করেছিস,—আমিই সেই জীবনে পোদ। জালিয়াত চোর! নাম ভাঁড়িয়ে লুকিয়ে বেড়ালে কি হবে? এই জীবনে ডাকাতের চোখ এড়াবি কি করে? জীবনের যে মাতৃঋণ শোধ হয় নি।"

জীবনের চক্ষু ধক ধক জ্বলিয়া উঠিল। জীবন দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া আবার বলিল, "তোরই জন্য জঘন্য দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছি। তোর জন্য দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বহু দিন সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। শেষে বারাসতে তোকে ভগবান মিলিয়ে দিলেন। সেই সেনাবারিকের পুকুরে চোবানি মনে আছে কি? তোকে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ঠিক জানিতে পারি নাই। নির্দোষকে দণ্ড দিব না বলিয়া আরও সন্ধান লইতে লাগিলাম। আমার বৈষ্ণবী তোর অনেক কথা জানিতে পারিল, শ্বশুর দীননাথও গোপনে তোর কাগজপত্র ঘাঁটিয়া নানা কথা জানিল। আমিও শেষে বহুকষ্টে কলিকাতায় তোর সকল সন্ধান পাইলাম। এই যে, কলিকাতার হাপসী-বাজারের জমিদার তারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাও তোর কাছে আছে।"

চপলা কাঁদিয়া জীবনের পদতলে লুটাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। আমি সব স্বীকার করিতেছি।"

দেওয়ান সভয়ে বলিলেন, "না, না, আমি নন্দগোপাল নই। কে সে, আমি জানি না। দেখ একজনকে ভেবে আর একজন নির্দোষকে মেরো না।"

জীবন সক্রোধে বলিল, "পাপিষ্ঠ! মরবার সময়েও ছলনা! প্রমাণ না পেয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে ইচ্ছা থাক্‌লে বহুদিনই আমি কর্‌তে পারতাম। আমি সব প্রমাণ না পেয়ে তোর বাড়ী ডাকাতি করতে আসিনি।"

চপলা বলিল, "আমি সব বলিতেছি। সত্যই আমি কলিকাতার তারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, আর এই দেওয়ান কুন্থুলিয়ার জমিদার দ্বারিকানাথ পালিতের পুত্র নন্দগোপাল। আমায় নেশার ঝোঁকে অনেকদিন ওকথা বলিয়াছে। আমি কাগজপত্রও দেখিয়াছি, তাহাতেও প্রমাণ আছে। ঐ মোটের মধ্যে ওর কাগজপত্র আছে।"

জীবনের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জীবন সাগ্রহে সেই মোটটী লইতে অগ্রসর হইল; এত আগ্রহ যে, কক্ষমধ্যে সে অপরের উপস্থিতির কথা ভুলিয়া গেল। মোটটী খুলিয়া অলঙ্কারাদি দূরে ফেলিয়া দিয়া সে কাগজপত্র ঘাঁটিয়া দেখিতেছে, এমন সময় দেওয়ান বাঘের মত তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জীবন প্রথমে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া ক্ষণেকের তরে মুহ্যমান হইল; ধস্তাধস্তিতে হঠাৎ বন্দুকের গুলি ছুটিয়া গেল; অমনই চপলা "মাগো" বলিয়া ভূতলশায়িনী হইলেন; গুলি তাঁহার ক্রোড়স্থিত পুত্রের বক্ষপার্শ্ব ভেদ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে; পুত্রের তখনই মৃত্যু ঘটিল, চপলাও মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সকল কাণ্ড ঘটিয়া গেল। জীবন তৎক্ষণাৎ দেওয়ানকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাহার বক্ষের উপর জানু পাতিয়া বসিল, বলিল, "পাপিষ্ঠ! এখনও তোর পাপ আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় নাই? দেখ্‌, আজ তোর কি দশা করি।"

জীবন এই কথা বলিয়া বিষম হাঁকার দিল। অমনই কালান্তক যমসদৃশ কয়েকজন দস্যু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। জীবন ইঙ্গিতে দেওয়ানকে ধরিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া চপলাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হতভাগিনীর জীবন তখনও ধুক্ ধুক্ করিতেছে; তাঁহার পুত্র পূর্ব্বেই মরিয়াছে। চপলা অতি কষ্টে বলিলেন, "আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। বাবা, ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার ও আমার পুত্রের যেন সদ্গতি হয়—" বলিতে বলিতে চপলার চক্ষু কপালে উঠিল; দুঃখিনীর কষ্টময় জীবনের অবসান হইল।

জীবন কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার মূর্ত্তি দেখিলে ভয় হয়। দেওয়ানের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া জীবন বজ্রগম্ভীরস্বরে দেওয়ানের দণ্ডের আজ্ঞা দিল। সে বিষম পৈশাচিক দণ্ডের কথা শুনিয়া দেওয়ান বালকের ন্যায় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কাতরে বলিলেন, "দোহাই জীবন! আমাকে একবারে মারিয়া ফেল, দোহাই তোমার, ক্ষমা কর।" জীবন কঠোরকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা! এই যে ক্ষমা করছি।" দেওয়ানজী চিৎকার করিয়া উঠিলেন; সে পরিত্রাহি চিৎকারে জলস্থল ভরিয়া গেল।

জীবনের আজ্ঞামত দস্যুরা দেওয়ানকে ধরিয়া রাখিল; জীবন নিষ্ঠুর বর্ব্বরের মত স্বহস্তে শাণিত অস্ত্রে তাহার নাসা ও কর্ণাগ্রভাগ এবং হস্তের দশাঙ্গুলী ছেদন করিল, পরে তাঁহার জীহ্বা কর্ত্তন করিয়া লইল। দেওয়ান জীহ্বার অভাবে বিকৃতস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে কক্ষমধ্যে বৃহৎ গহ্বর খনিত হইল; ডাকাতেরা দেওয়ানকে সেই গহ্বরমধ্যে আকণ্ঠ প্রোথিত করিয়া তাঁহার মুখে চোখে প্রতপ্ত তৈল ঢালিয়া দিল। জীবন রাক্ষসের ন্যায় প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে; তাহার হৃদয়ে তখন দয়া মমতা নাই,

সে তখন যথার্থই নরপিশাচ। হতভাগ্য দেওয়ানের সে অবস্থা বর্ণনা করিতেও দুঃখ হয়।

জীবন দেওয়ানের সেই অবস্থা দেখিয়া মনে দারুণ তৃপ্তি অনুভব করিল, বলিল, "পামর! ধনমদে মত্ত হয়ে পাষাণ রাক্ষসের ন্যায় তুই অসহায়া অবলার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিলি, কেমন তার প্রতিফল?"

যন্ত্রণায় দেওয়ানের দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, কিন্তু সে যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই।

তৎপরে জীবনের আজ্ঞায় ডাকাতেরা একজন পশ্চিমা তেওয়ারী ব্রাহ্মণ ডাকাতকে হাজির করিল। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে ফৌজে কাজ করিত। একজন সৈনিককে ক্রোধের বশে হত্যা করিয়া এই তেওয়ারী ঠাকুর সৈন্যদল ছাড়িয়া পলায়ন করে ও পরে ডাকাতের দলে প্রবেশ করে। জীবন তাহাকে চপলা ও চপলার পুত্রের মুখ-অগ্নি করিতে আজ্ঞা করিল। সে প্রথমে অস্বীকার করিল; শেষে জীবনের মূর্ত্তি দেখিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিল, সে জীবনকে চিনিত।

কক্ষমধ্যেই চিতা ধূধূ জ্বলিয়া উঠিল, ধূমে কক্ষ আচ্ছন্ন হইল। ডাকাতেরা চলিয়া গিয়াছে; সম্মুখে চপলার চিতা জ্বলিতেছে, আর সেই ধূমসমাকুল কক্ষে অক্ষম অকর্ম্মণ্য অবস্থায় বিকলাঙ্গ বীভৎসমূর্ত্তি দেওয়ান কালীদত্ত অথবা নন্দগোপাল আকণ্ঠ প্রোথিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বৈষ্ণবীর মনোবল।

"আর কত দূর ?"

"এই যে, আর অল্প পথ।"

"এ কাঁটাবনে আর চলিতে পারি না।"

"আর একটু দুঃখভোগ কর। এতটা পথ জঙ্গল জলা ভেঙ্গে এলে, আর একটু কাঁটাবনের কষ্টও ভোগ করতে হবে।"

"বাবা ভূতনাথ! তোমাদের সর্দ্দার কি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে ?"

"হাঁ গো হাঁ। কতবার বল্‌বো ? সব কথা জানাবার তরেই তো হেথায় তোমার তলব পড়েছে।"

ডাঁসার জঙ্গলে দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি চলিয়াছে; একটী পুরুষ অপরটী রমণী। জ্যোৎস্নালোক লক্ষ্য করিয়া ইহারা বেতনা নদীতীরাভিমুখে চলিয়াছে। ডাঁসার জলা ও জঙ্গল টাকী-হোসেনাবাদের সন্নিকটে; বেতনা লবণাক্ত নদী; এই নদীর সহিত যুক্ত হইয়াই ইচ্ছামতীর সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেতনার তীরে উপস্থিত হইয়া পুরুষ পান্থ এক বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষমূলে উপবেশন করিল ও অনুসরণকারিণী রমণীকে বসিতে বলিল। রমণী কিছু দূরে নদীতটে উচ্চ ভূখণ্ডে আসন গ্রহণ করিল।

পুরুষপান্থ আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ভূতনাথ বাগ্দী বা ভূতো ডাকাত; রমণী দীননাথ পোদের কন্যা তারা অথবা জীবন সর্দ্দারের পত্নী বৈষ্ণবী। রাত্রিকালে একাকিনী যুবতী রমণী পরপুরুষের সঙ্গে এই জনমানবশূন্য অজানা অচেনা দুর্গম স্থানে কেন ?

ভূতনাথ ক্লান্তি দূর করিতে করিতে বলিল, "এইখানেই সর্দ্দার আমাদের অপেক্ষা করুতে বলেছে। ঐ ওপারে শুলকুনির নূতন আড্ডা, সর্দ্দার এখন ঐখানে পালিয়ে আছে।"

বৈষ্ণবী সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "কেন, তোমাদের ঘুঘুড়ির আড্ডার কি হ'ল? লোকের মুখে শুন্‌ছি, কোম্পানী সে আড্ডা ভেঙ্গে দিয়েছে।"

ভূত। সেই সব কথা বল্‌বার জন্যই তোমায় হেথা আনা হয়েছে।

বৈষ্ণবী। সব কথা খুলে বল।

ভূত। সর্দ্দার এসে সব বল্‌বে। আমি সব জানি না।

বৈষ্ণবী। যা জান তাই বল।

ভূত। আমাদের হাতে সোনাদানার কুঠির' সাহেবের অপমানের কথা মনে আছে ত? সেই দিন হ'তে কোম্পানী খেপেছে, দলে দলে ফৌজ পাঠিয়েছে। সর্দ্দার দেগঙ্গায় দারোগার জীব কেটে দিয়েছে; তার পর দুটো ডাকাতি হয়েছে; শেষ দেওয়ানের বাড়ীর ডাকাতির পর কোম্পানীর ফৌজ ঘুঘুড়ীর জঙ্গল ঘেরাও করে ফেল্লে; তোপের মুখে জঙ্গল সাফ করতে লাগল; শেষে ঘরসন্ধানি লোকে পথ জানিয়ে দিলে; তখন জঙ্গল ছেড়ে পালাতে হল।

বৈষ্ণবী। লোকজন সব কোথা গেল?

ভূত। জান তো আমাদের দলে মোট হাজার লোক। লোকে বলে দশ বিশ হাজার, ও সব মিথ্যা কথা। তার মধ্যে জঙ্গলে থাকে দু'শ; আর কাজের সময় গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দিয়ে, লোক জোটান হয়। কোম্পানীর তোপের ডাকে গাঁয়ের লোক গাঁয়েই রইল, জঙ্গলের কতক লোক দল ছেড়ে পালাল, কতক মর্‌ল, কতক ধরা পড়ল, বাকি জন কুড়ি পঁচিশ লোক সর্দ্দারের সঙ্গে শুলকুনির আবাদে লুকিয়ে রইল। সেখানে এখন ছোট আড্ডা হয়েছে।

বৈষ্ণবী। ঘুঘুড়ির আড্ডার কি হল?

ভূত। ঘরসন্ধানী পথ দেখিয়ে দিলে; কোম্পানীর ফৌজ আড্ডার ঘর দুয়ার ভেঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে, জঙ্গলও আগুণ ধরিয়ে, তোপ দেগে, কেটে কুটে অনেক সাফ করে ফেল্লে।

বৈষ্ণবী। মায়ের মন্দিরের কি হ'ল?

ভূত। শুনেছি, মন্দিরটী ভাঙ্গে নাই, তবে মায়ের গায়ের মানুষের হাত মাথায় গহনা খুলে ফেলে দিয়েছে, মন্দির সাফ করেছে, আর পাশের রক্তের পুকুরও সাফ করে ফেলেছে। সেখানে কয় ঘর কামার কুমার, চাষা পোদ প্রজা বসিয়েছে, একটা পুলীশ ফাঁড়িও বসিয়ে দিয়েছে।

বৈষ্ণবী। তোমরা এখন তবে কি কর্‌বে?

ভূত। আমার কথা আমি বল্‌ছি। সর্দ্দার কি কর্‌বে, সর্দ্দারই জানে। তবে শুনেছি, সর্দ্দার ডাকাতিই কর্‌বে।

বৈষ্ণবী। দল কই, তার ডাকাতি কর্‌বে?

ভূত। ঐ দুঃখেই তো দল ছেড়ে দিচ্ছি। নইলে ভূতো বাগ্দী লাঠি ছাড়ে!

বৈষ্ণবী। সে কি, ভূত্‌নাথ! তুমি কি সর্দ্দারকে এই বিপদে ছেড়ে যাবে?

ভূত। না ছেড়ে করি কি? আমি কি ছাড়ছি, পেয়াদায় ছাড়াচ্চে। প্রাণটা বজায় রাখতে হবে তো।

বৈষ্ণবী। ভূতনাথ, কি বল্‌ছ? তুমি কি সেই ভূতনাথ? তুমি তো আজ একবারও আমায় মা বল্লে না।

ভূত। না, তা বলিনি; কারণ আছে। আমার মতলব, আর বনে বনে তাড়া খেয়ে পশুর মত ঘুরে বেড়াব না। আর ছুটোছুটি লুকোচুরি করতে পারি না। দুটো দিন ঘর করে মনের সুখে নিশ্চিন্ত থাকি। এখন কেবল একটা মনের মত মানুষের দরকার।

ভূতনাথ এই কথা বলিয়া বৈষ্ণবীর পানে আড়নয়নে চাহিয়া ফিক ফিক হাসিতে লাগিল। বৈষ্ণবী তাহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত; তাহার সে ভাব তাহার ভাল বোধ হইল না। সে বলিল,

"তা বেশ তো। ঘর করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে কর। এখন রাত বেশী হ'ল, সর্দ্দারকে খবর দিবার কি হবে?"

ভূতনাথ মুচকি হাসিয়া বলিল, "আর সর্দ্দারের খোঁজে দরকার কি? সর্দ্দার ত এখন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। তুমি কেন কষ্ট পাবে? আমার কাছে থাক, কোনও ভয় থাকবে না।"

বৈষ্ণবী এতক্ষণে ভূতোর মতলব বুঝিতে পারিল। যে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছে, তাহার এই ব্যবহার! তবে বনের পশুর নিকট ইহা অপেক্ষা ভাল আচরণ আর কি আশা করা যাইতে পারে? সেই বিকটাকৃতি ভূতো বাগ্দীর গোল গোল চক্ষু দুটা ঘুরিতেছে, সে সেই বিকট চক্ষুতে লোলুপদৃষ্টিতে বৈষ্ণবীর পানে চাহিতেছে। দারুণ ঘৃণায় বৈষ্ণবীর সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, "এই জন্যই কি আমায় এখানে আনিয়াছ?"

ভূত। তা নয় তো কি? এখন সব বুঝলে ত? তোমার বড় বুদ্ধি, সব বুঝেছ; এখন আমার সঙ্গে চল, আমি বসন্তপুরে ঘর বেঁধে তোমায় নিয়ে সংসার করবো।

বৈষ্ণবী। বটে? সব ঠিক করে ফেলেছো দেখছি যে! এখন কেবল আমি গেলেই হয়।

ভূতনাথ ভাবিয়াছিল, বৈষ্ণবী ভয় পাইয়া তাহার নিকট কাকুতি মিনতি করিবে। কিন্তু দেখিল সব বিপরীত। বৈষ্ণবীর দৃঢ় মনের বল ও সাহস দেখিয়া সে নিজেই ভয় পাইল। ভয় দেখাইবার জন্য বলিল, "কথা কাটাকাটিই কর, আর যাহাই কর, আর উপায় নাই। আমরা মুক্খু লোক, কথার মারপেঁচ জানি না। তবে এটা ঠিক জানি যে, তুমি আমার হাতে যখন পড়েছ, তখন আর নিস্তার নাই। এই বন, রাত হয়েছে, কেউ কোথাও নাই, এখানে যখন তোমায় এনেছি, তখন আর রক্ষা নাই।"

বৈষ্ণবী কেবল বলিল, "তারপর ?"

ভূত। তার পর আর কি ? ভালয় ভালয় সঙ্গে চল ভাল, না হলে জোর করবো।

বৈষ্ণবী। তবে জোর করেই দেখ। আমায় চেন তো ? আমি বৈষ্ণবী।

ভূত। তোমায় খুব চিনি। তাই জন্যই তো অনেক দিনের পর সুবিধা পেয়ে মনের বাসনা পুরাতে এনেছি। এতদিন কেবল সর্দ্দারের ভয়ে তোমার হুকুম মেনে এসেছি। এখন আমার পালা।

বৈষ্ণবী। আচ্ছা, কার পালা বুঝা যাবে। আমি জীবন সর্দ্দারের——খবরদার, গায়ে হাত দিস্ না।

সিংহী গর্জ্জিয়া উঠিল। বৈষ্ণবীর সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠিল, ক্রোধে নয়নযুগল আরক্ত হইল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল। ভূতনাথ ভয়ে দুই হস্ত পিছাইয়া গেল। পরক্ষণেই সে ভাবিল, "ছি ছি! মেয়েমানুষের মুখের দাবড়ীতে এত ভয়! না, আর দয়া করবো না। দেখি ওকে কে রাখে।"

ভূতনাথ আবার বৈষ্ণবীকে ধরিতে অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ বৈষ্ণবী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে শাণিত অস্ত্র নির্গত করিল; জ্যোৎস্না-লোকে অস্ত্র ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ভূতনাথ লম্ফ দিয়া দশহস্ত দূরে সরিয়া পড়িল।

বৈষ্ণবী অবিচলিত অকম্পিত স্বরে বলিল, "আমার দিকে অগ্রসর হইলে এই শাণিত ছুরিকা বুকে বসাইয়া দিব। তোর প্রাণের মায়া আছে, কেন প্রাণ হারাইবি ? এখন চল, আমায় পথ দেখাইয়া ঘরে লইয়া চল।"

ভূতনাথ। না, না। আর আমি কিছুই করবো না। আমার ভুল হয়েছিল। তুমি ঐখানে বস, এখনই সর্দ্দার আসবে।

বৈষ্ণবী। তোর সব কথা মিথ্যা। চল্, পথ দেখাইয়া চল্। না হইলে—

মুখের কথা মুখেই রহিল। দুর্ব্বৃত্ত ভূতনাথ চক্ষের নিমিষে ছুরিকার উপর লাঠি চালাইল, এক আঘাতে অস্ত্র বৈষ্ণবীর হস্তভ্রষ্ট হইয়া বিশ হস্ত দূরে পতিত হইল। বৈষ্ণবীর বিস্ময় অপসারিত হইতে না হইতে ভূতনাথ এক লম্ফে তাহার সম্মুখে আসিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "এইবার, এইবার কিঁ হ'বে। আর তো জারিজুরি খাটবে না।" এই কথা বলিয়া ভূতনাথ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেল।

চক্ষের নিমিষে অতি সহজে অতি সুন্দর কৌশলে বৈষ্ণবী ভূতনাথের মুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইয়া লইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নদীর কূলে অবতরণ করিতে লাগিল। ভূতনাথ বাহু প্রসারণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সর্ব্বনাশ! বৈষ্ণবী, জলে নেমো না; নিশ্চয় মর্‌বে; জলে ভয়ানক কুমীর।"

ভূতনাথের কথা আকাশে মিলাইতে না মিলাইতে বৈষ্ণবী নদীর জলে ঝম্পপ্রদান করিল; বায়ুতাড়িত নদীতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বৈষ্ণবীর দেহ কোথায় চলিয়া গেল।

অগ্নিকাণ্ড।

ধূ ধূ ধূ ধূ আগুন জ্বলিতেছে। ঐ যে শত সহস্র সর্প-জীহ্বার ন্যায় প্রচণ্ড অনল-শিখা লক্ লক্ লোল-রসনা বহির্গত করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে আসিতেছে; ঐ যে অগ্নিসখা মারুতের সহায়ে অনলশিখা সর্পেরই ন্যায় ফোঁস ফোঁস গর্জ্জিয়া উঠিতেছে, ঐ যে দাউ দাউ দপ্ দপ্ ধূ ধূ শব্দ; ঐ যে আলোক-রাগে দশদিক রঞ্জিত, উদ্ভাসিত; ঐ যে

রাশি রাশি ধূমে গগণ ছাইয়া গিয়াছে; ঐ যে চট্‌চট্‌, পট্‌পট্‌ কাঠ ফাটিতেছে, ঐ যে দুমদাম ধুপধাপ দ্রব্যাদি বিক্ষিপ্ত হইতেছে, ঐ যে শোঁ শোঁ, কোঁ কোঁ বায়ু গর্জ্জিতেছে, ঐ যে অগ্নির তেজ হু হু বাড়িতেছে।

ডাকাতেরা দেওয়ানের গৃহে আগুন লাগাইয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া রোশনাই করিয়া নাচিতে নাচিতে ফিরিয়াছে। গ্রামের লোকে সভয়ে দেখিল,—সর্ব্বপ্রথমে মশাল হস্তে বিশজন লোক, তাহাদের পশ্চাতে বিশজন তিরন্দাজ ডাকাত, তাঁহাদের পশ্চাতে ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, জগঝম্প, ডমরু, সানাই ও বাঁশীবাজনদারের দল, তাহার পশ্চাতে চল্লিশজন লাঠিয়াল ও সড়কিয়াল, তাহাদের পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে জীবন সর্দ্দার, তাহার পশ্চাতে একশতজন লাঠি ও কৃপাণধারী ডাকাত, তাহার পশ্চাতে আতসবাজীওয়ালা বিশজন দস্যু। জীবন মাঝে মাঝে হাঁকিয়া বলিতেছে, "খবরদার, হুঁসিয়ার, ডাইনে বাঁয়ে হেলিস না, বোসের পাড়া যাবি না।" ক্রমে ক্রমে ডাকাতের দল অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন গ্রামবাসীরা একে একে কোটরের বাহির হইতে লাগিল। অবশ্য তাহাদের যে সাহস বা বলের অভাব ছিল, তাহা নহে প্রথমতঃ দেওয়ান এই ডাকাতির কথা পূর্ব্বাহ্নে কাহাকেও জানান নাই। তাহা হইলে তাহারা মুসলমানপাড়া, মুচিপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কাওরাপাড়া প্রভৃতি সকল পাড়ায় খবর দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের সে অবসর হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ দর্পনারায়ণ গ্রামে নাই, তিনিই মাথা, কাজেই মাথার অভাবে বুদ্ধি যোগায় কে? তৃতীয়তঃ দেওয়ানের উপর কেহ সন্তুষ্ট ছিল না। উহাঁর ব্যবহারে সকলেই উহাঁকে দেখিতে পারিত না, কাজেই উহাঁর বাটী ডাকাতি হইল বলিয়া কাহারও কষ্ট হইল না, কেহ সাহায্য করিতে বাহির

হইল না। তবে দর্পনারায়ণ গ্রামে থাকিলে কি হইত বলা যায় না। চূড়ামণি ঠাকুরও সেই দিন গ্রামান্তরে কুটুম্বগৃহে গিয়াছিলেন। তিনি থাকিলেও কিছু না কিছু হইত।

যাহা হউক, গ্রামবাসীরা বাহির হইয়া সবিস্ময়ে দেখিল, দেওয়ানের বাটী ধূ ধূ জ্বলিতেছে; তখন ঘড়া-কলসী যে যাহা পাইল, তাহা লইয়া সেইদিকে ছুটিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, বড় ছোট নাই, হিন্দু মুসলমান নাই,—জাতিভেদ নাই, বিচার নাই, সকলে সমান সাহায্য করিতেছে। বাগোড় হইতে জল উঠিতেছে, হাতাহাতি জল আগুনের কাছে চলিয়া যাইতেছে, কেবল "আন জল, দাও জল, ঢাল জল, নাও ভাই, ধর ভাই, দাও ভাই" রব। আহা হা, সে কি দৃশ্য! বঙ্গের পল্লিজীবনের কি মধুর ভ্রাতৃভাব!

নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের জননী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আজ মহা উদ্বিগ্ন। ডাকাতির কথা শুনিয়া অবধি তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উপায় নাই। কর্ত্তা গৃহে নাই, নিরঞ্জন শয্যাগত, গৃহিণী পুত্রকে লইয়াই ব্যস্ত, কি উপায় হইবে! চোখের সম্মুখে একজন গ্রামবাসীর সর্ব্বনাশ হইতেছে, অথচ প্রতিকারের উপায় নাই, ভগবান একি সমস্যায় ফেলিলে! অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আদেশে বেতনভুক কর্ম্মচারীরা একবার কয়েকজন পাইক ও লাঠিয়াল লইয়া অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু ঘাঁটির বহর দেখিয়াই পিছাইয়া আসিলেন। নিরঞ্জন শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল,—"মা! একবার যাই, দেখি যদি তাদের প্রাণটাও বাঁচাতে পারি।" নিরঞ্জন উঠিতে গেল, কিন্তু টলিয়া পড়িল। জননী অন্নপূর্ণা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন, "বাবা! আমার কি অসাধ যে বিপন্নের সাহায্য কর? কিন্তু কি করবে বাবা, তোমার শক্তিতে কুলালে তো!"

যখন দেওয়ানের বাটীতে ধূ ধূ আগুন জ্বলিয়া উঠিল, যখন আগুনের আলোকে চারিদিক ছাইয়া গেল, তখন নিরঞ্জন আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। জননী আপনার মন দিয়া পুত্রের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। নিরঞ্জন ব্যাকুল হইয়া বলিল, "মা, একবার দেখে আসি। ঘরে বসে আমার প্রাণ হাঁপাচ্ছে। আহা, তাদের এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশই না হচ্ছে!"

নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই ক্ষীণ রুগ্ন দেহ কিন্তু এবার টলিল না। কি এক অভিনব শক্তিতে সে যেন অনুপ্রাণিত। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসিল, "মা, অনুমতি দিন, যাই।" অন্নপূর্ণার বুক গুরু-গুরু কাঁপিয়া উঠিল, চোখের জল চোখেই চাপিয়া ধীরগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এস, বাবা, এস; মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল করবেন।" নিরঞ্জনের শীর্ণ মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, সে জননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ সে চক্ষের অন্তরাল না হইল, ততক্ষণ অন্নপূর্ণা তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ভাবিলেন, "এঁ্যা, কি কর্‌লাম, রোগা ছেলেকে আগুনের মুখে পাঠালাম! তিনি এসে কি বলবেন্! না না, তিনি তো তেমন নন। আমার মন নীচ, তাই ঐ কথা ভাবছি। ঠাকুর মহাশয়ের মুখে শুনেছি, কুন্তী নিশ্চয় মৃত্যু জেনেও বিপন্নকে রক্ষা করতে ছেলেকে রাক্ষসের মুখে পাঠিয়েছিলেন; তিনি দেবতা, আমরা মানুষ,—তাই কেঁদে মরি। মা সর্ব্বমঙ্গলার মনে যা আছে তাই হবে।"

নিরঞ্জন গৃহের বাহির হইয়াই দৌড়াইল। রুগ্ন শীর্ণ দেহে এত বল কোথা হইতে আসিল? তাহার রোগক্লিষ্ট শরীরে যেন নবজীবনী-শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। আজ মাত্র দুই তিন দিন নিরঞ্জন পথ্য করিয়াছে; মানমণ্ড, মুসুরির ঝোল, দুগ্ধ ইত্যাদি তাহার আহার; ঘরের মধ্যে ও দালানে সে দুই এক পা হাঁটিয়া বেড়ায়, এখনও

হাঁটুতে সম্পূর্ণ বল পায় নাই, অথচ আজ এই নূতন বল কোথা হইতে আসিল?

নিরঞ্জন দৌড়াইয়াছে, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আজ্ঞায় তাহার পশ্চাতে চারি পাঁচজন অনুচর আলোক লইয়া ছুটিতেছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া নিরঞ্জন দেখিল, বিষম হট্টগোল, কে কাহার কথা শুনে, কে কাহাকে দেখে! সকলেই অগ্নিনির্ব্বাণে ব্যস্ত, কিন্তু ঘরের মধ্যে মানুষ পুড়িয়া মরে, তাহাদের উদ্ধারের উপায়ে কেহই মনোযোগ দেয় নাই। মেজকর্ত্তা নিরঞ্জনকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "একি, তুই এখানে কেন? এমন গোঁয়ার ছেলেও তো কোথাও দেখি নাই। যা যা, বাড়ী যা।" তাঁহার মুখে মিষ্ট কথা প্রায় শুনা যাইত না।

অন্য সময় হইলে নিরঞ্জন ঘাড় পাতিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিত। কিন্তু এখন তাহার কোনও দিকে নজর নাই, কিসে গৃহমধ্যস্থিত ব্যক্তিগণকে অগ্নির মুখ হইতে উদ্ধার করিবে, ইহাই এখন তাহার ভাবনা।

নিরঞ্জন কোনওদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বেগে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিল। চারিদিক হইতে সকলে "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিল; অনেকে বলিল, "গৃহে কেহ নাই; নিশ্চয়ই দেওয়ান সকলকে লইয়া পলাইয়াছে; যেওনা, যেওনা।" কিন্তু সে এরূপ অতর্কিত-ভাবে গৃহে প্রবেশ করিল যে, কেহই তাহাকে বাধা দিবার অবসর পাইল না। তখন অনেকেই তাহার অনুগমন করিল, তাহাকে সকলে আন্তরিক ভালবাসিত।

সেই জ্বলন্ত অঙ্গাররাশির মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য? চারিদিকে আগুন লক্ লক্ করিতেছে, হুহু উত্তপ্ত বায়ু বহিতেছে, ধূমে চক্ষু অন্ধ করিয়া দিতেছে, অগ্নির উত্তাপে অঙ্গ ঝলসিয়া দিতেছে, প্রতি

পদবিক্ষেপে অগ্নিকণা পদতল দগ্ধ করিতেছে, চটাপট কাঠ ফাটিতেছে, দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড অঙ্গের উপর বিক্ষিপ্ত হইতেছে। সেই প্রচণ্ড অনলরাশি দলিত মথিত করিয়া নিরঞ্জন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। নিরঞ্জনের কপোল, চক্ষু ও ললাটের সম্মুখে দুরন্ত অনল কুণ্ডলী করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে ; মস্তকের উপরে প্রচণ্ড অনলশিখা ফোস ফোস গর্জ্জিতেছে, কর্ণকুহরে হাহা হুহু বিদ্রূপ-বাণী বর্ষণ করিতেছে, ভীষণ লোলরসনা বিকাশ করিয়া সর্ব্বশরীর গ্রাস করিতে আসিতেছে।

কোনওদিকে নিরঞ্জনের ভ্রূক্ষেপ নাই, সে লম্ফ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। তাহার অনুচরেরা অগ্নির উত্তাপে অগ্রসর হইতে পারিল না। সে একাই দালান পার হইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন, চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রু ঝরিতেছে, নিরঞ্জন প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না, সে কেবল চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো তোমরা কে কোথায় আছ, শীঘ্র বাহির হইয়া এস"। কোনও সাড়া নাই, কেবল একটা অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ শ্রুত হইল। তখন নিরঞ্জন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। আলোকে চারিদিক দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আলোকে নিরঞ্জন দেখিল, কক্ষের ছাদ পুড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; আর যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে কক্ষের মধ্যস্থলে আকণ্ঠপ্রোথিত এক বিকলাঙ্গ বিকট বীভৎস মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির সম্মুখে চিতানলে দুইটী অর্দ্ধদগ্ধ দেহ জ্বলিতেছে ; মূর্ত্তির মাথার উপর দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডাদি পড়িতেছে, আর সেই বীভৎস মূর্ত্তি রহিয়া রহিয়া ভীষণ যন্ত্রণাজড়িত অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করিতেছে। এ কি দৃশ্য, ভগবান!

নিরঞ্জন অগ্রসর হইয়া দেখিল, সে মূর্ত্তি দেওয়ান কালীদত্তের, আর তাহার সম্মুখে চিতানলে চপলা ও চপলার পুত্রের দেহ ভস্মীভূত

হইতেছে। ডাকাতেরা দেওয়ানের এই শাস্তি বিধান করিয়া গিয়াছে। হা ভগবান! পাপের এ কি ভীষণ শাস্তি!

নিরঞ্জন পরীক্ষা করিয়া দেখিল, চপলা ও তাহার সন্তান মৃত, কেবল দেওয়ান তখনও জীবিত। নিরঞ্জন দেওয়ানের সম্মুখীন হইল। ওঃ! সেখানে অগ্নির উত্তাপ অতি ভয়ঙ্কর! নিরঞ্জনের অর্দ্ধাঙ্গ ঝলসিয়া গিয়াছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে দেওয়ানকে টানিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল। কিন্তু সাধ্য কি তাঁহার? সেই রুগ্ন দুর্ব্বল দেহে সেই ভূগর্ভে প্রোথিত মনুষ্যদেহ উত্তোলন করা অসম্ভব। নিরঞ্জন বারবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল। তখন সে ক্ষিপ্তের ন্যায় লম্ফ দিয়া বাহিরে অঙ্গনে আসিয়া পড়িল ও উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কে আছ, শীঘ্র খোন্তা কোদাল যাহা পাও লইয়া আইস, একজন লোক মরে, শীঘ্র এস, আর সময় নাই।"

নিরঞ্জন এই কথা বলিয়া যেমন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবে অমনই কেমন তাহার মাথা টলিয়া গেল; সে ভূতলশায়ী হইল। সকলে "হায়! হায়! কি হইল! কি হইল!" বলিয়া তাহাকে ধরিয়া অগ্নিকাণ্ডের নিকট হইতে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া গেল। সকলেই বুঝিল, রুগ্নদেহে অতিরিক্ত পরিশ্রমে অগ্নির উত্তাপে নিরঞ্জন মূর্চ্ছা গিয়াছে। সকলে তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইল। এদিকে দেখিতে দেখিতে গৃহের ছাদ ভস্মীভূত হইয়া সশব্দে পড়িয়া গেল; ধূমে চারিদিক ভরিয়া গেল। এইরূপে নন্দগোপালের পাপ-জীবনের অবসান হইল।

ভূতোর দুরভিসন্ধি।

নদীর কূলে দাঁড়াইয়া ভূতনাথ দেখিল, বৈষ্ণবীর দেহ জল-স্রোতে ভাসিয়া বহুদূরে চলিয়া গেল। সে একবার মনে করিল, "জলে ঝাঁপ দিয়া বৈষ্ণবীকে উদ্ধার করি"; পরক্ষণেই ভাবিল, "কিসের জন্য কুম্ভীরের মুখে প্রাণ দিব, মরুক না বৈষ্ণবী; প্রাণ থাকিলে অমন কত বৈষ্ণবী মিলিবে।" বাঁধের উপরে উঠিতে উঠিতে একবার সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল। যাহা দেখিল, তাহাতে সে বিস্মিত হইল। সে দেখিল, একখানি ছিপ তীরবেগে নদীস্রোতে ছুটিয়াছে; চন্দ্রকরে তাহার উপর মূর্ত্তিগুলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এ ছিপ কি আকাশ হইতে আসিল? ছিপ কিছু দূর গেল; তৎপরে থামিল, ছিপের লোকেরা নদীবক্ষ হইতে একটা দ্রব্য ছিপের উপর উত্তোলন করিল; সেই পদার্থের সমস্তই শ্বেত কেবল এক স্থান ঘন কৃষ্ণ বর্ণ। ভূতনাথ বুঝিল, ছিপের লোকে বৈষ্ণবীকে রক্ষা করিল; দূরে অস্পষ্ট আলোকে তাহার শুভ্রবস্ত্রমণ্ডিত দেহ ও গাঢ়কৃষ্ণ চিকুরজাল দেখা যাইতেছিল। ছিপের লোকে কিছুক্ষণ সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণবীর দেহ নাড়াচাড়া করিতে লাগিল; ভূতনাথ বুঝিল, বৈষ্ণবীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে ছিপ তীরবেগে ছুটিল। ভূতনাথ দেখিল, ছিপ তটাভিমুখে আসিতেছে। আর যাহা দেখিল, তাহাতে ভূতনাথের প্রাণ উড়িয়া গেল। ভূতনাথ সভয়ে দেখিল, ছিপের ঠিক মধ্যস্থলে বৈষ্ণবীর পার্শ্বে বসিয়া স্বয়ং জীবন সর্দ্দার! ভূতনাথ আর অপেক্ষা করিল না, তীরে উঠিয়া অশ্বত্থ-বৃক্ষের অন্তরে দাঁড়াইল। একবার ভাবিল,—"লাঠির ভরে জলা ও জঙ্গল পার হইয়া পলাই।" পরক্ষণে ভাবিল, "না, পলাইয়া কাজ নাই। সর্দ্দার লাঠির ভরে চলিলে পথেই আমায় ধরিবে, তখন আর নিস্তার থাকিবে না। তার চেয়ে এই গাছে চড়ে পাতার

মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকি ; ওদের পরামর্শ শুনতে পাব।” কথাও যে, কাজও সে ; ভূতনাথ তর তর করিয়া অশ্বথ-বৃক্ষে চড়িয়া বসিল। সেখানে সে পত্রান্তরালে এমন ভাবে লুকাইয়া রহিল যে, কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ভূতনাথ পত্রান্তরাল হইতে দেখিল, ছিপ তীরে লাগিল। প্রথমেই জীবন সর্দ্দার বৈষ্ণবীর হাত ধরিয়া নামিল। কুড়ি পঁচিশ জন সশস্ত্র ডাকাত জীবনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিপ হইতে অবতরণ করিল ; কেবল দুই জন ছিপে বসিয়া রহিল। জীবন তীরে উঠিয়া অশ্বথমূলে দাঁড়াইল, বৈষ্ণবী পার্শ্বে দাঁড়াইল। জীবন স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল, “বৈষ্ণবী, আর্দ্রবস্ত্রে তোমার কষ্ট হইতেছে, চল গৃহে যাই।”

বৈষ্ণবী বলিল, “না, কষ্ট কি ? আমার অভ্যাস আছে। ঘরে ফিরিতে ফিরিতে আর্দ্রবস্ত্র গায়ে শুকাইবে। তুমি বরং যাহা বলিবার এই খানেই বল। ঘরের চেয়ে এই স্থান নির্জ্জন ও নিরাপদ। এই খানে নির্জ্জন দেখে হতভাগা আমায় নিয়ে এসেছিলো।”

জীবন দন্তকিড়িমিড়ি করিয়া কহিল, “নেমকহারাম পাজী ! দুধকলা দিয়ে কাল-সাপ পুষ্‌লাম। যার খেয়ে মানুষ, তারেই ছোবলাতে যাস্। হারামজাদা ! পালিয়েছিস্ ; আরে, পালিয়ে যাবি কোথায় ? যেখানে যাস্, ঝুঁটি ধরে টেনে আনবো।” জীবন গজরাইতে লাগিল।

বৈষ্ণবী জীবনের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইল, বলিল “এখন আর ঘরে ঘরে কাটাকাটি কেন ? তোমায় ধর্‌বার্ জন্য চারি দিকে কোম্পানীর লোক ফির্‌ছে। তোমার লোকজন নাই—”

জীবন। আমার আমি এখনও আছি, জীবন সর্দ্দার বেঁচে আছে ! আমি তো যেতে বসেছি, কিন্তু যাবার আগে হারামজাদ বজ্জাতকে শিক্ষা দিয়ে যাব। কানু সর্দ্দার !

কানু যোড়হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, “সর্দ্দার !”

জীবন। "কানু, তুমি আমার ডান হাত। সব নিমকহারাম শয়তান ছেড়ে পালিয়েছে, কেবল একা তুমি কোনও লাভের আশা না থাকলেও আমায় ছাড়নি। কানু, আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি ?" কথাটা বলিবার সময় জীবনের গলা কাঁপিল।

কানু। সর্দ্দার, হুকুম দাও, কি করতে হবে। এই লাঠি ছুঁয়ে শপথ করছি, আমায় যা বল্‌বে তাই কর্‌বো, জান কবুল। সর্দ্দার! তুমি মা বাপ।

জীবনের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে একবার ভূতনাথের কথা ভাবিয়া মনে মনে উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিল; প্রকাশ্যে বলিল, "এই জলা জঙ্গলের চারিদিকে লোক পাঠাও, তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুক, ভূতোকে যে অবস্থায় পায় ধরিয়া আনয়ন করুক। সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই পলাইয়াছে, তবুও একবার খুঁজিয়া দেখ। তুমি থাক, তোমার সহিত কথা আছে।"

কানু সর্দ্দার চারি দিকে লোক পাঠাইল। সেই স্থানে তখন কেবল জীবন, কানু ও বৈষ্ণবী রহিল; আর বৃক্ষোপরি ভূতনাথ লুকাইয়া সকল কথা শুনিতে পাগিল।

জীবন বলিল, "কানু, আমি মনে করিতেছি দল ভাঙ্গিয়া দিব। এমন করিয়া চারি দিকে বনে বনে তাড়া খাইয়া তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিয়াছে। কোনও দিন আহার জুটে, কোনও দিন জুটে না; ভাল রূপ নিদ্রা তো হয়ই না। একটুকু বিশ্রাম বা আরাম লইবার যো নাই, সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। এর চেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই ঠিক। আমি ঠিক করেছি, একবারে বাঙ্গালা মুল্লুক ছেড়ে পালাবো। হয় কাশী, না হয় প্রয়াগ, না হয় বৃন্দাবন, যে কোনও তীর্থস্থানে শেষ কটা দিন কাটাবো। তুমি কি বল ?"

কানু। সর্দ্দার, তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে, আমি আর কি বল্‌বো।

জীবন। বেশ। তা হলে দেশ ছেড়ে পালানই ঠিক। কিন্তু বৈষ্ণবীকে নিয়ে ভাবনার কথা। বৈষ্ণবীকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে গেলে আমি নিশ্চয় ধরা পড়বো। অথচ বৈষ্ণবী কাহার সাহায্যে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে পারে? আমার শ্বশুর সপরিবারে যেতে পারে। কিন্তু পথে চোর ডাকাতের ভয়; কে রক্ষা করে?

কানু। কেন, আমি সঙ্গে থাক্‌বো।

জীবন সহর্ষে বলিল, "বেঁচে থাক, কানু। এক তোমাকেই আমার বিশ্বাস হয়। তুমি যদি সঙ্গে থাক তবেই সুরাহা হয়।"

কানু। কি কর্‌তে হবে বল।

জীবন। সব বল্‌ছি। দেখ, আমি একা পলাব। তোমরা নৌকায় ক'রে তীর্থযাত্রী সেজে যেয়ো। আমি ডাঙ্গাপথে গিয়ে কাশীতে তোমাদের সঙ্গে মিল্‌বো। তোমরা কাশী পৌঁছে প্রতিদিন মণিকর্ণিকায় সকালে বিকালে আমার খোঁজ ক'রো। এক দিন না এক দিন সকলে মিলিত হবো।

বৈষ্ণবী। দেখ, বাবার কাছে শুনেছি, দণ্ডীরহাটের কর্ত্তামহাশয় সপরিবারে তীর্থে যাচ্ছেন।

জীবন ভাবিল,—"ভগবান! তুমিই সত্য। এত দিন ডাকাতি করেছি, কিন্তু কখনও তোমার নাম ভুলি নি। তাই কি এই সুযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছ?" প্রকাশ্যে বলিল, "কানু, আমাদের অর্থের অভাব নাই। তুমি দুই তিন খানা নৌকা করে সমস্ত দলের লোক ও বৈষ্ণবীদের নিয়ে দণ্ডীরহাটের ছোটকর্ত্তার সঙ্গে যাবে। আমি তাঁর অন্ন খেয়েছি। তাঁর ঋণ শুধ্‌তে পার্‌বো না। তবে এই সময়ে তাঁর যা কিছু উপকার করতে পারি। তোমরা সঙ্গে পাহারা থাকলে তীর্থে

তাঁর কোনও ভয় থাকবে না। আর তাঁর সঙ্গ পেলে তোমাদেরও পালাবার উপায় হবে। ভগবান এই সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন।"

কানু। কবে যেতে হবে?

জীবন। কবে কোথায় ছোটকর্ত্তার সঙ্গে মিলতে হবে, সে খবর পরে বৈষ্ণবীর কাছে পাবে।

কানু। কেন সর্দ্দার, তুমি কি আর এক দিনও থাকবে না?

জীবন। না কানু, আমি আর একদিনও থাকবো না। আর একদিন থাকলে সকলেই ধরা পড়বো।"

কানু। কেন?

জীবন। বুঝতে পাচ্ছ না, ভুতো পালিয়েছে। সে এখন আমাদের শত্রু। সে ঘরসন্ধানি হ'লে আর কি রক্ষা থাকবে?

কানু। তবে এখন আমরা কোথায় যাব?

জীবন। তুমি একবার ছিপ নিয়ে শুলকুনির আড্ডায় যাও। যে খাঁড়িতে ছিপ লুকিয়ে বাঁধা ছিল, আর যেখান থেকে আমরা বৈষ্ণবীকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখেছি, সেই খাঁড়ির ভিতরে অনেকটা ঢুকে যাবে; সেখানে একটা প্রকাণ্ড কেওড়া গাছ দেখতে পাবে, তার চার পাশে বেত বন। সেই কেওড়া গাছের মূলদেশে মাটির নিচে একটা বড় কলসী পোতা আছে। শুলকুনির আড্ডা হতে বেছে বেছে মালপত্র আনবে, আমার সাজের পেঁটরা আনবে, আর আসবার সময় কেওড়াতলার সেই কলসীটাও আনবে। আজ রাতেই মালপত্র ও লোকজন নিয়ে হোসেনাবাদে বৈষ্ণবীর বাড়ী যেও। সেখানে গিয়ে সব ঠিক করা যাবে।

কানু। আমি এখনই চল্লাম, সর্দ্দার।

কানু সর্দ্দার ছিপে উঠিয়া ছিপ ছাড়িয়া দিল। জীবন বৈষ্ণবীর হাত দুটী দুই হস্তে ধরিয়া গভীর বিষাদ-নৈরাশ্য-জড়িতস্বরে বলিল,

"বৈষ্ণবী! লীলাখেলা সব ফুরাল। আমার তুচ্ছ প্রাণের জন্য ভাবি না। কিন্তু তোমার একি সর্ব্বনাশ কর্‌লাম! আজ বারো বৎসর বিধির নির্ব্বন্ধে তোমায় আমায় বিবাহ হইয়াছে; কেবল ভয়ে ভয়ে দুঃখে কষ্টেই কাটাইয়াছ, সুখের মুখ দেখিলে না। দেখ, আমি নীচ জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে উচ্চজাতির মত বাল্যে সুশিক্ষা পাইয়াছি, জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তোমাকেও যথাসম্ভব শিক্ষা দিয়াছি। কিন্তু কি ফল হইল? ভবিতব্যতা কে খণ্ডাইবে? কর্ম্মফলে, দারুণ অত্যাচারে, দুর্দ্দান্ত নরঘাতী দস্যু হইলাম, তুমিও দুঃখসাগরে ভাসিলে। এর চেয়ে যদি নীচ মূর্খ পোদ-সন্তানই থাকিতাম!"

বৈষ্ণবী। "কেন তুমি ও কথা বল্‌ছ? আমি তো কখনও সুখে ছাড়া দুঃখে থাকি নি। তুমিই তো শিখিয়েছ, যার স্বামী আছে, তার—"

জীবন। তার কি? বৈষ্ণবী, মুখ নামালে কেন? দেখ এই সুখেই মর্‌তে ইচ্ছা হয় না, প্রাণের মায়া হয়। সমস্ত দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে ঐ এক সুখ! বৈষ্ণবী, ভগবান এমন দিন কি দিবেন যেদিন তোমায় নিয়ে দূরদেশে শান্ত গৃহস্থের মত নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে বাস করতে পার্‌বো!

বৈষ্ণবী। কৈ, যাবার কি ঠিক কর্‌লে? আমায় তো কিছু বল্লে না।

জীবন। হাঁ। আমি মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করে রেখেছি, কেবল বল্‌তে বাকী। দেখ, আমি আজ শেষ রাত্রিতে মুসলমান ফকিরের বেশ ধরে পাণ্ডুয়ায় পলাব। সেখানে আসাদ নামে পরিচিত ফকির বাস করে। সে আমার পরম বন্ধু। সে পূর্ব্বে ডাকাতের দলে ছিল; একবার ডাকাতি করিতে গিয়া সে খঞ্জ হইয়া যায়; তদবধি ফকির সাজিয়া পাণ্ডুয়ায় আছে; ভিক্ষাই তাহার সম্বল। তাহারই আশ্রয়ে

আপাততঃ থাকিব। প্রত্যহই ত্রিবেণীতে সংবাদ লইব, দণ্ডীরহাটের তীর্থযাত্রীদের নৌবহর যমুনা বাহিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে কিনা। যেদিন শুনিব, তোমরা নিরাপদে গঙ্গা বাহিয়া যাত্রা করিয়াছ, সেই দিনই আমি স্থলপথে কাশী যাত্রা করিব।

বৈষ্ণবী। আমরা কবে কোথা হইতে যাত্রা করিব?

জীবন। সেই কথা ঠিক করিবার জন্য শ্বশুরকে লইয়া কাল প্রাতে দণ্ডীরহাটে যাইব। তাহার মুখে সকল সংবাদ পাইবে।

বৈষ্ণবী। তবে এখন চল, ঘরে যাই।

জীবন। হাঁ যাই। আচ্ছা, বেশ জান কোম্পানী তোমাদের কোনও খোঁজ পায় নাই?

বৈষ্ণবী। জানি। আমরা কোথায় আছি কেউ জানে না, কেবল তোমরা জান আর ভূতো জানে।

জীবনের সর্ব্বশরীর ক্রোধে ঘৃণায় কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, "হাঁ হাঁ, সেই হারামজাদ কুকুরবাচ্ছা জানে বটে। যদি ধর্‌তে পারি, শালার টুঁটী ছিড়ে ফেল্‌বো।"

বৈষ্ণবী। ছি, এখনও রাগ পড়্‌ল না? আর কেন? আমরা দেশ ছেড়ে তীর্থে চলে যাচ্ছি, তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কি? তার দণ্ড সে আপনিই ভোগ কর্‌বে।

জীবন। বৈষ্ণবী! রক্তমাংসের শরীর,—সহ্য কর্‌তে পারি না। আমার পায়ের তলার কুকুর! আমার—যাক্, ও কথা মনে কর্‌বো না, মনে কর্‌লে রাগে দেহ জ্বলে যায়।

বৈষ্ণবী। তবে চল।

জীবন। যাদের পাঠালেম তারা তো এলো না। বোধ হয় তারা বন তোলপাড় কর্‌ছে। চল আমরা যাই। তোমাদের ওখানেই সব খবর পাব। কিন্তু কালই ও বাসা ভাঙ্গতে হবে।

জীবন বৈষ্ণবীর হাত ধরিয়া জ্যোৎস্নালোক লক্ষ্য করিয়া চলিল। বনভূমি নিস্তব্ধ হইল। ভূতনাথ তখনও বৃক্ষোপরি বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ অতীত হইল, ভূতনাথ তখনও নিশ্চল, নিস্তব্ধ। ক্রমে একে একে ডাকাতেরা ফিরিয়া আসিল। সকলেই বৃক্ষতলে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। প্রায় মধ্যরাত্রে কানু সর্দ্দার মালপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। সে হুকুম দিল, "দেখ, আজ রাত্রি ভোর এই জলা ও জঙ্গল পাহারা দে। ভূতো শালা বড় পালিয়েছে। কিন্তু যদি ফিরে আসে, শালাকে যেমন করে পারিস ধর্‌বি, শালা আমাদের বাসা ভাঙ্গছে। এই নদীর পাড়ে গাছতলায় চারজন থাক্, আর এদিক ওদিক চারি-দিকে চারিয়ে থাক। সকাল অবধি থাকবি। আমি সকালে আস্‌বো। চল্, আমার সঙ্গে মাল নিয়ে দুইজন চল।"

কানু মালপত্র লইয়া চলিয়া গেল। ডাকাতেরা চারিদিকে চলিয়া গেল, কেবল চারিজন বৃক্ষতলে রহিল। ক্রমে গভীর রাত্রি হইল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ডাকাতেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ হইল, একে একে সকলেই অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল। ভূতনাথ বুঝিল, এই উত্তম অবসর। তখন সে নিঃশব্দে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল ও ধীরে ধীরে নদীর জলে নামিতে লাগিল। ছিপ তীরেই বাঁধা ছিল, ছিপে কেহই নাই। ভূতনাথ এক লম্ফে ছিপে উঠিয়াই ছিপ খুলিয়া দিল।

ছিপ তীর ছাড়িয়া গভীর জলে আসিলে পর ভূতনাথ তীরের দিকে দৃঢ়মুষ্টি আস্ফালন করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া সদম্ভে বলিল, "শালা জীবনে! এইবার কে কার টুঁটী ছিঁড়ে দেখা যাবে। তোর পেঁড়োর ফকিরি যদি না ঘুচুই, তো বাগ্দীর বেটা নই।"

তীর্থ-যাত্রা।

দণ্ডীরহাটের বড় বাড়ীতে তীর্থ-যাত্রার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ছোটকর্ত্তা চূড়ামণি মহাশয়কে দিয়া দিন দেখাইয়াছেন। আর কয়েক দিন পরেই কর্ত্তা যাত্রা করিবেন। উদ্যোগ আয়োজনের ঘটা ইতি-মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। কুড়িখানি নৌকা একত্র যাইবে। তখনকার কালে, স্থলেই কি, আর জলেই কি, বিদেশ যাত্রা বড় নিরাপদ ছিল না। যাত্রীরা সংখ্যায় অধিক না হইলে, অথবা সঙ্গে সশস্ত্র বলবান রক্ষক না থাকিলে, দূরদেশে যাইত না। অনেকে যাইবার পূর্ব্বে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও বিষয় সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত করিয়া বিদেশে যাইত। সঙ্গতিপন্ন লোক জলপথে যাইত; জলপথে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সুখকর ছিল। স্থলপথে নিঃস্ব অবস্থাহীন লোকে যাইত; স্থলপথে বড় কষ্ট ছিল। দর্পনারায়ণ বসু দশজন বাছা বাছা লেঠেল পাইক সংগ্রহ করিলেন; তাহারা প্রত্যেকে একশত জনের মহড়া লইতে পারে। এতদ্ব্যতীত লোক লস্করও হইবে জন দশ।

বসুজা মহাশয় নিজে যাইতেছেন; সঙ্গে যাইতেছেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী, পুত্র নিরঞ্জন, এক জেঠাই, দুই খুড়ী, দুই পিসী, এক মাসী, দাদাঠাকুর, দুইটী জ্ঞাতি, একটী কুটুম্ব, একজন মুহুরী, আর যাইতেছে রামহরি, নরহরি ও হরিমতী। হরিমতী কিছুতেই ছাড়িল না, সে অন্নপূর্ণাঠাকুরাণীর পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া মাথা কুটিতে লাগিল; তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার কথা কেহ এড়াইতে পারিল না। রামহরিও আর দেশে বাস করিতে চাহিল না, সেও সঙ্গে যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিল। ইহা ছাড়া বহুস্থান হইতে অমুকের অমুককে লইয়া যাইতে "নারাণের" উপর আদেশ উপরোধ

ও অনুরোধ আসিয়াছে; হৈমবতীর ননদের সেজ ভাজের বড় মাসীর পিসীত ভগ্নীর "মণিকর্ন্নিকের সময়" হয়েছে, তাঁকে নিয়ে যেতে হবে; ব্রজর বড় শালীর মেজ নন্দায়ের বোন-পো-বোয়ের সতীন ঝির বড় মাসী তীর্থে যাবেন, তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। বড় বড় সুপারিশ, বড় বড় অনুরোধ,—এড়ান বড় সোজা কথা নহে। বসুজা মহাশয় যতদূর সম্ভব এই সকল আবদার অভিমান মানিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী বাড়ী বাড়ী গিন্নীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পায়ের ধূলা ও আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন; বসুজা মহাশয়ও আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও প্রত্যেক পল্লবাসী ইতর ভদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নাজীর গাজী কাঁদিয়াই আকুল; "কর্ত্তামশাই, আর তোঙ্গারে দেখ্‌তি পাবো না; মুই আর কডা দিনই বা আছি,"—এই কথা বলে, আর বুড়ো ভেউ ভেউ কাঁদে। গ্রামের আপামর সাধারণ লোকে বলিতে লাগিল, গ্রামের লক্ষ্মী-নারায়ণ চলে যাচ্ছেন, গ্রামের মঙ্গল হবে না। দর্পনারায়ণ সকলকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কেবল পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্যই বিদেশ-যাত্রা, পুত্র আরোগ্যলাভ করিলেই ফিরিয়া আসিবেন। মেজকর্ত্তা, সেজকর্ত্তা, মিত্রজা, স্বয়ং চূড়ামণি মহাশয় প্রভৃতি সকলেই রহিলেন।" সকলেই কিন্তু মুখভার করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী যাত্রার জন্য ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল বস্ত্রেন্ধন গুছাইয়া রাখিতেছেন, কর্ত্তা গ্রামে দেখা সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, নিরঞ্জন আজ এই প্রথম যষ্ঠির উপর ভর দিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিয়াছে। এখনও সে অন্ন পথ্য করে নাই বটে, তবে তাহার জ্বরত্যাগ হইয়াছে, শরীরেও সে একটু বল পাইয়াছে।

নিরঞ্জন বৈটকখানায় বসিয়া মুহুরীদের সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময় দাদাঠাকুর মহা গরম হইয়া সেখানে উপস্থিত। নিরঞ্জনকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "বলি ব্যাপারখানা কি? একি নবাবদের বেগম মহল? যেখানে যত মেয়েমানুষ আছে সব এনে ঘরে পুরেছো?"

নিরঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে, দাদাঠাকুর? কার কথা বল্‌ছ?"

দাদাঠাকুর বলিলেম, "কার কথা বল্‌বো আবার? এমন কীর্ত্তি আর কার? ছোটকর্ত্তার!"

মুহুরীরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসিল, "কি বল্‌ছো, দাদাঠাকুর?"

দাদাঠাকুর হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "বল্‌বো কি আর মাথা মুণ্ড, যাচ্ছেন ছেলের অসুখ সারাতে, তা সঙ্গে পাল পাঁচ ছয় মেয়ে-মানুষ কেন?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "এই কথা! তাতে হলো কি?"

দাদাঠাকুর বিষম রাগিয়া বলিলেন, "হলো কি? আবার হবে কি? তার চেয়ে সোঁদর বনের দু দশ কুড়ি বাঘ নিয়ে গেল না কেন? আমি ওসব ঝঞ্ঝাট সামলাতে পার্‌বো না।"

নিরঞ্জন হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা, ঝঞ্ঝাটটা কি?"

দাদাঠাকুর। এইরে, ছোঁড়ার অসুখে মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে দেখ্‌ছি। ওরে, ও জাতকে চিন্‌লি নি। জাত কেউটে রে, জাত কেউটে! দেখ্‌লিনি, ঐ মেয়েমানুষ হতেই সেনেদের অমন সোনার সংসারটা ছারখার হয়ে গেল, দেওয়ান বেটা সবংশে ম'ল, দীনে বেটা দেশ ছেড়ে পালালো! বাবা, ও রাক্ষুসে জাত!

বৃদ্ধ মুহুরী প্রসন্ন থাকিতে পারিলেন না; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দাদাঠাকুর, ও জাত না থাকলে আপনি হতেন কি করে?"

দাদাঠাকুর। কেন, ব্রহ্মার কি মানসপুত্র ছিল না? ভগবান করেন, কেবল মানসপুত্র হয়!

নিরঞ্জন একটু গম্ভীরস্বরে বলিল, "অমন কথা বোলো না, দাদাঠাকুর। ঠাকুর মহাশয়ের মুখে শুনেছি, স্ত্রী শক্তির অংশ।"

দাদাঠাকুর। শক্তির অংশ না মাথা! বেটীরা বাঘিনী।

নিরঞ্জন। ঐ বাঘিনী না হলেও তো সংসার চলে না। এমন দয়া, মায়া, ধর্ম্মজ্ঞান কার আছে? এমন পর-সেবা করতে, পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে, কে পারে? আপনভোলা হয়ে এমন পরে মিশতে কে পারে?

দাদা। এঃ, কবি চণ্ডীদাস আর কি! ভাবে যে গলে পড়লি! তবুও এখনও শয্যার সাথী আসে নি!

নির। পত্নী ভিন্ন কি অন্য স্ত্রীলোকের সুখ্যাতি করতে নাই? এই যে আমার মা জননী; এমন করে প্রাণ দিয়ে সেবা করতে কে পারে?

নিরঞ্জনের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল; পীড়ার সময় জননীর অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার কথা তাহার মনে পড়িল। দাদাঠাকুর সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "নাও কথা; আবার তাঁর কথা আন্‌লি কেন? হচ্ছিল মাগীদের কথা। তিনি কি মানুষ, তিনি যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"

এই সময় বহির্দ্দেশ হইতে কে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল,—"ইয়া পীর মৌলা মুস্কিল আসান; কর্ত্তাদের মঙ্গল হউক, গিন্নী ঠাকরুণদের ভাল হউক, ছেলেদের মুস্কিল আসান হউক। জয় হউক বাবা, ফকিরকে দয়া করো বাবা।"

বৃদ্ধ মুহুরি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এস বাবা এস। বাহিরে তোমাদের আস্তানা আছে,তোমাদের জন্য স্বতন্ত্র অতিথিশালা রয়েছে। চল বাবা তোমায় নিয়ে যাই, তুমি বিদেশী বুঝি?"

ফকীর বলিল, "বাবা, আমি একবার কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। আমি ভাল হাত গণতে জানি।"

তাহার কথা শুনিয়া দাদাঠাকুর ও নিরঞ্জন বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, প্রাঙ্গণে এক তেজঃপুঞ্জকলেবর ফকীর দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার প্রশান্ত বদনে কি এক অপূর্ব্ব অপার্থিব ভাব ক্রীড়া করিতেছে; দীর্ঘ শ্মশ্রু আবক্ষবিলম্বিত; দীর্ঘ কেশ পৃষ্ঠদেশে এলায়িত; পরিধানে আলখাল্লা; গলদেশে স্ফটিকমালা; হস্তেও স্ফটিকমালা এবং ভিক্ষাপাত্র; অপরহস্তে দণ্ড।

মুহুরী বলিলেন, "আপনি বিশ্রাম লইবেন আসুন। কর্ত্তা কাজে গিয়াছেন; তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইবে।"

মুহুরী মহাশয়ের কথাও শেষ হইয়াছে, অমনই স্বয়ং বসুজা মহাশয় তথায় উপস্থিত; তিনি তাঁহার শেষ কথাগুলি শুনিয়াছিলেন, তাই জিজ্ঞাসিলেন, "আমায় কে খুঁজিতেছে?"

ফকীর তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "তুমিই কি কর্ত্তা? আমিই তোমায় খুঁজিতেছিলাম। আমি ভাগ্যগণনা করিতে পারি। তোমায় গোপনে গণনার ফলাফল বলিব।"

দর্পনারায়ণ। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় সাধুপুরুষ আমার গৃহ পদধূলি দিয়ে পবিত্র করেছেন। অপরিচিতের নিকট ভাগ্যগণনা করা গুরুদেবের নিষেধ। আপনার অন্য কিছু বক্তব্য থাকে বলুন। আপাততঃ চলুন, সেবা লইবেন চলুন।

ফকীর। সেবা পরে লইব। আপাততঃ আমার কিছু বক্তব্য আছে। গোপনে হইলেই ভাল হয়।

দর্প। বেশ, তাহাই হইবে। আসুন আমরা নির্জ্জনে যাই।

দর্পনারায়ণ ফকীরকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জনে গেলেন। সেখানে গিয়া বলিলেন, "কি বলিবেন বলুন।"

ফকীর। বাবা, সন্তানকে কি চিনতে পাচ্ছ না?

দর্প। এঁ্যা, কে আপনি?

"এই দেখ"—ফকীর এই কথা বলিয়া ছদ্মশ্মশ্রু ও কেশ উন্মোচন করিলেন।

দর্পনারায়ণ সবিস্ময়ে বলিলেন, "একি, জীবন, তুমি! সর্ব্বনাশ! পালাও, পালাও। তোমার নামে সরকার বাহাদুরের পরোয়ানা বেরিয়েছে। যে তোমায় ধ'রে দিতে পারবে, তার হাজার টাকা পুরস্কার।"

জীবন। জানি। তাই এই ছদ্মবেশে এসেছি; কণ্ঠস্বরও পরিবর্ত্তন করেছি। বাবা! তোমার কাছে এক ভিক্ষা আছে। তোমার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছিলাম, তার ঋণ শুধতে পারিনি। আবার আর এক ঋণে আমায় বদ্ধ কর। আমি তোমার আশ্রিত সন্তান।

দর্প। কি ভিক্ষা বল। আমার সাধ্যমত তোমার কথা পালন করবো। তুমি যখন আমার আশ্রয় চেয়েছ, তখন প্রাণ দিয়েও তোমার কার্য্য সম্পাদন করবো।

জীবন মনে মনে দর্পনারায়ণের শতসহস্র প্রশংসা করিল; মস্তক অবনত করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল। প্রকাশ্যে বলিল, "আমি এই ফকীরের বেশে বাঙ্গলা মুল্লুক ছেড়ে পলাব, আমায় কেউ ধরুতে পারবে না। কিন্তু আমার স্ত্রী—"

দর্প। বুঝেছি, দীননাথের কন্যা?

জীবন। তার উপায় কি হবে? আমার নিরীহ শ্বশুরের উপায় কি হবে? তারা নিরপরাধ। শুনেছি বাবা, তুমি তীর্থে যাবে। এক ভিক্ষা, তাদের সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি বাঁচি বা মরি, যদি জেনে যেতে পাই তারা তোমার আশ্রয়ে আছে, তা হলে নিশ্চিন্ত মরুতে পারবো। বাবা, এই প্রার্থনাটী রাখ।

দর্প। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, আমি অঙ্গীকার করলাম। কিন্তু তারা কোথায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে? কোথায় গিয়েই বা তাদের ছেড়ে দিব? এখানে একত্র হওয়া অসম্ভব। এখানে তাদের সন্ধানে কোম্পানীর লোক ফির্‌ছে।

জীবন। তারা ইচ্ছামতী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে। তাদের স্বতন্ত্র নৌকাদি থাকবে। কেবল তারা আপনার আশ্রয়ে যাবে। তার পর কাশীতে গিয়ে আপনি তাদের ছেড়ে দিবেন।

দর্প। তাই হবে।

জীবন। আঃ বাচলেম! জয় ভগবান!

দর্প। জীবন, কেন তোমার এই কুপ্রবৃত্তি হ'ল? আমি ত তোমায় ভাল শিক্ষাই দিয়াছিলাম।

জীবন। ললাটের লিখন। সব শুনেছ তো বাবা ঠাকুরমহাশয়ের মুখে। অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে এই জঘন্য জীবন যাপন করেছি। প্রতিশোধ নিয়েছি, কিন্তু তৃপ্তি পাই নাই। দেওয়ান কালীদত্তই জমীদার-পুত্র নন্দগোপাল।

দর্প। এঁ্যা? কালী দত্ত?

জীবন। হাঁ, তাই। এখন পায়ের ধূলো দাও বাবা, জন্মের মত বিদায় হই। দাদাভাইকে দেখেছি; একবার আমার মা জননীর চরণবন্দনা করে যাব। বাবা আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্মান্তরে আমার পাপ ক্ষয় হয়।

দৃঢ় বলিষ্ঠ জীবনের চক্ষে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। দর্প-নারায়ণের চক্ষুও জলভারাক্রান্ত হইল। তিনি জীবনকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে গেলেন।

বিশ্বাসঘাতক।

হুগলী-জেলায় পাণ্ডুয়াসহর অতি প্রাচীন স্থান। কিম্বদন্তী, বহুপূর্ব্বে এখানে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার প্রমাণ এখনও ভগ্ন মন্দিরে বিদ্যমান। পাণ্ডুয়ার হেলা মন্দিরের কথা কে না শুনিয়াছে? এই মন্দিরে কুতব মিনারের মত ঘোরানসিড়ি বাহিয়া উঠিতে হয়। মন্দির উচ্চতায়ও বড় কম নহে। এটী যে একটী প্রসিদ্ধ হিন্দুকীর্ত্তিস্তম্ভ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভূমিকম্পে এই মন্দির হেলিয়া যায়, সেই জন্য ইহাকে হেলা মন্দির বলে। তাহার পর মুসলমান-রাজত্ব। কথিত আছে, পাণ্ডুয়ার হিন্দুদিগের সহিত মুসলমান আক্রমণকারীদিগের বহুদিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বহু হিন্দুমুসলমান হত হয়, রক্তস্রোতে পাণ্ডুয়া ভাসিয়া যায়। শেষে মুসলমানেরা জয়ী হন। তাঁহারাও রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া পাণ্ডুয়ায় নানা মসজেদ প্রাসাদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন। এখনও তাহার ভগ্নস্তূপ স্থানে স্থানে দেখা যায়। তাঁহাদের নির্ম্মিত বাইশ দরজা মসজেদ এখনও বিদ্যমান; ইহা একটী দেখিবার জিনিষ। দেশদেশান্তর হইতে লোকে এই মসজেদ দেখিতে আসে।

পাণ্ডুয়ার আর একটী দ্রষ্টব্য দ্রব্য দীঘী ও পুষ্করিণী। বাঙ্গালার আর কোনও গ্রামে এত অধিক ও এত বড় পুষ্করিণী আছে কিনা সন্দেহ। এই সকল পুষ্করিণীর অনেকগুলিতে কুম্ভীর বাস করে। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান তীর্থযাত্রীরা পরবের সময় মোরগ ইত্যাদি লইয়া এই সকল পুষ্করিণীতে কুম্ভীরদিগকে ডাকিয়া ভোগ দেন।

এই সকল পুষ্করিণীর তীরে হিন্দু-মুসলমানে বহু যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রবাদ, কোনও কোনও পুষ্করিণীর তটে রাত্রিকালে মামদো ভূতে ও হিন্দু-ভূতে ধুপধাপ লড়াই হয়! রাত্রিকালে সেইজন্য ঐ সকল

পুকুর তীরে কেহ প্রাণান্তে যায় না, সে পথেই চলে না। তবে আজ বৎসরেক পূর্ব্বে আসাদ ফকীর নামক একজন ফকীর ঐরূপ এক পুষ্করিণী-তীরে একখানি সামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছে। সে খঞ্জ; ভিক্ষায় জীবিকা অর্জ্জন করে। সে কাহারও সহিত মিশিত না। লোকে কাণাঘুষায় বলিত যে, সেই ফকীর পিশাচসিদ্ধ।

আজ কয়দিন হইল আসাদ ফকীরের আস্তানায় আর একজন ফকীর আসিয়াছে। সে সারাদিন আস্তানায় থাকিত, কোথাও বাহির হইত না। এই ফকীরের আগমন পর্য্যন্ত আসাদ আস্তানায় থাকিত না। আসাদ কোথায় গিয়াছে, কেহ জানিত না।

দিবা অপগতপ্রায়; সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন; সারা পশ্চিম গগনটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; দুই এক-খানা সিন্দুরে মেঘ আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে; বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিতেছে; পাখীরা সারাদিনের বিহারের পর এইবার রাত্রিবাসের জন্য কুলায়ের দিকে উড়িয়া যাইতেছে; রাখাল গোপাল লইয়া ঘরে ফিরিতেছে; মসজেদে গম্ভীর আজান-গান উত্থিত হইতেছে। আসাদের আস্তানায় নবাগত ফকীর চেরাগ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে একজন অনাহুত লোক আস্তানায় প্রবেশ করিল। ফকীর তাহার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নবাগত লোক জিজ্ঞাসিল, "এই কি আসাদ ফকীরের আস্তানা?" তাহার কণ্ঠস্বর যেন ফকীরের পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। ফকীরের মন সন্দেহদোলায় দুলিল। সে সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসিল, "তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?"

লোক। আমি আসাদের লোক, ত্রিবেণী হইতে আসিতেছি।

ফকীর আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল, তাহার পূর্ব্ব সন্দেহ দূরে গেল;

সে সাগ্রহে বলিল, "ত্রিবেণী হইতে আসিতেছ ? সংবাদ কি ? তাহারা কি আসিয়া পৌঁছিয়াছে ? আমায় কি খবর দিতে বলিয়াছে ? চল, চল, এখনি ত্রিবেণী যাই ."

লোক। ত্রিবেণী এখন থাক্। এখনই পালাও। কোম্পানীর লোক তোমার সন্ধান পেয়েছে, ত্রিবেণীতে তোমার জন্ম জাল পেতে বসে আছে। ত্রিবেণী গেলেই ধরা পড়্বে।

ফকীর। একি ! তুই তো ভূতো ; তোকে চিনেছি। হারামজাদ ! ইচ্ছা করে যমের মুখে এসেছিস ?

ফকীর এই কথা বলিয়া একলম্ফে বাঘের মত ভূতোর ঘাড়ের উপর পড়িল। বলা বাহুল্য, ফকীর আর কেহ নহে, ছদ্মবেশী জীবন সর্দ্দার ; আর নবাগত লোক ভূতনাথ বাগ্দী।

ভূতনাথ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হাঁ, হাঁ, মার, মার, একবারে মেরে ফেল, তারপর বৈষ্ণবীর খবর চুলোয় গিয়ে নিয়ো।"

জীবন ভূতনাথকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু নির্গমের পথ আগুলিয়া বসিল। ভূতনাথ উঠিয়া বসিয়া গায়ের ধূলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "আমি এলাম কোথায় উপকার কর্তে, না উল্‌টে আমায় মার! কলির ধর্ম্মই এই।"

জীবন। কুকুর ! যে কাজ করেছিস, আবার মুখ দেখালি কি করে ?

ভূত। সর্দ্দার, আমায় যমে ধরেছিল, তাই তখন মায়ের উপর কু-নজর দিয়েছিলাম। তারপর প্রাণটা পুড়ে পুড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। যারে চিরকাল মা বলে ডেকেছি, তার উপর কেন এমন হলো ? মনে হল, ছুটে গিয়ে তোমাদের পা জড়িয়ে ধরে বলি, ওগো তোমরা আমার গলায় পা দিয়ে ডল। তা, তোমায় পেলাম না, মাকে পেলাম। কেঁদে

পায়ে গড়াগড়ি দিয়ে মা, মা, বলে ডাকলাম, আর কি মা সন্তানকে অপঘেন্না করতে পারে? মা আমার সব দোষ মাপ ক'ল্লে। আমি মার সঙ্গে আসছি। না হলে তুমি এখানে আছ জানবো কি করে?"

জীবন অপ্রতিভ হইল; ভাবিল, "তাইত, অকারণ উহাকে শাস্তি দিতে গিয়াছি। আমি পাণ্ডুয়ায় ফকীরের সাজে পলাইয়া আছি, বৈষ্ণবী ব্যতীত আর তো কেহ জানে না; এমন কি, আমার শ্বশুর, কি কানুও জানে না; ভূতো নিশ্চয় বৈষ্ণবীর নিকটই শুনিয়াছে; তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে বৈষ্ণবীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিল, "ভূতো! আমার অন্যায় হয়েছে, আমি গুরু, আমার অপরাধ নিস না। বাপ কি ছেলেকে মারে না? চারদিকে বিপদে আমায় ঘিরেছে, আমার মাথার ঠিক নাই।"

ভূত। সর্দ্দার, তুমি আমায় মেরে কুটে ফেল, আমার দুঃখ নাই; কিন্তু তুমি যে আমায় অবিশ্বাস কর, এইতেই আমার মরার বেশী বাজে। বল, আমি আগে যেমন তোমার ভূতো ছিলাম, তেমনই রইলাম?

জীবন। ভূতো, তুই আমার ডান হাত। তোকে যত ভালবাসি, এত আর কাউকে না। তুই মনের ভুলে যে ওকাজ করে ফেলবি, তা আমি একবারও ভাবিনি। তাই তোর কাজটা বুকে বড় বেজেছিল। ভূতো, আমি তোকে হাতে করে মানুষ করেছি।

ভূত। তা আর বলতে, পাঁচশ বার। সর্দ্দার, আমি তোমার কেনা গোলাম। যা হয়ে গেছে ভুলে যাও।

জীবন। তার পর, খবর কি?

ভূত। খবর ভালও বটে, ভালও নয়।

জীবন। সে কি?

ভূত। আমরা দাঁড়িরহাটের যাত্রীদের সঙ্গে ত্রিবেণীতে এসে পৌঁছেছি, এপর্য্যন্ত ভাল। কিন্তু কোম্পানীর লোক আমাদের পেছু নিয়েছে। আমি রাত্রে জলে ডুব কেটে পুলীশের পানসীর পাশে গিয়ে তাদের মতলব শুনে এসেছি। তারা ঠিক করেছে, আমাদের চোখের আড়াল কর্‌বে না। কোথাও নৌকা বাঁধিলে পরে আমাদের সঙ্গে যদি কোনও অজানা লোক দেখা কর্‌তে আসে,অমনই তার সঙ্গ নেবে। আর যদি কোথাও তুমি আমাদের সঙ্গে মেলো, তাহলে তো কথাই নাই। আমিও মতলব ঠাউরালেম, ত্রিবেণীতে নেমে তোমায় সাবধান করে দিয়ে যাব।

জীবন। তার পর?

ভূত। ত্রিবেণীতে আমরা কাল সাঁজের বেলা পৌঁছেছি। পৌঁছান মাত্র একজন খোঁড়া ফকীর আমাদের এক নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে, "নৌকা কোথাকার; কোথায় যাবে?" আমি ভাল করে নজর করে দেখি, পুলীশের লোকও খোঁড়াকে নজর কচ্ছে। আমিও অমনি খোঁড়াকে টিপে দিলাম যে, আমরা তাকে চিনি, সে যেন আস্তানায় ফিরিয়া না যায়, পুলীশের লোক পাছু লইবে। রাত্রে ডুব কেটে পুলীশের পানসীর পাশে যাই। মতলব শুনলাম, তারা খোঁড়াকে তোমার লোক বলে সন্দেহ করেছে, তাকে চখে চখে রাখ্‌বে; সারাদিন যদি খোঁড়া কোথাও না যায়, তাহা হইলে আজ রাত্রে তাহাকে তাহাদের নৌকায় ধরিয়া লইয়া যাইবে ও তাহাকে যন্ত্রণা দিয়া কথা বাহির করিয়া লইবে। আমি নৌকায় ফিরিয়া মাকে সব কথা বল্‌লাম। তার পর পরামর্শ এঁটে আমরা তিন জনে ডুব কেটে অনেকদূরে এসে ডাঙ্গায় উঠলাম। নৌকার লোকদের শিখিয়ে দিলাম কোনও গোল না করে।

জীবন। তোরা তিন জন কে কে?

ভূত। আমি, বুড়ো কত্তা, আর মা জননী।

জীবন। এঁ্যা, বৈষ্ণবী এসেছে? কই? কোথায়? এখানে আন্‌লিনি কেন?

ভূত। এখানে বেশী লোকজন এলে, বিশেষ বৈষ্ণবী এলে, যদি পুলীশ পাছু নেয়? তারা পাছু নিয়েছে কিনা কে জানে? গঙ্গায় এক নৌকা ভাড়া করে লুকিয়ে ছিলাম। সঙ্গে সাজের পোষাক ও চুল এনেছিলাম। সাঁঝও হল, এসাজে সেজে পাঁচকোশ পথ লাঠির ভরে চলে তোমায় খবর দিতে এলাম। এখন চল, সাঁঝের আঁধারে গা ঢাকা হয়ে একবার মা জননীর সঙ্গে দেখা করে এ গাঁ ছেড়ে পলাব। আজ রাতে টাকার লোভে আর মারের চোটে খোঁড়া সব বলে ফেল্‌বে, তুমিও ধরা পড়বে।

জীবন। ভূতো! তোকে যে কি বলে মনের ভাব জানাবো, তা বল্‌তে পারি নি। এঁ্যা, আমি তোকে সন্দেহ করেছিলাম? যাক্, যদি ভগবান দিন দেন, কাশী গিয়ে তোর ঋণ শুধবো।

ভূত। হাঁ, তাই কোরো। আগে কাশীই পোঁছাও, তার পর ঋণ শুধো। এখন চল দেখি।

জীবন। আচ্ছা, পুলীশের পানসী কখানা, কজন বরকন্দাজ?

ভূত। ওরে বাপ্‌রে! আবার ও কথা কেন? লড়ালড়ি কর্‌বে নাকি? তা, সে গুড়ে বালি। তারা দমে ভারি। চল, চল।

জীবন। হাঁ, চলো যাই।

জীবন কুটীরের কোণ হইতে তাহার বড় আদরের লাঠিটি সংগ্রহ করিল; বস্ত্রাভ্যন্তরে দীর্ঘ শাণিত ছুরিকা লুক্কায়িত রাখিল; তাহার পর ভূতোর সহিত চলিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি অন্ধকারময়; কিন্তু ভূতনাথ সেই অপরিচিত প্রদেশে অজানা পথে সেই অন্ধকারে দ্রুত চলিতে লাগিল। অন্য সময় হইলে এ বিষয়ে জীবনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি

এড়াইত না। কিন্তু জীবন গভীর চিন্তায় মগ্ন, সে কত কি ভাবিতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই নাই।

পথের পর পথ, ঝোপের পর ঝোপ, কাঁটাবনের পর কাঁটাবন,—কত কি অতিক্রান্ত হইল; বামে দক্ষিণে পথিপার্শ্বে বড় বড় দীর্ঘিকা, গোরস্থান, মসজেদ, ভগ্নস্তূপ,—কত কি পড়িয়া রহিল; জীবনের সে সকল দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; জীবন এক মনে পথ চলিয়াছে।

পথে যাইতে যাইতে ভূতনাথ বলিল, "সর্দ্দার, নৌকায় উঠিয়া চেঁচামেচি কোরো না, চুপিসাড়ে কথাবার্ত্তা কহিবে। চারিদিকে কোম্পানীর লোক ফিরছে। খুব হুঁসিয়ার।"

জীবন। "তুই কি পাগল, আমি চেঁচামেচি কর্‌বো? আমার নিজের ভয় নাই?"

কিছুক্ষণ দুইজন নীরবে চলিল। আবার ভূতনাথ বলিল, "সর্দ্দার আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। কানু নৌকা আগলাবে। তোমার কাছে একজন না থাকলে বড় কষ্ট হবে। এত পথ হেঁটে যাবে।"

জীবন ভূতোর কথায় উত্তরোত্তর আনন্দলাভ করিতে লাগিল। সে ভাবিল, যথার্থই ভূতোর মত তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আর কেহ নাই। সে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিল। মানুষের ভুল কি হয় না? ভূতো জীবনে একটা ভুল করিয়াছিল, সে ভুলের কি ক্ষমা নাই? জীবন মনে মনে অনুতপ্ত হইল!

ক্রমে গঙ্গাবক্ষে নৌকার আলোক দেখা যাইতে লাগিল; ঘাটের বাজারের আলোক দেখা গেল। তীরে উপস্থিত হইয়া ভূতনাথ মৃদুস্বরে ডাকিল, "বুড়ো কত্তা!" সারি সারি পাঁচ ছয়খানি নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল; কেবল একখানি নৌকা দূরে আঘাটায় বাঁধা ছিল, আর বেশী জলে ঐ নৌকার কাছে দুইখানা পানসী ছিল।

ভূতনাথ ডাকিলে পর আঘাটার নৌকার মধ্য হইতে উত্তর হইল, "হুঁ!" দারুণ হর্ষোদ্বেগে জীবনের বুক গুরুগুরু কাঁপিয়া উঠিল। ভূতনাথ মৃদুস্বরে বলিল,"সর্দ্দার, এই নৌকা; খুব হুঁসিয়ার।" ভূতনাথ এই কথা বলিয়া জলে নামিয়া নৌকার মুখ টানিয়া আনিল। জীবন এক লম্ফে নৌকায় চড়িয়া দ্রুতপদে মহা আনন্দে যেমন ভিতরে প্রবেশ করিতে গেল, অমনই অন্ধকারে নৌকার ডহরে সশব্দে পড়িয়া গেল। জীবন চিৎকার করিয়া বলিল, "বিশ্বাসঘাতকতা!" সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের উচ্চহাস্যে গগন মেদিনী ছাইয়া গেল, আর দশ বারো জন বলিষ্ঠ পুরুষ জীবনকে চাপিয়া ধরিল। একি! নিমেষের মধ্যে এ কি হইয়া গেল? নৌকার তক্তা কি খুলিয়া রাখা হইয়াছিল? কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র!

জীবন প্রথমে কতকটা সংজ্ঞাশূন্যের মত হইয়াছিল; মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু সে সিংহবিক্রমে গর্জ্জিয়া উঠিল। একে তাহার দেহে অসুরের বল, তাহাতে আবার জীবনের আশঙ্কা, সে তখন দেহে মত্তহস্তীর বল পাইয়াছে। তাহার হস্তপদ ও দেহের ঝাঁকুনিতে লোকগুলা বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইল, কেহ জলে পড়িল, কেহ নৌকায় পড়িল, কেহ বা তীরে ঠিকরিয়া পড়িল। জীবন একলম্ফে তীরে অবতীর্ণ হইল।

কিন্তু কোম্পানীর বরকন্দাজে তখন তীর ছাইয়া ফেলিয়াছে, তীর আলোকে আলোকে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। জীবন সেই আলোকে দেখিল, সম্মুখে কোম্পানীর বিশ ত্রিশ জন বরকন্দাজ বন্দুক হস্তে দণ্ডায়মান। তাহারা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইয়া ধরিয়াছে, চারিদিকে বিস্তর লোক মশাল হস্তে দণ্ডায়মান, আরও লোক মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তে পিলপিল করিয়া বাজার হইতে সেই আঘাটায় আসিয়া জমায়েত হইতেছে। জীবন একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, সারি সারি নৌকা জলের পথ আগুলিতেছে, নৌকায় মশাল-

ধারী ও বন্দুকধারী বহুসংখ্যক পাহারা। সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে চারিদিকে ঘেরিয়াছে, আর পলাইবার পথ নাই।

তখন জীবন গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসিল, "তোমাদের দারোগা কে?"

একজন পুলিশের লোক বলিল, "কেন, দারোগার সহিত তোমার আবশ্যক?"

জীবন। আমি ধরা দিতেছি। তোমরা অনর্থক কষ্ট কোরো না।

লোক। আর ধরা না দিয়ে কর্‌বে কি যাদু? পালাবার কি উপায় রেখেছি।

জীবন। বটে? তবে ধর্‌, ভেড়ের ভেড়ে। আমি জীবন সর্দ্দার! এই লাঠি ধর্‌লেম্‌, তোদের বিশ পঞ্চাশ জনকে ঘাল না করে ধরা দিব না।

জীবন এই কথা বলিয়া ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়া লাঠি ঘুরাইয়া একলম্ফে সম্মুখের বরকন্দাজগণের মাথা টপকাইয়া পড়িল। অনেক বরকন্দাজ মূর্চ্ছা গেল, অনেকের হস্ত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িল, অনেকে জলে পড়িয়া গেল। জীবন ইচ্ছা করিলে সেই অবকাশে লাঠির ভরে শূন্যে উধাও হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সে এক পাও নড়িল না, মনে কি একটা অভিসন্ধি স্থির করিয়া অবিকম্পিতভাবে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল, "কেমন আমায় ধরিতে পারিলি? জীবন্ত বাঘকে ধরিবি, সাধ্য কি তোদের? এই আমার হাতে অস্ত্র, এই অস্ত্রে এখনই মরতে পারি জানিস? আমি ভালয় ভালয় ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতে গেলাম, তোরা পুরস্কার পাইতিস্‌, তাহাই কি ভাল ছিল না?" জীবন মরিতে যেন কৃতসঙ্কল্প! কেন, সে হঠাৎ জীবনে এত বীতস্পৃহ কেন?

বরকন্দাজদিগের আড়াল হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "জীবন! তুমি ঠিকই বলিয়াছ, তোমায় জীবন্ত ধরে বাঙ্গালায় এমন লোক আজও

জন্মে নাই। তুমি ধরা দিবে বলিতেছ দাও, আমরা কোনওরূপ হাঙ্গামহুজ্জৎ করিব না।"

জীবন। তুমি কে ?

লোক। আমিই দারোগা। এই দলের কর্ত্তা।

জীবন। বেশ। কিন্তু কেবল এক সর্ত্তে আমি ধরা দিব।

দারোগা। কি, বল।

জীবন। একবার ভূতনাথকে আমার সম্মুখে আনিয়া দিতে হইবে।

দারোগা। তোমার হাতে অস্ত্র রয়েছে, তারও প্রাণের ভয় আছে।

জীবন। কি আশ্চর্য্য! যে মরতে যাচ্ছে, তার কাছে ভয় কি ? আচ্ছা, আমি শপথ কচ্ছি তাকে কিছু বল্‌বো না।

দারোগা। সে বলে তোমার শপথে বিশ্বাস কি ? তার উপর তোমার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ রয়েছে।

জীবন। কি ? আমার কথায় অবিশ্বাস ? আমি কি তার মত কুকুর-বাচ্ছা ? আচ্ছা, বেশ। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তার কাছে জিজ্ঞাসা করে উত্তর দাও।

দারোগা। জিজ্ঞাসা কর।

জীবন। বৈষ্ণবী কোথায় ? তার সঙ্গে ভূতনাথের কোথায় দেখা হয়েছিল ? কি করেই বা সে বৈষ্ণবীর কাছ থেকে আমার সংবাদ পেলে ?

দারোগা। ও কথার জবাব আমিই দিচ্ছি, ভূতনাথের দিবার দরকার করে না। বৈষ্ণবী এখন পুলিশ ফাঁড়ীতেই আছে। এখন ভূতোর সঙ্গে তার আসনাই হয়েছে, সে ভূতোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে টাকার লোভে তোমায় ধরিয়ে দিয়েছে। হয় না হয়, সকলকে জিজ্ঞাসা কর; না হয় ফাঁড়ীতে চল দেখিয়ে দিব। না হলে ভূতো তোমার সন্ধান পেলে কোথা হতে ?

জীবন অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার হাত হইতে লাঠি খসিয়া পড়িল, তাহার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সে বিষাদজড়িতস্বরে বলিল, "তোমরা শোন, আজ রাত্রেই আমায় ঐ গাছে লট্‌কে দাও। আমি অনেক পাপ করেছি, আত্মহত্যা কর্‌লে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তোমরা আমায় ফাঁসী দাও, ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াও, না হয় জীবন্তে কবর দাও। ও হোঃ হোঃ বৈষ্ণবী! এই পুরস্কার!"

জীবন নদীর জলে অস্ত্রশস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, পরে উন্মত্তের মত বলিল, "দারোগা সাহেব, এস, হাতকড়ি লাগাও, আমায় কোথায় নিয়ে যাবে নিয়ে চল, আমি প্রস্তুত।" দরদরধারে জীবনের চক্ষে জল ঝরিল।

পাষাণহৃদয় দারোগারও মন টলিল, কিন্তু একজনের টলিল না, সে ভূতো। জীবনের হস্তপদে সর্ব্বাঙ্গে বন্ধন পড়িল; জীবন প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া চলিতে যাইতেছে, এমন সময় ভূতনাথ বিকট অঙ্গভঙ্গীর সহিত হো হো হাস্য করিয়া বলিল, "কেমন, শালা জীবনে! এখন কে কার টুঁটী ছেঁড়ে? যা শালা ফাঁসীকাঠে ঝুলগে যা, আমি বৈষ্ণবীকে নিয়ে মজা লুটি।"

জীবন একবার ঘৃণার হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইল। দারোগা ভূতোকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "খবরদার, বেয়াদপ! হাতী হাবড়ে পড়েছে বলে চাট মার্‌ছিস্?"

ভূতনাথ কিল খাইয়া কিল চুরি করিল। কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "আমায় মার আর ধর, হাজার টাকার আধা-বখরা আমার, আর আধা বৈষ্ণবীর। সাধে কি আর সে আমায় পছন্দ করেছে। আর বনে বনে কোম্পানীর বরকন্দাজের তাড়া খেয়ে থাকতে পারে না। এখন দুদিন একটু মজা মারুক। চলো দারোগা সাহেব চল, আমার বকসিস্ দেবে চল। আজ মজা মার্‌তে হবে।"

দারোগা। আ মোলো বেটা, তোর টাকা কি আজই যুগিয়ে রেখেছি নাকি ?

ভূতো। নিদেন হাঁড়িয়া খাবার টাকাটা দেবে তো আজ ? এত কষ্ট কল্লাম !

দারোগা। আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। ফাঁড়ীতে তো চল।

পুলিশের দল জীবনকে লইয়া থানার দিকে চলিল। ভূতনাথ নানা অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে তাহাদের অনুগমন করিল। পথে জীবন একটীও কথা কহিল না।

ভূতোর পরিণাম।

সেই রাত্রিতে ভূতনাথ দারোগা সাহেবের কাছে দশ টাকা পাইল। টাকা পাইয়া তাহার মহা আহ্লাদ। সে তখনই দুই তিনজন বরকন্দাজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গেল। সেখানে এক চটীতে আশ্রয় লইল। খুব খাওয়া দাওয়া ও হাঁড়িয়া চলিতেছে। ভূতনাথের প্রাণ আজ দিলদরিয়া হইয়াছে। প্রথমে সে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে, জীবন্ত বাঘ জীবন সর্দ্দারকে ধরাইয়া দিয়াছে, তাহার পর নগদ দশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে, আর কি রক্ষা আছে ?

হরদম স্ফূর্ত্তি চলিতেছে, স্ফূর্ত্তির মুখে ভূতনাথের অন্তরের কত কথা বাহির হইতেছে। ভূতনাথ বলিতেছে, “বাছাধনকে কি কম বুদ্ধি খরচ করে ধরেছি ? এই বুদ্ধির জোরে কত টাকাই পেয়ে যাচ্ছি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !”

একজন বন্ধু বলিল, “হাঁরে, তুই ওশালার সন্ধান পেলি কি করে ? শালা তো ফকীর সেজে কোণে লুকিয়ে ছিল।”

ভূত। ওরে বাপরে, সে কি চারিটীখানি কথা? নে ঢাল, খাই আর বলি।

আবার হাঁড়িয়া চলিল। ভূতনাথ বলিতে লাগিল, "ডাঁসার জঙ্গলে এক গাছতলায় কত্তাগিন্নীতে কথা হচ্ছে; পেঁচো বাগ্দীর বেটা এই ভূতনাথ যে গাছের ডালে বসে, তা জানেন না। কর্ত্তা পেঁড়োয় আসাদ ফকীরের আস্তানায় এসে লুকুবেন, আর গিন্নী সব নিয়ে থুয়ে কাশী যাবেন মতলব হল। সব শুনলেম। আর রক্ষা আছে কি? সব চলে গেলে গাছ হতে নামলেম। পাশে নৌকা বাঁধা, নৌকায় চড়ে খানিক দূরে এসে ডাঙ্গায় নেমে হাঁটা দিলেম। তারপর আর কি, সরাসর দারোগার কাছে যাওয়া। সব গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে পুলীশের দিনকয়েক লাগলো। পেঁড়োয় কাল পৌঁছালেম, আসাদ ফকীরের আস্তানা খুঁজে নিলেম। দেখলেম কত্তা হাজীর সেখানে।" ভূতো হাঁড়িয়ার ভাঁড় মুখে ধরিল।

বন্ধু। তার পর।

ভূত। কত্তা হাজীর, কিন্তু আসাদ ফকীর নাই। কাল রাত্রেই কত্তাকে ধরা যেত; কিন্তু তাকে জেন্ত ধরা চাই, নইলে হাজার টাকার বকসিস ফস্‌কে যায়। যদি খোঁড়া বেটা কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাকে ধরবার আগে জাগিয়ে তুলে দেয়, তা হলে তো জেন্ত ধরা হয় না। রাত্তির ভোর এমনি কেটে গেল।

বন্ধু। তা তো জানি, সারারাত আমাদের কাল ঘুম হয় নি।

ভূত। আজ সকালে উঠে বাজারে খোঁজ নিলাম। একজন বল্‌লে খোঁড়া বেটাকে সে ত্রিবেণীতে দেখে এসেছে। মনে খট্‌কা লাগ্‌লো। খোঁড়া ত্রিবেণীতে কেন? ওঃ হয়েছে; বৈষ্ণবী বেটী তিথী যাচ্ছে, ঐখানে নিশ্চয়ই নৌকা আসবে; খোঁড়া বেটা খবর নেবার জন্যে বসে আছে। অমনি মতলব ঠাওরালেম।

বন্ধু। বেশ, বেশ।

ভূত। ভাবলেম্, আজই জীবনে শালাকে ধর্‌তে হবে, ফাঁকি দিয়ে ধর্‌তে হবে। শালাকে ঐ বৈষ্ণবী বেটীর টোপ দেখিয়ে ধরতে হবে।

বন্ধু। বা রে, ও মতলব তো দারোগা সাহেব শেখালে রে?

ভুতো। হাঁ, হাঁ, ঐ হলো। ওঃ! বেটাকে কি ফাঁদেই ফেল্‌লুম! যেন পুঁটীর টোপে দেড়মুণি গজাল গ্রেপ্তার হলো। হাঃ হাঃ হাঃ! শালাকে বোঝালুম, তার বৈষ্ণবীই তার সন্ধান বলে দিয়েছে। তার বৈষ্ণবীই তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, নৌকায় তার জন্যে বসে আছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বোকা শালা জানে না যে, নৌকায় তার বাবারা বসে রয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

সকলে সেই হাসিতে যোগদান করিল। একজন বলিল, "বাঃ বাঃ! কি বুদ্ধি তোর ভূতনাথ দা! তুই ভাই দারোগা হলিনি কেন?"

ভূতনাথ বলিল, "তা যখন সেজেছিলাম, তখন দারোগার মত দেখাচ্ছিল না?"

এইরূপ হাসিতে স্ফূর্ত্তিতে অনেক রাত্রি কাটিল। প্রায় শেষ রাত্রে যখন সকলে অকাতরে ঘুমাইতেছে, তখন চারি পাঁচজন লোক সরাইয়ের ঝাঁপ কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহারা মশাল জ্বালিয়া সকলের মুখ দেখিয়া লইল; তাহার পর ভূতনাথের মুখ হাত পা বাঁধিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিল। সরায়ের বাহিরে আসিয়া তাহারা ঝাঁপ লাগাইয়া মশাল নির্ব্বাণ করিয়া দিল; তাহার পর ভূতনাথকে লইয়া দ্রুতপদে পশ্চিমাভিমুখে চলিল। গ্রামের মধ্য দিয়া না গিয়া তাহারা মাঠে মাঠে ঝোপ জঙ্গল অতিক্রম করিয়া দৌড়াইল। একে নেশা, তায় ঘুমের ঘোর, ভূতনাথ প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না। ক্রমে তাহার চৈতন্য হইল, সে বুঝিল কাহারা তাহাকে বাঁধিয়া বহন

করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে প্রাণপণে চিৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখব্যাদান করিতে পারিল না।

বহুক্ষণ পরে কোনও স্থানে বাহকেরা দাঁড়াইল। ভূতনাথের দেহ ভূমিপরে রক্ষিত হইল; তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন্ধনও খুলিয়া গেল। মুখের বন্ধন খুলিবামাত্র ভূতনাথ চিৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, কে তোমরা?"

উত্তর হইল, "তোর বাবারা।"

উত্তর শুনিয়াই ভূতনাথের প্লীহা চমকিত হইয়া গেল। এ কি! এযে পরিচিত স্বর! ভূতনাথ চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! এ কোথায় আসিয়াছে! এ তো সেই খোঁড়া ফকীর আসাদের আস্তানা? ভূতনাথের পক্ষে তখন আসাদের আস্তানা যেন যমের আস্তানা বলিয়া বোধ হইল। ভূতনাথ একবার ঘরের লোকগুলিকে দেখিয়া লইল। গভীর রাত্রি; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কুটীরে মশালের আলোক জ্বলিতেছে, সেই আলোকের সম্মুখে বসিয়া স্বয়ং আসাদ ফকীর, তাহার দক্ষিণে দীননাথ অধিকারী, বামে কানু সর্দ্দার; ঘরের সর্ব্বত্র কালান্তক যমের মত সশস্ত্র দস্যুদল; সংখ্যায় তাহারা বিশজনের কম হইবে না। সকলের পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে অধোমুখে বসিয়া কে ও? সর্ব্বনাশ! ও যে বৈষ্ণবী! বৈষ্ণবীর পরিধানে গৈরিকবসন, গলে রুদ্রাক্ষমালা, বৈষ্ণবী আলুলায়িতকুন্তলা; অন্ধকারেও তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বৈষ্ণবীকে দেখিয়া ভূতনাথ শিহরিয়া উঠিল।

প্রথমেই কানু সর্দ্দার জিজ্ঞাসিল, "কি রে শালা নিমকহারাম! এতদিন সর্দ্দারের নিমক খেলি, শেষ খুব নিমকের কাজ করলি! সর্দ্দারকে ধরিয়ে দিবি না, সর্দ্দার তোকে যে ছেলের চেয়ে বেশী ভাল বাসত! হাঃ তোর বাপ্দীর–

আসাদ ফকীর তাহার কথা শেষ না হইতেই বলিল, "শালা কি স্বধু ধরিয়ে দিয়েছে, শালা জুয়াচুরি করে সর্দ্দারকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। ঐ বদনা ডোম সব জানে, ঐ বলবে এখন।"

একজন দস্যু সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মুই আর পুঁটে কাওরা পুলীশের বরকন্দাজের দলে বরকন্দাজ সেজে ছিলাম। মোরা সব দেখেছি। শালা মোদের মায়ের নামে কলঙ্ক রটিয়ে সর্দ্দারকে ভুল বুঝিয়ে দিলে, সর্দ্দার লাঠি ধরলে না, অমনই ইচ্ছা করে ধরা দিলে। না হলে সর্দ্দারকে জেন্ত ধরে এমন বাপের বেটা কেডা আছে? সর্দ্দার একবার লাঠি ধরলে হত, মোরাও ঠিক হয়ে ছিলুম।"

আসাদ বলিল, "কিরে শালা, সব শুনলি? টাকা খাবি? তোর এত কষ্টের টাকা সঙ্গে যাবে না তো শালা, তুই যে আগে কবরে যাবি। শালা শয়তান, তোর শয়তানির উপরও শয়তানি আছে জানিস না?"

কানু বিষম উত্তেজিতস্বরে বলিল, "হারামজাদ! তোর নিমক-হারামির এক একটা টাকা যে সর্দ্দারের এক এক ফোটা রক্ত, সেই রক্ত খেলি কেমনে রে শালা!"

ভূতনাথ থর থর কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখে বাক্য সরিল না।

আসাদ বলিতে লাগিল, "আজ সাত দিন হল সর্দ্দার আমার আস্তানায় এসে উপস্থিত। আমিই ডাকাতের দলের ভৈরব কপালী, এখানে ফকীর সেজে লুকিয়ে আছি, তা সর্দ্দার জানতো। এসে আমায় বল্লে, 'ভৈরো, তোকে দিন কতক ত্রিবেণী গিয়ে থাকতে হবে। সেখানে দাঁড়িরহাটের যাত্রীর নৌকা এলেই আমায় খবর দিবি। আমি তোর আস্তানায় রইলুম।' অনেক দিন সর্দ্দারের নুন খেয়েছি, এই সামান্য কাজটুকু করবো না? তখনই ত্রিবেণী গেলাম। সেখানে কদিন বসে বসে কাল সন্ধ্যার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হল। ছুটে সর্দ্দারকে খবর দিতে এলাম। এসে দেখি আস্তানা খালি। মনে বড় খটকা

লাগলো। সর্দ্দার নিজে বল্‌লে অপেক্ষা করবে, তোমাদের খবর না পেলে কোথাও যাবে না, অথচ কোথায় গেলো? নিজে কখনও যায় নি; কেউ ধরেও নিয়ে যায় নি; কেন না জীবন সর্দ্দারকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলে, তার অনেক চিহ্ন থাকতো। তাকে নিশ্চয়ই কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তখনই গঙ্গাতীরে পুলীশ ফাঁড়ীর দিকে গেলাম; দুর হতে কতক কতক দেখলাম, বাজারে লোকের মুখেও কতক শুনলাম; অমনিই ত্রিবেণীর দিকে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে তোমাদের সব বল্‌লাম, কিন্তু তার আগেই তোমরা পুঁটের কাছে সংবাদ পেয়েছো।"

কানু বলিল, "হাঁ পুঁটেকে বদনা পাঠিয়েছিল।"

বদন বলিল, "মোরা সর্দ্দারের কথামত অনেক আগে বশিরহাটে পুলিশের বরকন্দাজদলে ঢুকি, মোরা লুকিয়ে সর্দ্দারকে পুলিশের সব খবর দিয়ে যেতাম। নৌকার পাছু পাছু আসছি। ত্রিবেণীতে দুখানা পুলিস পানসী রইল, মোদের পানসী পেঁড়োয় এলো। সেখানে সাঁঝের চেরাগ জ্বালবার পর হৈ হৈ উঠ্‌লো, জীবন সর্দ্দার ধরা পড়েছে। মোরা আর আর বরকন্দাজের সঙ্গে ডেঙ্গায় নামলাম, দেখি সত্যিসত্যিই সর্দ্দার ঘেরাও পড়েছে। আহা! সর্দ্দার হাতের লাঠিতে মাথা রেখে ঘাড় হেট করে রয়েছে; দারোগা বল্‌তেছে, মোদের মাঠাকরুণ ঐ ভূতো শালার সঙ্গে আসনাই করেছে, নইলে ভূতো সর্দ্দারের খোঁজ পেলে কোথা? মাঠাকরুণ বই ত কেউ জানতো না। তাই দুজনে জোট পাকিয়ে সর্দ্দারেরে ধরিয়ে দিচ্ছে, টাকার ভাগ পাবে! আহা! চোখের জলে সর্দ্দারের বুকটা ভেসে যেতে নাগলো! সর্দ্দার হাতের লাঠি ছুড়ে ফেলে দিলে, নিজে হাত পা বাঁধালে, ব'লে আমায় কবর দেও, ফাঁসে ঝোলাও। ভূতো শালা হি হি হি হি হাসতে লাগলো, আর সর্দ্দারকে তামাসা মস্কারা করে বল্লে, 'শালা কে কার ঘাড় ভাঙ্গে, এইবার তুই মর, মুই মাঠাকুরুণরে নিয়ে মজা মারি।"

ঘৃণায় ক্ষোভে রোষে সকলে শিহরিয়া উঠিল। বদন আবার বলিতে লাগিল, "মুই তেখুনি পঁটেরে ত্রিবেণী পাঠালুম, ভাবলুম, যদি সর্দ্দারের বাঁচাবার কোনও উপায় হয়।"

কানু অমনই বলিয়া উঠিল, "উপায় হবে কি? সাধ্য থাকলে কি চুপ থাকৃতাম? একজন লোককে ধরতে পাঁচশো বরকন্দাজ! বাপ! নইলে কানু কি চুপ করে থাকে? মনে ভাবলুম, সর্দ্দার তো নিমকহারামিতে গেল, তার উপায় নাই; কিন্তু যে শয়তান নিমকহারামি করে সর্দ্দারকে ধরিয়ে দিয়েছে, তাকে একবার বুঝে নেব। হারামজাদ সরায়ে গিয়ে খুব আমোদ কচ্ছিল, আমিও ওৎ পেতে বসে রইলেম। ওঃ! সর্দ্দারের নাম নিয়ে কত তামাসা, কত মস্কারা! শালা একবারও কি তোর সর্দ্দারের দয়ার কথা মনে পড়্‌লো না? একবারও কি তোর সর্দ্দারের চোখের জলের কথা মনে হলো না? ওঃ কি নিমকহারাম পাজী শয়তান! শালার চোখ দুটো নখে করে উপড়ে ফেলতে পারি তো রাগ যায়! মা, হুকুম দাও, শালাকে জেন্ত ছাল ছাড়িয়ে ফেলি।"

ভূতনাথ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কানু ধমক দিয়া বলিল, "চুপ, চুপ শালা, কচি খোকার মত ডুকুরে কাঁদতে লাগলো! শালার মুখে ছাতু পুরে মাথায় জুতো বসাতো রে। মা জননী! হুকুম দাও, হুকুম দাও, রাত পুইয়ে এলো।"

বৈষ্ণবী এতক্ষণ নীরবে ছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দীর্ঘ উন্নত সরল দেহযষ্টি থর থর কাঁপিতেছে, চক্ষু জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে। বৈষ্ণবী ধীর-গম্ভীর স্বরে ভূতনাথকে বলিল, "তোর নাম লইতেও ঘৃণা হয়, তুই পিশাচেরও অধম। তোর কি শাস্তি উপযুক্ত?"

ভূতনাথ কেবল কাঁপিতে লাগিল, যোড়হস্তে কাতরকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা"।

বৈষ্ণবী জলদগম্ভীরস্বরে বলিল, "ক্ষমা? ইহজগতে তোর পাপের ক্ষমা নাই। ভেবে দেখ্ কি কাজ করেছিস্। টাকার যদি এত লোভ, অন্য উপায়ে ধরিয়ে দিলি নি কেন? তাকে মনের শান্তিতে মরতে দিলি না কেন? ক্ষমা? সমুদ্রেই ডুবে থাক্, আগুনেই লুকিয়ে থাক্, তোর নিস্তার নাই।" এই কি সেই বৈষ্ণবী? স্বল্পভাষিণী, মৃদুস্বভাবা, শান্তা, শিষ্টা, দয়াময়ী বৈষ্ণবী কি এই? এ কি পরিবর্ত্তন!

কানু বলিল, "না, নিস্তার নেই!"

সকলে চিৎকার করিয়া বলিল, "না নিস্তার নেই!"

সমস্ত ঘরে প্রতিধ্বনি উঠিল, "না নিস্তার নেই!"

ভূতনাথ সভয়ে শুনিল যেন জগৎসংসার বলিতেছে, "না নিস্তার নেই!"

কানু আবার বলিল, "নিস্তার তো নেইই। এখন কি করে প্রতিশোধ নেবো, বলে দাও মা।"

বৈষ্ণবী ধীর, স্থির, অটল, অচল। অবিচলিতস্বরে বলিল, "বাপ! তোমার যেরূপ অভিরুচি।"

কানু বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "তবে মা, আমার ইচ্ছা শালা নিমকহারামকে জেন্তে ছাল ছাড়িয়ে মারি।"

ভূতনাথ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন আসাদ ফকীর দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "না, না, ছাল ছাড়াবো না; আমি ওর শাস্তি ঠিক করে রেখেছি। আমি এখন মুসলমান ফকীর হয়েছি, মুসলমানের কাজ করি, পীরকে খোস করি। ভাই সব! পীর অনেক দিন রক্ত খান নি, চল পীরকে এই নিমকহারামের রক্ত ভোগ দিই। ঐ যে পুকুরে পীরেরা হাঁ করে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। মোরগসিন্নিতে পীরের অরুচি হয়েছে; চল, চল, মানুষ ভোগ দিই!"

খোঁড়া ফকীর এই কথা বলিয়া করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সকলে সেই হাস্যে যোগ দিল, ভূতনাথের কাতর চিৎকার সেই হাসিতে ডুবিয়া গেল। অহার পর ডাকাতেরা ভূতনাথকে তুলিয়া লইয়া চলিল; অগ্রে কতকগুলা ডাকাত মশাল ধরিয়া চলিল। তখন রাত্রিও প্রায় প্রভাত হইয়াছে, পূর্ব্বদিক অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। ডাকাতেরা ভূতনাথকে লইয়া পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইল। আসাদ ফকীর কেমন এক প্রকার অস্বাভাবিক স্বরে "আয় আয়" বলিয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল। ভূতনাথ "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া কাতরকণ্ঠে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি আকাশে মিলাইতে না মিলাইতে জলে ঝুপ করিয়া শব্দ হইল; দুর্দ্দান্ত দস্যুরা ভূতনাথকে পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিয়াছে।

প্রভাতের অরুণালোকে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল ফকীরের "আয় আয়" ডাকে অসংখ্য কুম্ভীর ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভূতনাথের দেহ জলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিল। ভূতনাথ প্রাণভয়ে তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া যেমন কুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনই দুর্দ্দান্ত দস্যুরা বর্শাফলকে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল ও পিশাচের ন্যায় বিকট হাসি হাসিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল। সেই স্থান হতভাগ্য ভূতনাথের আর্ত্তনাদে পরিপূরিত হইয়া গেল; পুকুরের জল রাঙ্গা হইয়া উঠিল। অবশেষে নিশাশেষে ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র কুম্ভীরের দল ভূতনাথকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল।

উপসংহার।

দর্পনারায়ণ বসুজ মহাশয় অসুস্থ পুত্রকে লইয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীননাথ সপরিবারে কাশিবাসী হইল। কানুও সদল বলে ৺কাশীধামে রহিল। সে বৈষ্ণবীর কথায় ডাকাতি ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গায় মাঝিগিরি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহার লোকজনও এক একটা কাজে লাগিয়া গেল। বৈষ্ণবী শুলকুনির আড্ডা হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বে ডাকাতিতে সঞ্চিত অর্থে কাশীতে বহু সদনুষ্ঠান করিল; শেষে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পিতাপুত্রীতে খাটিয়া খাইতে লাগিল। তাহার সদনুষ্ঠানে বাবা বিশ্বনাথের পাণ্ডারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বলিয়া কহিয়া বৈষ্ণবী বাবার মন্দির মার্জ্জনা করিবার অনুমতি চাহিয়া লইল। জীবনে বৈষ্ণবীর ইহাই সুখ ছিল।

রামহরি, ভগিনী হরিমতী ও উন্মাদগ্রস্ত ভ্রাতা নরহরিকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিল। সেখানে তাহার খুল্লতাতের কুঞ্জ ছিল। সেই কুঞ্জের নিকটে আর একটা কুঞ্জেই তাহারা রহিল। নিত্য ৺গোবিন্দজীর পূজা ভোগ ও আরতি দেখিয়া, নিত্য যমুনাবগাহন করিয়া, নিত্য হরিগুণগান শ্রবণ করিয়া হরিমতী মনে প্রভূত শান্তি লাভ করিল; নরহরিও অনেকটা শান্ত হইল।

এদিকে প্রবলপ্রতাপ সরকার বাহাদুর ঘুঘুড়ির বটজঙ্গল সাফ করাইতে লাগিলেন। সেখানে যথার্থই পুলীশের ঘাঁটী বসিল। সরকার ঘুঘুড়ির আড্ডা পুড়াইয়া দিলেন; মন্দিরের বীভৎস কাণ্ড দূর করিলেন; পুকুর সাফ করাইলেন। জীবন পাণ্ডুয়ায় ধরা পড়িল; সরকার বাহাদুর তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইলেন।

এখনও ঘুষুড়ির সেই বটবনের চিহ্ন আছে; এখনও সেই ডাকাতে কালীর ভগ্ন মন্দির বিদ্যমান। এখনও সেই রক্তের পুকুর আছে, কিন্তু তাহাতে রক্ত নাই, সেই বনের জীবন সর্দ্দারও আর নাই।

সমাপ্ত।